জোট সরকারের শেষ বছর

ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর

২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত খালেদা-সাইফুর দুর্নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের দরিদ্র জনসাধারণের কমসেকম ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৩ কোটি টাকা লুট করেছেন। বৎসর ওয়ারী হিসেবে এর পরিমাণ ৪৮ হাজার কোটি টাকা তথা মোট জাতীয় উৎপাদনের ১৩% এর বেশি।

মন্ত্রীবর্গের দুর্নীতিভিত্তিক অনুপার্জিত আয় ৭,৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৫২,১০০ কোটি টাকা পরিমানে হিসাবকৃত হয়েছে। দুর্নীতির এই মাত্রার বিস্তৃতি খালেদার সরকারকে দুর্নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, দুর্নীতি প্রসারে নিয়োজিত, দুর্নীতিকে সর্বাধিক কুলষিত এবং ফলতঃ ঘৃণ্যতম মাত্রার জনস্বার্থবিরোধী সরকার হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে।

এ দুর্নীতির কিছু চিত্র পাওয়া যাবে জোট সরকারের নির্যাতিত ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীরের এই গ্রন্থে। শুধু তাই নয়, একজন অর্থনীতিবিদের নির্মোহ দৃষ্টি নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন যেখানে আবেগের স্থান নেই।

ISBN 984458582-1
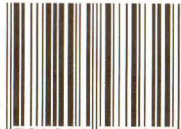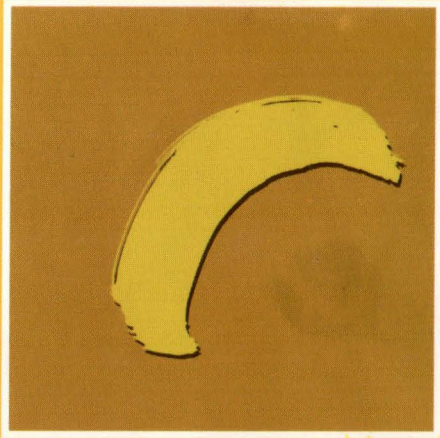
'জোট সরকারের শেষ বছর' এর মোড়কে এই সংকলনে ডঃ আলমগীর মূলতঃ ২০০৬ এ খালেদা-নিজামী সরকারের দুঃশাসন ও দুর্নীতির কতিপয় ঘটনা ও চিত্র তুলে ধরেছেন। ঘটনাগুলো তথ্যবহুল এবং চিত্রগুলো সহজে অনুধাবনক্ষম। কৃষি, শিল্প, বিদ্যুত, সেচ, আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে জোট সরকারের অসংবেদনশীলতা ও অকর্মণ্যতা, অসফলতা, দায়িত্বহীনতা ও দুর্নীতি তার লেখায় ফুটে উঠেছে। সহজ ও সরল ভাষায় তার নিজস্ব শৈলীতে তিনি তার কথাগুলো তুলে ধরেছেন। অর্থনীতির জটিল তত্ত্বের আলোকে সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের সমীক্ষণ করেছেন তিনি। কেউ কেউ তার সকল কথা মেনে নাও নিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে পাঠককে ভাবনার খোরাক দিয়েছেন তিনি। সমকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনায় দিক দেখানো অনেক উপকরণ আছে এই সংকলনে। সমাজকে নতুন দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ও পরিকল্পনায় এই উপকরণগুলো কাজে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর এই সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের সদস্য। অর্থনীতি তার পড়া ও লেখার বিচরণ ক্ষেত্র। ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৬৫তে তখনকার সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং অর্থনীতিতে মাস্টার্স করেন তিনি। আবার দেশে থেকে বস্টনে ফিরে যেয়ে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ সালে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। সুশীল প্রশাসনের বিভিন্ন বৃত্তে কাজ করেছেন। ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, যশোরের জেলা প্রশাসক, শিল্প ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামীক উন্নয়ন ব্যাংকের (জেদ্দা) নির্বাহী পরিচালক, ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান, কৃষি ব্যাংক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ও শিল্প ঋণ সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সচিব। ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বিভাজন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি বিষয়ক চুক্তি (১৯৯৮) প্রণয়নে বিশেষ অবদান ছিল তার। ১৯৯৮ এ প্রজাতন্ত্রের সার্ভিস থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০১ পর্যন্ত পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল রচয়িতা ছিলেন তিনি। সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ভূমিকা পালনে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদিগকে উজ্জীবিত করেছিলেন। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির ভোটার বিহীন নির্বাচনের ভিত্তিতে সরকার গঠনের বিরোধিতায় "জনতার মঞ্চ" স্থাপন ও বিস্তৃত করার ভূমিকায় ছিলেন তিনি। খালেদা-নিজামী জোট সরকার ক্ষমতায় এসে তাঁকে বিশেষ আইনে বিনা বিচারে অন্তরীণ করে। পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মুক্তি পান তিনি।

অর্থনীতির বিষয়ে বেশ কটি বইয়ের প্রণেতা ডঃ আলমগীর। আন্তর্জাতিক পেশাগত জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তার অনেক প্রবন্ধ। সাম্প্রতিক কালে সাবলীল কলাম লেখক হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি।

জোট সরকারের শেষ বছর

ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর

সময় প্রকাশন

জোট সরকারের শেষ বছর
ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৭

সময়
সময় ৫৮২
প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
রূপলাল দাস লেন, ঢাকা

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র

JOT SORKARER SHESH BOCHOR (Last Year of Coalition Goverment) by Dr. Muhiuddin Khan Alamgir. First Published Book Fair 2007 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2ka Banglabazar, Dhaka.

Web : www.somoy.com E-mail : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 150.00 Only

ISBN 984-458-582-1 Code : 582

উৎসর্গ

বড় ভাই
মেসবাহউদ্দীন খান
শ্রদ্ধাভাজনেষু

পূর্ব কথা

২০০৬ এ জনকণ্ঠ, সংবাদ ও যুগান্তরে প্রকাশিত ১৮টি নিবন্ধ নিয়ে এই সংকলন। খালেজা-নিজামীর সরকারের শেষ বছরের দুঃশাসন ও দুর্নীতি প্রতিফলিত হয়েছে এই সব নিবন্ধে।

নিবন্ধসমূহের মধ্যে ৪টি যথা ঃ 'আঁখ মাড়াইর বলি;, দৌলতপুর পুলিশের গুলি : রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ'; 'কানসাটের গুলি : জালেম সরকারের হত্যাকাণ্ড', ডেট লাইনে ঢাকা জুন ১১, ২০০৬ : নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা' ও 'বিনাদোষে ফাঁসি : বর্বরতার এক কাহন' এ আলোচিত হয়েছে জোট সরকার কর্তৃক এর শেষ বছরে পুলিশ, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার মোড়কে সাধারণ মানুষের অধিকার হনন ও তাদের উপর বর্বর নির্যাতনের কথা। 'পাকিস্তান ফেরত খালেদা জিয়া : মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কথা, সার সংকটের কথা : চালের কেজি ত্রিশ টাকা, ও হংকং, হোঁচট : বাণিজ্য প্রসারে বিভ্রান্তি ও শিরোনামে ৩টি নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জোট সরকারের নীতিভ্রষ্টতার কথা। 'বিদ্যুৎ সংকট : জোট সরকারের অযোগ্যতার কথা' ও 'বিদ্যুৎ সংকট : বাংলাদেশ' শীর্ষক ২টি নিবন্ধে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের ক্ষেত্রে জোট সরকারের অকর্মন্যতা ও দুর্নীতির প্রতিফলন ঘটেছে। 'একুশের ভাবনা : ২০০৬' এ বিদিত হয়েছে মাতৃভাষার প্রচলন বিষয়ে জোট সরকারের ক্ষমার অযোগ্য অনীহার কথা। তেমনি 'বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার : জাতির বিক্ষত বিবেক' শীর্ষক নিবন্ধে জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে খালেদা-নিজামী সরকারের বিচারক্ষেত্রে প্রহসনের ইতিবৃত্ত। 'প্রাথমিক শিক্ষার কথা : জোট সরকারের নীতি ভ্রষ্টতা'য় প্রতিফলিত হয়েছে শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে জোট সরকারের অবহেলা ও অকর্মন্যতা।' থাইল্যান্ডের থাকসিন, বাংলাদেশের খালেদা' শীর্ষক নিবন্ধে গণতন্ত্রের মোড়কে এই দুই দেশের সরকার প্রধানের চালচিত্র স্থান পেয়েছে। ' রেখো মা দাসেরে মনে' শীর্ষক নিবন্ধে ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত স্তাবকদের হীন মানসিকতার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।' দুটি বিজ্ঞাপন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও টিএন্ডটি বোর্ড,' 'চোরের মার বড় গলা : খালেদার দুর্নীতি সংক্রান্ত শ্বেতপত্র' ও 'রূপালী ব্যাংক বিক্রয় না লোপট : কতিপয় প্রশ্ন' শীর্ষক ৩টি নিবন্ধে জোট সরকারের দুর্নীতি দমনের প্রতিশ্রুতির আওতায় সীমাহীন মিথ্যাচার ও দুর্নীতির উদাহরণ বিবৃত হয়েছে। দুঃশাসন আর দুর্নীতির কাহন ছড়িয়ে আছে সবগুলো নিবন্ধেই।

এই নিবন্ধগুলো প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক জনকণ্ঠ, সংবাদ ও যুগান্তরে। প্রকাশিত হওয়ার পর অসংখ্য ফোন ও ইমেইল পেয়েছি। দু একজনের বিরক্তি ছাড়া সবাই প্রশংসা করেছেন। 'চোরের মার বড় গলা : খালেদার দুর্নীতি সংক্রান্ত শ্বেতপত্র' বিষয়ে সকলেই আরও বড় করে সকল তথ্যের সন্নিবেশ নিয়ে লিখতে বলেছেন। বলেছি, লিখব সহসাই।

বরাবরের মতো স্নেহভাজন ভাইপো মুনতাসির মামুন বারবার বলেছেন সংকলনটি তাড়াতাড়ি বের করতে। তাগিদ দিয়েছেন প্রুফ দেখা শেষ করতে, পান্ডুলিপিটি সাজিয়ে দিতে। তার তাগাদা ও উৎসাহ ছাড়া সংকলনটি হয়ত এই সময়ে বের হতোনা। সংকলনের নামটা তারই দেয়া। তাকে ধন্যবাদ সবসময় দিতে চেয়েছি, কিন্তু দেয়া হয়ে উঠেনি।

ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর

সূ চি প ত্র

আখ মাড়াইর বলি : দৌলতপুরে পুলিশের গুলি : রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ

গত ২৯ ডিসেম্বর সকালে খবরের কাগজ দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। ২৮ ডিসেম্বর কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় মরিচা ইউনিয়নের দক্ষিণ ভূড়কাপাড়া গ্রামে কৃষকদের আখ মাড়াই কল জব্দ করার লক্ষ্যে পুলিশ গুলি করে ৩ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করেছে। খবরে প্রকাশ সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেটে আব্দুল আজিজ মিয়ার নেতৃত্বে এস.আই. নুরুল ইসলাম ও ১০ জন কনষ্টেবল ভূড়কাপাড়ায় যান 'অবৈধ' আখ মাড়াই কল জব্দ করতে। ভূড়কাপাড়া কুষ্টিয়া চিনি কলের জোনের মধ্যে অবস্থিত। ঔপনেবিশিক আমলে প্রণীত এক আইনের আওতায় 'জোনে' অবস্থিত জমিতে উৎপাদিত সকল আখ সংশ্লিষ্ট চিনি কলে নির্ধারিত মূল্যে চাষিদের সরবরাহ করার কথা। এর অন্যথায় আখ মাড়াই করে গুড় তৈরী করা আইন বিরুদ্ধ এবং গুড় তৈরী করার আখ মাড়াই যন্ত্র সে প্রেক্ষিতে অবৈধ। ভূড়কাপাড়ায় দু'টি অবৈধ আখ মাড়াই কল জব্দ করার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট আজিজ মিয়া পুলিশ সহ সেখানে অভিযানে গিয়েছিলেন। আখ মাড়াই কল জব্দ করণের প্রতিবাদে গ্রামবাসী একযোগে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশকে বাধা দেন। বিক্ষুব্ধ জনতাকে নিবৃত্ত করতে ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশকে গুলি বর্ষণের নির্দেশ দেন। পুলিশের গুলিতে ঘটনা স্থলে নিহত হন ভূড়কাপাড়ার ভোগল মন্ডলের ছেলে স্কুল-ছাত্র রতন ও দবির ফরাজীর ছেলে আখ-চাষি আজম। আহত হন পাশের গ্রাম গাছেরদিয়ার আবতার আলীর ছেলে আখ-চাষি মিজান বয়াতি। মিজান বয়াতিকে কুষ্টিয়ায় হাসপাতালে নেয়ার পরও তাকে বাঁচান যায়নি। পরে জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে জানতে পেরেছি পুলিশের গুলিতে এভাবে খুন হওয়া মিজান বয়াতীর এক ভাই আশরাফ ভিন্নতর এক জেলায় শিক্ষানবিশ ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত। পুলিশের গুলিতে আরও আহত হয়েছেন ৩০ জন নিরপরাধ গ্রামবাসী। এদের

মধ্যে পাশ্ববর্তী গাছেরদিয়া গ্রামের জিন্দার আলীর মেয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী জেসমিনও রয়েছে। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে জানা গেছে যে আহতদের মধ্যে ৪ জন কুষ্টিয়া সদর এবং ৩ জন ভেড়ামারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। জেলা প্রশাসক জামাল নাসের চৌধুরী ও পুলিশ সুপার মাসুদ উল হাসান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বলে জানা গেছে। আরও জানা গেছে যে গত ৬ ডিসেম্বর দৌলতপুরের আর এক এলাকা দৌলতপাখালীতে আখ মাড়াই কল জব্দ করণের প্রক্রিয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে ছিল (দ্রষ্টব্য, ভোরের কাগজ ও দৈনিক সংবাদ, ডিসেম্বর ২৯, ২০০৫)। এই শেষোক্ত ঘটনায় জনগণ পুলিশ ভ্যানে আগুন দেয় এবং প্রেরিত ম্যাজিষ্ট্রেট আব্দুল্লাহকে নিগৃহীত করে (দ্রষ্টব্য, ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ৩০, ২০০৫)। ডিসেম্বর ২৮ এর ঘটনায় ৩০০ গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে চিনি কলের তরফ হতে সরকারি কাজে বাধা প্রদানের দায়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর বিপরীতে স্থানীয় হোগলাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের তরফ হতে কাউকে আসামী হিসাবে উল্লেখ না করে হত্যার মামলাও দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে (দ্রষ্টব্য, প্রথম আলো, ডিসেম্বর ৩০, ২০০৫)।

দৌলতপুরের এই দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি কয়েকবার। এক কালে বৃহত্তর যশোরের জেলা প্রশাসক হিসাবে কাজ করার সময় কালিগঞ্জের মোবারকগঞ্জ চিনি কলে সংশ্লিষ্ট জোনের আখ চাষিদের অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে আখ সরবরাহের মূঢ়তা এবং অনৈতিক সরকারি দাবীর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। তৎকালীন চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ হতে স্থানীয় চাষিদেরকে জোর করে মোবারকগঞ্জ চিনি কলে আখ সরবরাহ করণের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ ও অনুজ্ঞাপত্র পেয়ে লিখেছিলাম চাষিদের চিনি কলে আখ সরবরাহে বাধ্য করতে জেলা প্রশাসক হিসাবে আমি অপারগ। চিনি কল যদি চাষিদেরকে যথার্থ কিংবা লাভজনক দাম দেয় তাহলে চাষিরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিনি কলে আখ দিয়ে আসবে, জেলা প্রশাসককে হস্তক্ষেপ করতে হবে না। বাজার মূল্য থেকে কম দামে চাষিকে চিনি কলে আখ সরবরাহ করা কেবলমাত্র অনৈতিক নয়, অসাংবিধানিকও হবে। কেননা, সংবিধানে বিধিত সকল নাগরিকদের পেশার স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৪০), সম্পদের মালিকানার সূত্র (অনুচ্ছেদ ১৩), জবরদস্তি মূলক শ্রমের প্রতিকূলে রক্ষা কবচ (অনুচ্ছেদ ৩৪) এবং সকলের সমান আইনানুগ অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৭) চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

এই অনুরোধ ও অনুজ্ঞাপত্রকে বৈধতা দেয় না। সর্বোপরি সংবিধানে বিধৃত প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার গণ-মালিকানা (অনুচ্ছেদ ৭) জোর করে আখ চাষিকে বাজার দর থেকে কম দামে চিনি কলে আখ সরবরাহ্ করার কোনো কার্যক্রম সমর্থন করতে পারে না। আমার চিঠিতে বিবৃত এই অবস্থানের বিপরীতে চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কিংবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর পরে আর কিছু বলেননি।

যে আইনের আওতায় এখনও আখ চাষিদেরকে সংশ্লিষ্ট জোনে কেবলমাত্র চিনি কলে আখ সরবরাহে জেলা প্রশাসন থেকে বাধ্য করা হয় তা বৃটিশ আমলের বিদেশী নীলকরদের দিয়ে স্বদেশী চাষিদেরকে নীল উৎপাদন ও সরবরাহে বাধ্য করার বেআইনী ও অনৈতিক কার্যক্রমকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পাকিস্তান আমলে অধিকাংশ চিনি কলের মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীরা। তাদের চিনি কলে বাজার দর থেকে কম মূল্যে আখ সরবরাহ পাওয়ার লক্ষ্যে এই আইন করা হয়েছিল। এই আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসক চিনি কলের চার ধারে আখ সরবরাহ করার উপযোগী এলাকাকে চিনি কলের মালিক বা ব্যবস্থাপনার পরামর্শে আখ সরবরাহের জোন হিসাবে নির্দিষ্ট ও বিজ্ঞপ্ত করতে পারতেন। এভাবে নির্দিষ্ট ও বিজ্ঞপ্তি হলে ঐ এলাকার আখ চাষিগণ সংশ্লিষ্ট মিল ছাড়া অন্য কোথাও আখ বিক্রি কিংবা চিনি উৎপাদন ছাড়া ভিন্নতর কোনো উৎপাদন, উদাহরণত, গুড় উৎপাদনে তাদের ফলানো আখ প্রযুক্ত করতে পারতেন না। এই আইন অনুযায়ী মিল থেকে ভিন্নতর কারও কাছে বিক্রয় কিংবা গুড় উৎপাদনে আখের ব্যবহার আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করণীয়। আখের এই ধরণের ভিন্নতর ব্যবহার বা উৎপাদনে প্রযুক্ত মাড়াই কল এই প্রেক্ষিতে এই আইনের আওতায় অবৈধ বলে ধরা এবং জব্দ করা যায়। বিজ্ঞপ্ত এলাকায় আখ উৎপাদন করার জন্য চিনি কলের তরফ থেকে চাষিদেরকে অগ্রিম পুঁজি (আখ-চাষিদের ভাষায় পুরজি) দেয়ার বিধান আছে। এই বিধান অনুযায়ী অবশ্য সকল আখ চাষি প্রয়োজনীয় মাত্রায় পুঁজি পেতেন না। কুষ্টিয়া চিনি কল থেকে এই বছর বা আগের বছর এই ধরণের পুঁজি এই এলাকায় দেয়া হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। মিল গেটে বা মিলের ক্রয় কেন্দ্র আখ সরবরাহ করার বিপরীতে চাষিকে সরকার অনুমোদিত নির্ধারিত হারে দাম দেয়া হয়। এই দাম সাধারণত বাজার মূল্য কিংবা গুড় তৈরীতে ব্যবহারের বিপরীতে পাওয়া লাভের তুলনায় কম (কম না হলে চাষিদের থেকে জোর করে মিল গেটে বা ক্রয় কেন্দ্রে আখ নিয়ে আসার প্রয়োজন হয় না)। এছাড়া চাষিদের প্রাপ্তব্য মূল্যের একটি অংশ পরোক্ষ ভাবে ব্যবহৃত চিনি কর বা সুগার সেস হিসাবে আদায় করা হয়।

আদায়কৃত কর দিয়ে বিজ্ঞপ্ত এলাকায় রাস্তা-ঘাট ও পুল-কালভার্ট নির্মাণ করার কথা। এসব রাস্তা-ঘাট ও পুল-কালভার্ট বিজ্ঞপ্ত এলাকা থেকে মিল গেটে আখ নিয়ে আসার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী সরকারের পক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক চিনি কলের মালিকদের স্বার্থ দেখে থাকেন, যেমনি বহু যুগ আগে এক অলিখিত আইন অনুযায়ী নীল চাষে এদেশী চাষিদের বাধ্য করে নীলকরদের স্বার্থ তৎকালীন বিজাতীয় জেলা প্রশাসকরা দেখতেন। আইনের এই সব বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট এলাকায় আখ চাষিদের দৃষ্টিকোণ থেকে শোষণের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চিনি কল সমূহ জাতীয়কৃত হয়েছে। জিয়াউর রহমানের শাসনামল থেকে এসব চিনি কলের বেশ কতগুলো আবার বিরাষ্ট্রীয়কৃত হয়েছে। কিন্তু মালিকানা ও সময় নির্বিশেষে চিনি কলের অনুকূলে প্রবর্তিত এই আইন রয়ে গেছে। সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে দেশের মেহনতী মানুষকে, কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশ সমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তিদান করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে ঘোষণা ও গ্রহণ করা হয়েছে। তর্কাতিত ভাবে বলা চলে, চিনি কল এলাকায় আখ উৎপাদন, ব্যবহার ও সরবরাহ বিষয়ে বিদ্যমান আইনটি এই প্রেক্ষিতেও সংবিধান পরিপন্থী।

কুষ্টিয়া চিনি কল এখনও রাষ্ট্রায়ত্ব। গত ২ বছরে এই কলটি মূলত অব্যবস্থাপনা ও আখের স্বল্পতার জন্য যথাক্রমে ৯ ও ৬ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। ২০০৩-এ ১.৩ লক্ষ টন আখের চাহিদার বিপরীতে এই কল ৭৪০০০ টন আখ পেয়েছে। ২০০৪-এ ১.৪ লক্ষ টন চাহিদার বিপরীতে কলটি পেয়েছে ৮২০০০ টন আখ। আখের সরবরাহের এই স্বল্পতার কারণ চিনি কল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাজার দর হতে কম পর্যায়ে দাম নির্ধারণ এবং সরবরাহকৃত আখের মূল্য পরিশোধন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি। সরকারের তরফ থেকে এসব সংশোধন না করে আখ চাষিদেরকে জোর করে স্বল্পতর দামে চিনি কলে আখ সরবরাহ করার জন্য এই অপচেষ্টা চালানোর প্রক্রিয়ায় প্রশাসন ভুলে গেছে যে এ বছর এই জোনে ১৫০০০ একর জমিতে আখ চাষ করা হয়েছে। এই পরিমাণ জমির সম্ভাব্য আখ উৎপাদন ৩ লক্ষ টন। কুষ্টিয়া চিনিকল মোট ১.৪ লক্ষ টন আখ কিনবে বলে জানা গেছে। জোনে উৎপাদিত ৩ লক্ষ টনের বিপরীতে অপেক্ষাকৃত কম দামে ১.৪ লক্ষ টন আখ নিলে আর আখ চাষিদেরকে গুড় উৎপাদনে আখ ব্যবহার না করতে দিলে তাদের কি অবস্থা হবে তা প্রশাসন বীক্ষণ করে দেখেনি। আখ চাষিদের তরফ থেকে এও বলা হয় যে গত ২ বছরের মতো এই বছরও তাদের

প্রাপ্য দাম চিনি কল থেকে পাওয়ার প্রক্রিয়ায় সরকার লালিত স্থানীয় পিতৃদেবদের সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা মিল ব্যবস্থাপনার সহযোগে পাকাপোক্ত করে রাখা হয়েছে। জোনে স্থাপিত চিনি কলের ৫২ টি ক্রয় কেন্দ্রের কোনোটিতেই আখ সরবরাহ করে সন্তোষের উপকরণ না ফেললে মূল্য পরিশোধিত হয় না বলে অভিযোগ এসেছে। প্রশাসন এমনকি স্থানীয় বিএনপি সাংসদ রেজা আহমেদ বাচ্চুকে এই বিষয়ে বার বার জানিয়েও আখ-চাষিরা কোনো ইতিবাচক ফল পাননি। আখ ক্রয়ে এসব অনিয়ম, দুর্নীতি ও অপরিণামদর্শিতার বিষয়ে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেসি ও পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

দৌলতপুরের দক্ষিণে ভূড়কাপাড়া গ্রামে গত ২৮ ডিসেম্বর পুলিশের গুলিতে ৩ জন গ্রামবাসীর খুন হওয়ার ঘটনা কতিপয় প্রশ্নের উৎসারণ ঘটায়। এক, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান বিষয়ক সকল আইন বলবৎকরণের বিষয়ে যথা প্রয়োজন মনোযোগ না দিয়ে চিনি কলে চাষিদের জোর করে আখ সরবরাহ করণের উপর এত গুরুত্ব কেন দিলেন? কেন প্রশাসন আখ ক্রয় প্রক্রিয়ার অনিয়ম ও দুর্নীতি দমনে কোনো পদক্ষেপ নিলেন না? সাম্প্রতিক কালে জেলা প্রশাসনের সাধারণ বিপর্যস্ততার নিরিখে এই ক্ষেত্রে ও বিষয়ে গত ৬ ডিসেম্বর একই উপজেলায় জনপ্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ার পর তাদের কি অধিকতর যত্ন ও সংবেদনশীলতার সাথে এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেয়া সঙ্গত হতো না? দুই, পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশে আত্মরক্ষাকরণ কিংবা বেআইনী সমাবেশ ভঙ্গকরণের লক্ষ্যে এখানে যে গুলি চালিয়েছে তাতে অন্যদের মধ্যে একজন স্কুল পড়ুয়া ছাত্র নিহত এবং আর একজন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী আহত হলো কি ভাবে? বিক্ষুব্ধ সমাবেশের মধ্যে বা সামনে এদের ত থাকার কথা নয়। তিন, পুলিশ গুলি চালনার আগে ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতা অনুযায়ী বিক্ষুব্ধ জনগণকে কি হুশিয়ার করেছিল, লাল-পতাকা উড়িয়ে গুলি করার হুকুম বা সংকল্প কি জানিয়েছিল, গুলি করে হত্যা করার আগে ফাঁকা গুলি কি করেছিল এবং জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে গুলির আগে লাঠিচার্জ কি করেছিল কিংবা বঙ্গীয় পুলিশ প্রবিধি অনুযায়ী নিম্নতম প্রয়োজনীয় মাত্রায় গুলি কি করেছিল? এক্ষেত্রে তারা ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ১২৭ ও ১২৮ এবং বঙ্গীয় পুলিশ প্রবিধির ১৪৩, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫ ধারা অনুসরণ করেছিল কিনা? এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় পুলিশ প্রবিধির ১৫৩ (গ) ১, ২ ও ৩ ধারা বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। এই সব ধারায় বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র অনিবার্য না হলে এবং বেআইনী সমাবেশ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য অন্য কোনো উপায়

না থাকলেই গুলি চালানো যেতে পারে এবং এভাবে গুলি চালানোর আগে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যাজিস্ট্রেট না থাকলে পুলিশ অফিসার গুলি চালানোর হুকুম দেয়ার আগে পূর্ণ ভাবে এবং যথেষ্ট মাত্রায় সংশ্লিষ্ট জনসমাবেশকে সাবধান করবেন। চার, বঙ্গীয় পুলিশ প্রবিধি (ধারা ১৫৭) অনুযায়ী গুলি চালানোর পর পরই গুলি চালানোর যৌক্তিকতা নিরীখ করার লক্ষ্যে নির্বাহী তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিনা? এই প্রশ্নগুলোর সুদুত্তর এখনও আমাদের জানা নেই। এই প্রশ্নগুলোর সুদুত্তর এক্ষত্রে না থাকলে বা পাওয়া না গেলে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে গত ২৮ ডিসেম্বর পুলিশের গুলিতে নিহত ৩ জন মানুষের মৃত্যুর জন্য সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশকে খুনের দায়ে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করা যায়।

দৃশ্যত ডিসেম্বর ২৮-এ দৌলতপুরে পুলিশের গুলি চালানো যৌক্তিক হয়নি। এই ঘটনার বিভিন্ন দিক প্রশাসনে জেলা প্রশাসকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কয়েকজন সহকর্মীর সাথে আমি আলোচনা করেছি। আমরা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের এই ধরণের কাজ ও আচরণ জেনে ব্যথিত হয়েছি, শংকিত বোধ করেছি। আমাদের সযত্ন বিবেচনায় ৩ জন দৃশ্যত নিরপরাধ নাগরিকের জীবনের দাম কোনো সরকারই পরিমাপ কিংবা টাকার অংকে নিরুপণ করে যথার্থ ক্ষতিপূরণ দিতে সক্ষম হবে না। এসব নিরপরাধ নাগরিকদের অকাল মৃত্যুর কারণে তাদের পরিবার ও পরিজনদের উপরে নেমে আসা আর্থিক অসহায়ত্ব ও মানসিক বিপর্যয় টাকার অংকে নিরুপণ করা কিংবা যথার্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেয়া যায় না। গড়ে ৫০ লক্ষ টাকা করে ৩ জন নিহতদের এবং ২০ হাজার টাকা করে ৩০ জন আহতদের ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা ব্যয়ের সাথে এ ঘটনায় ফসল, মাড়াই কল, পুলিশের গাড়ি, গোলাবারুদ ও সময়ের অপব্যয় বাবদ আরও ৫০ লক্ষ টাকা ধরলে দৌলতপুরের এই গুলিবর্ষণের ঘটনায় সমাজের মোট ক্ষতি ন্যূনপক্ষে ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা হয়েছে বলে হিসাব করা যায়। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের সাম্প্রতিক কালে তত্ত্বাবধায়ন মূলক অধঃপতন ও বিপর্যস্ততার জন্য এই ধরণের ঘটনা ও সামাজিক ক্ষতি ঘটেছে। ম্যাজিস্ট্রেসি ও পুলিশ ইপ্সিত মাত্রায় প্রশিক্ষিত, সংবেদনশীল ও যোগ্য হলে এ ঘটনা ঘটত না। জোট সরকারের আমলে দলীয় বিবেচনায় মেধাকে অবজ্ঞা করে ম্যাজিস্ট্রেসি ও পুলিশে নিযুক্তি, পদায়ন ও পদোন্নতির কারণে এ ধরণের আরও ঘটনা ঘটার আশংকা রয়েছে। এই চার বছরে প্রশাসনে 'হাওয়া ভবনের' 'এখুনি পাওয়ার' বিনিময়ে যে সব দলীয় কর্মীদের নিযুক্তি এবং দল অনুগত কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে, তারা কি আহড়িত জ্ঞান, প্রযুক্ত অনুশীলন ও প্রশিক্ষিত মানস ও মূল্যবোধ নিয়ে

জনস্বার্থে জনগণের ক্ষমতা হিসাবে প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে? জানা গেছে যে এই সময়ে জোট সরকার দলীয় বিবেচনায় ২০৭ জন এ. এস. পি. এবং ৬২৬ এ. এস. আইকে নিযুক্তি দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ কাল অর্ধেকে কমিয়ে মাঠ পর্যায়ে তাদের সত্বর পদায়িত করার কার্যক্রম হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এসব পুলিশ অফিসার এখন সারদায় পুলিশ একাডেমীতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জোটের সহায়ক অশুভ শক্তি হিসাবে এরা ভোটের মোড়কে নিয়োগ দাতা দলকে বৈতরণী পার করবে বলে সরকারের আশা। যোগ্যতার নিরীখে অনুর্ত্তীণ এবং প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তি ও মানে অপর্যাপ্ত এসব পুলিশ কি কখনও প্রজাতন্ত্রে কর্মরত কর্মচারী হিসাবে জনগণের ক্ষমতা তাদের স্ব স্ব কর্মবৃত্তে জনস্বার্থে প্রয়োগ করতে পারবে? এদের হাতে আইনশৃংখলা রক্ষা করার অস্ত্র তুলে দিয়ে খালেদা-নিজামী-বাবর গংরা কি কখনও জনগণকে নিরাপত্তা দিতে পারবে? ম্যাজিস্ট্রেসি ও পুলিশকে দলীয় বিবেচনায় বিপর্যস্ত করে খালেদা-নিজামীর সরকার দেশকে এক ভয়ঙ্কর বিপদজনক স্তরে নামিয়ে নিয়ে গেছে। এই অপরাধ ত প্রজাতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করা তথা নিকৃষ্টতম পর্যায়ে রাষ্ট্রদ্রোহে অংশ গ্রহণ করার। সরকার পরিচালকদের এই রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিচার এই প্রজাতন্ত্রে কোনও না কোনও দিন নিশ্চয়ই হবে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের মারিচা ইউনিয়নের দক্ষিণ ভূড়কাপাড়ায় গত ২৮ ডিসেম্বর যে শোকাবহ ও দুঃখজনক নাগরিক হত্যার ঘটনা ঘটেছে তার বিশ্লেষণের আলোকে আমাদের দাবীঃ (১) চিনি কলে আখ সরবরাহে আখ-চাষিদের জোর করার জন্য যে আইনটি বিদ্যমান তা অসাংবিধানিকতার কারণে প্রত্যাহার করা হোক; (২) গুলিতে নিহত ৩ জনের স্বজনদের ও আহত ৩০ জনকে সরকারের তরফ হতে যথা প্রয়োজন ক্ষতিপূরণ দেয়া হোক; (৩) ঘটনার ক্রমে ও বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের ভূমিকার যথার্থতা নিরুপণে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা নেয়া হোক; (৪) বিচার বিভাগীয় তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ৩০০ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হয়েছে তা স্থগিত করা হোক এবং তদন্তের প্রতিবেদনে এরূপ মামলা করণের অনুকূলে সুপারিশ না থাকলে তা প্রত্যাহার করা হবে বলে সরকারের তরফ হতে ঘোষণা দেয়া হোক; এবং (৫) ম্যাজিস্ট্রেসি ও পুলিশ বিভাগে নিযুক্তি এবং পদায়নের ক্ষেত্রে দলীয়করণ বন্ধ এবং দলীয়করণের জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী ব্যক্তিগণকে রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করা অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে বিচারে সোপর্দ করা হোক।

দৈনিক জনকণ্ঠ, জানুয়ারি ৩, ২০০৬

কানসাটের গুলি : জালেম সরকারের হত্যাযজ্ঞ

গত ২৯ ডিসেম্বর কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে নীলকরদের স্বার্থ রক্ষাকরণের পথ অবলম্বন করে কেবলমাত্র চিনি কলে আখ সরবরাহে বাধ্যকরণের জন্য আখ চাষিদের উপর গুলি বর্ষণ বিষয়ে আমি এই সরকারের আমলে পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেসির দায়িত্বহীনতা ও অপরিনামদর্শিতার কথা লিখেছিলাম। আমি বলেছিলাম খালেদা-নিজামীর জুলুমবাজ সরকারের অধীনে পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেসির হাতে এদেশে নিরীহ জনগণ ক্রমাগত ভাবে খুন হতে থাকবে (দ্রষ্টব্য, দৈনিক জনকণ্ঠ, জানুয়ারী ৩, ২০০৬)। তাই হয়েছে। গত ৩ জানুয়ারি চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার নিভৃত ও শান্ত কানসাটে নিয়মিত ও দুর্নীতি বিহীন বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবীতে পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির অফিসের সামনে সমবেত জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে পুলিশ দু'জন নাগরিককে খুন করে। এর পরে একই স্থানে জানুয়ারি ২৩ এ একই দাবীতে স্থানীয় জনতা সমবেত হলে পুলিশ তাদের ছত্র ভঙ্গ করতে গুলি চালিয়ে ৮ জন নাগরিককে খুন করে। দুইশত জনেরও বেশি জনগণ গুলিবদ্ধ হয়ে আহত হন। দেশের সব মহলে পুলিশ কর্তৃক এই ভাবে ১০ জন নাগরিককে নির্বিচারে খুন করার ঘটনা ধিকৃত হয়। ভোরের কাগজ এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সম্পাদকীয়তে বলেন, জনদাবীর প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীন্য এবং এর পটভূমিতে পুষ্ট জনক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে আইনশৃংখলা বাহিনীগণ ও প্রশাসনের দায়িত্বহীন আচরণ ও ঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ আমাদের হতবাক ও ক্ষুব্ধ করেছে (ভোরের কাগজ, জানুয়ারি ২৫, ২০০৬)। ডেইলি স্টারের ভাষায় এই ধরণের ঘটনা ক্ষমতাধরদের ইংগিত ছাড়া ঘটতে পারত না (ডেইলি স্টার, সম্পাদকীয়, জানুয়ারি ২৪, ২০০৬)। প্রথম আলো বলেন, বিদ্যুতের সমস্যা নিয়ে বিক্ষোভকারীদের যখন গুলি করে হত্যা করা হয় তখন সার্বিক ভাবে সরকারের ব্যর্থতা আরও প্রকট হয়ে উঠে (প্রথম

আলো, সম্পাদকীয়, জানুয়ারি ২৫, ২০০৬)।

শিবগঞ্জের কানসাটের নাগরিকগণ কি চেয়েছিলেন যে তাদের এমন করে সরকার খুন করতে পারল? পত্রিকান্তরে সংবাদ ও স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে জানা গেছে কানসাট পল্লী বিদুৎ সমিতির (পবিস) প্রতিকূলে স্থানীয় জনগণের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও দাবী ছিল। এক, চাহিদার তুলনায় পবিস এখন পর্যন্ত খুব কম গ্রাহককেই বিদ্যুৎ দিতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পবিসের তরফ হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ ও শিবগঞ্জে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার কথা। এই ৫টি থানায় ১ হাজার ৫৮৪ টি গ্রাম। এই ৫টি থানার জনসংখ্যা ১৫ লক্ষেরও বেশি। এই পর্যন্ত এদের মধ্যে পবিস মাত্র ৪৮ হাজার গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে সমর্থ হয়েছে। গ্রাহকের গৃহস্থালী প্রতি গড়ে ৫ জন লোকের বাস ধরে নিলে এই হিসাবে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছে ২ লক্ষ ৪০ হাজার লোক বা মোট জনসংখ্যার ১৬%। এর বাইরে এই এলাকায় প্রায় ৩ হাজার বিদ্যুৎ চালিত সেচ যন্ত্র আছে। যারা এখন বিদ্যুৎ সংযোগ চান তাদেরকে সংযোগ প্রতি পবিস কর্মকর্তাদিগকে ৫-১০ হাজার টাকা উপরি দিতে হয় এবং স্থানীয় সাংসদ বা তার চেলাচামুণ্ডার সুপারিশ নিতে হয়। সংযোগ দেয়ার সুপারিশ পেতে হলে শাসকদের রাজনৈতিক দলে যোগ এবং সংযোগ প্রতি আরও ৫-৭ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। স্থানীয় জনগণ এই উপরি দেয়াকে নগ্ন শোষণ এবং নির্লজ্জ ভাবে জোর করে দলভূক্ত করাকে সন্দেহাতীত ভাবে অগণতান্ত্রিক বলে বিবেচনা করেন। দুই, খালেদা-নিজামীর সরকারের আমলে এই এলাকায় ভয়ানক লোডশেডিং চলে আসছে। এই শীতের মৌসুমে গ্রাহকরা দিনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৩-৪ ঘন্টার বেশি সময় বিদ্যুৎ পান না। বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় গ্রাহকদের বিদ্যুৎ দিতে এই পবিস ব্যর্থ হয়েছে। তদুপরি বিদ্যুতের অভাবে স্থানীয় এলাকায় স্থাপিত গভীর নলকূপের সেচ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। এতদ্বসত্ত্বেও গ্রাহকদের সবাইকে বিদ্যুৎ ব্যবহার মাত্রা নির্বিশেষে প্রতিমাসে মিটার প্রতি ১২৫ টাকা নিন্মতম মূল্য হিসাবে দিতে হচ্ছে। এর উপরে আদায় করা হচ্ছে মাসিক মিটার ভাড়া। গ্রাহকদের বিবেচনায় মিটার প্রতি ১২৫ টাকা নিন্মতম মূল্য ও মিটার ভাড়া তাদের জন্য প্রকৃত সরবরাহকৃত বিদ্যুতের মূল্যের চেয়ে বেশ বেশি। তাদের মতে এ হলো অর্থনৈতিক জুলুম, সেবা না দিয়ে মূল্য আদায়ের অপর নাম কিংবা তাদের ভাষায় হারামখোরী কারবার। এই এলাকায় পবিসের বিদ্যুৎ বিল আদায়ের হার প্রায় ৯৯%। অন্য

কথায় পবিস, সকল গ্রাহককে অহেতুক ও অন্যায্য মূল্য দিতে বাধ্য করছে। তিন, বিদ্যুতের বিল নিতে, দিতে, সংযোগ পুনঃস্থাপনে ও সংযোগের ক্রুটি দূরকরণে পবিসের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদিগকের হাত ভিজাতে হয়, খুশি রাখতে হয়। যেহেতু এই প্রক্রিয়া পবিসের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের তুষ্টি সাধন করে সেহেতু এসব 'তোলা' নেয়া ও দেয়া দিন দিন বিস্তৃত ও বেশি মাত্রায় বেড়ে চলছে। গ্রাহকদের বিবেচনায় এও একধরণের অর্থনৈতিক শোষণ ও নিকৃষ্ট দুর্নীতি। চার, সাম্প্রতিক কালে পবিসে দুর্নীতির মাধ্যমে অযোগ্য কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। জনপ্রতি ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা ঘুষ ছাড়া কেউ কর্মচারী হিসাবে পবিসে জোট সরকারের এই ৪ বছরে নিযুক্তি পায়নি। স্থানীয় জনগণের মতে এই প্রক্রিয়ায় লাভবান হয়েছে স্থানীয় সাংসদ ও পবিসের ব্যবস্থাপকবৃন্দ। স্থানীয় জনসাধারণ এই ধরণের দুর্নীতির প্রতিকার বার বার চেয়ে এসেছেন।

এই ৪টি অভিযোগ ও দাবী স্থানীয় গ্রাহক ও জনগণের তরফ হতে সংশ্লিষ্ট সাংসদ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং পবিস কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার উপস্থাপন করা হয়েছে। গত বছরের ৩১ অগাষ্ট পবিসের আওতাভূক্ত বিভিন্ন উপজেলা হতে হাজার হাজার লোক কানসাটে সমবেত হয়ে এসব অভিযোগ উথাপন করে তা নিস্পত্তি করার দাবী জানান। পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেসি ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ১৪৪ ধারা মোতাবেক ঐ সমাবেশ বেআইনী ঘোষণা করে। গত ৩১ আগষ্ট শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাবেশ শেষ হলেও পরে জেলা প্রশাসন ও পবিস কর্তৃপক্ষ তথা সরকার এসব দাবীর যৌক্তিকতা মানেননি এবং অভিযোগ সমূহ প্রতিকারে কোনো পদক্ষেপ নেননি। স্থানীয় সাংসদ ও পবিসের চেয়ারম্যান এসব অভিযোগ না শোনার ভান করেছেন। বরং যারা এসব অভিযোগ ও দাবী উঠিয়েছেন, তাদেরকে ভৎর্সনা করেছেন, ভয়-ভীতি দেখিয়েছেন, এমনকি শাসকগোষ্ঠী পালিত সন্ত্রাসীদের দিয়ে দমন করতে চেয়েছেন। স্থানীয় সাংসদ শাহজাহান মিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান বিধায় পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেসি এক্ষেত্রে তার বশংবদ হিসাবে কাজ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অনুসৃত দুর্নীতিতে লাভবান হচ্ছে বলে স্থানীয় সাংসদ, জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিগণ, পবিসের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ফলত সরকার, এক্ষেত্রে কোনো সুরাহা মূলক পদক্ষেপ নিতে পারেনি বলে স্থানীয় আমজনতার ধারণা। এই সব অভিযোগের সুরাহা করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণ গোলাম কুদ্দুস, জহির চৌধুরী ও মনিরুল ইসলাম মান্নার নেতৃত্বে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে বাধ্য হয়।

পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেসির কানসাটে ২০ দিনের ব্যবধানে আবারও গুলিবর্ষণ

এক্ষেত্রে খালেদা-নিজামী সরকারের প্রচণ্ড অহংবোধ ও চণ্ডনীতির প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সরকার কর্তৃক সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইনের উলঙ্গ মাত্রায় লংঘন ঘটেছে। এক, পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসি বিদ্যুতের যথা ইপ্সিত সরবরাহের দাবীতে সংঘটিত সমাবেশ এবং তার অনুকূলে কর্মরত বিদ্যুৎ গ্রাহক ও সংগ্রাম পরিষদকে হঠাৎ করে বেআইনী ঘোষণা করে গুলি চালিয়েছে। সংবিধানের ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসাবে যথাক্রমে চলাফেরা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসির এই কার্যক্রমে নিশ্চিত ভাবে লংঘিত হয়েছে। জানা গেছে যে গুলি চালনার প্রক্রিয়ায় পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসি ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতা অনুযায়ী বিক্ষুব্ধ জনগণকে হুশিয়ার করেনি, লাল পতাকা উড়িয়ে গুলি করার হুকুম ও সিদ্ধান্ত জানায়নি, গুলি করে হত্যার আগে ফাঁকা গুলি করেনি, বিক্ষুব্ধ সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে গুলির আগে লাঠি চার্জ করেনি কিংবা বঙ্গীয় পুলিশ প্রবিধি অনুযায়ী নিম্নতম প্রয়োজনীয় মাত্রায় গুলি করেনি। এক্ষেত্রে তারা ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ১২৭ ও ১২৮ এবং বঙ্গীয় পুলিশ প্রবিধির ১৪১, ১৫১, ১৫৩ ও ১৫৫ ধারা লংঘন করেছে। সংগ্রাম পরিষদের ৩ নেতাকে হত্যাযজ্ঞের পর গ্রেফতার করে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসি ঘৃন্যতম অসংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে ও কারণে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৬৬ ও ৩০২ ধারা অনুযায়ী ফৌজদারি মামলা হতে পারে। দুই, স্থানীয় সাংসদ, পবিস ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও সার্বিক ভাবে সরকারের বিরূপ সমালোচনা ও তাদের কাছে দাবী উত্থাপন, প্লেকার্ড বহন, স্লোগান দেয়া ও মিছিল করার মানবাধিকারের প্রতিকূলে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসি অবস্থান নিয়েছে। পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসির এই কাজ ও তৎপরতা সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সকল নাগরিকদের চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার অধিকার নিঃসন্দেহে লংঘন করেছে। তিন, পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসি স্থানীয় জনসাধারণের তরফ হতে উত্থাপিত বিদ্যুতের সুষ্ঠু সরবরাহের দাবীর প্রতিকূলে এবং পবিস অনুসৃত দুর্নীতির অনুকূলে অবস্থান নিয়েছে। প্রশাসন ও সরকারের তরফ হতে এরূপ অবস্থান নেয়া সংবিধান পরিপন্থী। সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগত ভাবে দূর করার লক্ষ্যে অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মৌল নীতি হিসাবে বিবৃত হয়েছে। স্পষ্টত স্থানীয় প্রশাসন ও সরকার এই মৌল নীতির বিষয়ে জ্ঞাত নন। চার, পবিসের গ্রাহকদের তরফ হতে উত্থাপিত

অযৌক্তিক মিটার ভাড়া ও নিম্নতম সংযোগ চার্জ বিদ্যুতের স্বল্প সরবরাহের প্রেক্ষিতে কমানোর দাবী পবিস, জেলা প্রশাসন ও সরকার বার বার উপেক্ষা করেছে। সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে জনগণের অনগ্রসর অংশ সমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তি দেয়া রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে বিধৃত হয়েছে। তদুপরি ১৯ অনুচ্ছেদে মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে দেয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে এক্ষেত্রে সংবিধানের এই দু'টি বিধান সুস্পষ্ট ভাবে লংঘিত হয়েছে।

সংবিধান সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছে যে এই 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে' (অনুচ্ছেদ ১১)। সুস্পষ্টত কানসাটে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে সরকার সংবিধানের এই দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও মূলনীতি লংঘন করেছে। খুন হওয়া মানুষদের ময়নাতদন্ত করতে না দিয়ে, আছর নামাজের সময় মসজিদে ঢুকে মুসল্লিদের লাঠিপেটা করে এবং অকুস্থল থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে এসে নিরীহ জনতাকে নির্যাতন করে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কানসাট ও শিবগঞ্জে দখলদার বাহিনীর মতো কাজ করেছে (দ্রষ্টব্য, প্রথম আলো, জানুয়ারি ২৫, ২০০৬)। পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি ও পবিসে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মনে রাখা সংগত হবে যে সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল সময়ে জনগণের সেবা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। সর্বোপরি, সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর করণীয়। কানসাটে সরকারি রাইফেলের গুলিতে ১০ জন নিরপরাধ নাগরিককে খুন করে এই সরকার ও তার তল্পীবাহক পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি নিঃসন্দেহে সংবিধানের এই সকল বিধান লংঘন করেছে। সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে সকল সরকারি কর্মচারী ও জনসেবককে প্রদত্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মরত কর্মচারীর মর্যাদা স্থানীয় পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। পবিসের (নির্বাচিত) সভাপতি ও স্থানীয় সাংসদ সংবিধানে প্রদত্ত এসব মৌল নীতি ও মানবাধিকার লংঘন প্রক্রিয়ায় নেপথ্য নায়ক ও সহায়কের ভূমিকা পালন করেছেন। সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ ও ৩য় তফশীল অনুযায়ী সকল সাংসদ আইন অনুযায়ী এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধে কর্তব্য পালনের শপথ নিয়ে থাকেন। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাংসদের কার্যক্রম, নেপথ্যের ভূমিকা ও সুযোগী নির্লিপ্ততা তার নেয়া সাংবিধানিক শপথ ভঙ্গ করেছে বলা চলে।

এই ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে শপথ ভংগের ফৌজদারি দায় বর্তিয়েছে।

জোট সরকারের আইন মন্ত্রী বহুরূপী ও বহুদলোপাগত মওদুদ আহমেদও স্বীকার করেছেন ''The social fabric breaks down once it is found that the essential ingredients of the rule of law and equality are being ignored and undermined by those who govern the society' (Maudud Ahmed, South Asia, Crisis of Development, পৃষ্ঠাঃ ২৩৯)। কানসাটে পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেসি তথা সরকার কর্তৃক ১০ মানুষ খুন দেশের বিদ্যমান সামাজিক বুননকে বিপর্যস্ত করেছে। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে আমজনতা মাঠে নেমেছেন, লাগাতার হরতালে জনজীবন স্তব্দ হয়ে গেছে, সংশ্লিষ্ট সাংসদ, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পবিস সভাপতি ও মহাব্যবস্থাপক অবরুদ্ধ; সোনা মসজিদ স্থল বন্দর বন্ধ, সড়ক ও জনপথ সমূহে ব্যারিকেড, বিক্ষোভ মিছিলে সাধারণ জনতায় ভুক্ত হয়েছেন মহিলারাও (দ্রষ্টব্য, দৈনিক জনকণ্ঠ, সংবাদ, প্রথম আলো, জানুয়ারি ৩১, ২০০৬)। সরকারের তরফ হতে শাস্তি হিসাবে কেবলমাত্র থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে (শাহাবুদ্দিন খলিফা) বদলী করা হয়েছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সারওয়ার চৌধুরী ও পুলিশ সুপার রেজাউলের উপস্থিতিতে ও কথিত নির্দেশে কানসাটের নিরীহ জনগণ, বিশেষত মহিলা ও শিশুদের উপর পাকিস্তানী আমলকেও ছাড়িয়ে যাওয়া নির্যাতনের বিহিত এখনও ঘটেনি। আমাদের জানামতে থানা নির্বাহী অফিসার (রফিকুল ইসলাম) স্থানীয় জনতার উপর নির্যাতন বন্ধকরণে কোনো পরামর্শ দেননি বা ভিন্নতর পদক্ষেপ নেননি। জনরোষ, পথরোধ, বিক্ষোভ ও হরতাল এই এলাকায় লাগাতার চলছে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইন লংঘন করে সরকারি যন্ত্রকে মানুষের উপর অত্যাচারের খড়গ হিসাবে ব্যবহার করলে বিক্রমশালী দূরাত্মাকে যে অবরুদ্ধ হয়ে বিদায় নিতে হয় কানসাটে তাই প্রতিফলিত হয়েছে। এই বছরের ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় গত বছর ২৭ জানুয়ারির কপট রাত্রির ছায়ে গোপন হিংসার শিকার হিসাবে সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়ার খুন হওয়ার কথা স্মরণ করে জননেত্রী শেখ হাসিনা কানসাটের নির্মম রাষ্ট্রীয় খুন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশব্যাপি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলার আহব্বান জানিয়েছেন। স্মরণ করেছেন ১৯৯৫ সালে খালেদা জিয়ার শাসনামলে সারের দাবীতে সমবেত চাষিদের মধ্যে সরকারি সন্ত্রাসে খুন হওয়া ১৮ জন নাগরিকদের কথা। বলেছেন জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষাকরণের কবচ সংবলিত সংবিধান ভংগ করণের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক শাস্তি আরোপণের কথা। এক কালের শোষণের প্রতিকূলে সংগ্রামের কিংবদন্তী ইলা মিত্রের স্মৃতি বহতা চাপাই নবাবগঞ্জের কানসাটে খালেদা-নিজামী সরকারের

হাতে খুন হওয়া নিরপরাধ ১০ নাগরিকদের বিদেহী আত্মা সারা দেশ ব্যাপি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও শোষণ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিয়ে বলেছেঃ পরাজিত হওয়ার জন্য মানুষের জন্ম হয়নি। মানবাধিকার সম্বলিত মানুষের জন্ম নিয়ে বেড়ে উঠার যৌক্তিকতা প্রমাণের লক্ষ্যে এই ধরণের মানবতা ধ্বংসী জালেম সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপি জেগে উঠার এখুনি সময়। এ না হলে এই জালেম সরকারের গণ হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার অন্য কোনো পথ নেই।

এই কলাম লেখার সময় পর্যন্ত চাপাই নবাবগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেসি সংগ্রাম পরিষদের ৩ নেতাকে জামিনে মুক্তি দেয়নি। দৃশ্যত জনগণের ন্যায় সংগত দাবী উত্থাপন করে এই তিন নেতা দেশের সংবিধান ও তার আওতায় বলবৎ করণীয় আইনের প্রতিকূলে কোনো অপরাধ করেননি। পত্রিকান্তরে জানা গেছে যে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জামিন না দেয়ার যুক্তি হিসাবে দাম্ভিকতা দুষ্ট উক্তি করেছেনঃ চাপের মুখে কাজ না করার পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও শক্তি জেলা প্রশাসনের আছে। একজন সাবেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে এই তরুণ এবং এই কারণেই সম্ভবত এখনও অপরিপক্ক প্রশাসক ও তার সহকর্মীদের প্রতি আমার নিবেদনঃ জনগণকে অবদমিত করণ নয়, তাদের অধিকার ও কল্যাণ রক্ষা ও বিস্তৃত করণই প্রজাতন্ত্রে কর্মরত সকল ব্যক্তির কর্তব্য ও দায়িত্ব। এই কর্তব্য ও দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হলে সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে কোনো শক্তিই অন্যায় ও আইন লংঘনকারীকে রক্ষা করতে পারে না। ১৯৬৯-এ পাকিস্তানের স্বৈর শাসক আইয়ুব খানও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তথা কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে নিঃশর্তে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। একালে বাংলাদেশে খালেদা-নিজামীর তত্ত্বাবধানে সেকালের পাকিস্তানী শাসনের পাবন্দ কিংবা অনুসারীরা একথা ভোলেন কি করে?

দৈনিক জনকণ্ঠ, ফেব্রুয়ারি ৬, ২০০৬

একুশের ভাবনা : ২০০৬

১৯৫২ সালের গৌরব দীপ্ত সেই ভাষা আন্দোলনের সময়ে আমি ঢাকায় ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে প্রতীতি আর সঙ্কল্পের দীপ্ত পদভর শ্লোগান মুখর মিছিলের পর মিছিলের ছবি ৫৩ বছর পর এখনও চোখে ভাসে। ভাষা শহীদদের ত্যাগ, ভাষা সৈনিকদের আনুগত্য, ভাষাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন, জীবনে এখনও-না-পাওয়া অর্জনকে হাতের মুঠোয় আনার দিকে মন ও মানসকে স্পন্দিত ও তাড়িত করে। ২০০৬-এ একুশকে ঘিরে ভাবনা গুলো আঁধার ছড়ানো রাতের শেষ প্রান্তে হাজারও তারার ভাষায় লেখা মানুষের ইতিহাসের স্থির ঠিকানায় অবিচল প্রতীতিকে সাধনার সঙ্কল্পে অববায়িত রাখে।

আমার ভাবনায় এই সাধনার প্রথম পর্যায় বাংলা ভাষার এদেশে সর্বজনীনায়ন। এই লক্ষ্য অর্জনের কর্মসূচিতে ৪টি মৌল উপকরণ থাকা প্রয়োজন। এক, বলনে বাংলা সর্বজনীন, কিন্তু লিখনে এখনও সর্বজনীন নয়। বাংলা লিখনে সকলে সক্ষম না হলে সর্বজনীনায়ন সম্পূর্ণ হয় না। আর লিখনে সর্বজনীন করার জন্য প্রয়োজন হবে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনায়ন। দেশে এই সময় ৬টি সিটি করপোরেশন, ২২৩টি পৌরসভা ও ৮৭৩১৯টি গ্রাম বিদ্যমান। এসব এলাকায় শিশু মনের বিকাশ সাধক বিদ্যালয় (কিন্‌ডার্‌গার্টেন্‌), এবতেদায়ী মাদ্রাসা, মাধ্যমিক স্কুলের অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে এই সময়ে মোট ৬৩৩৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। গড়ে ন্যূনপক্ষে প্রতিটি গ্রাম এবং শহর এলাকায় প্রতিটি মহল্লার জন্য একটি প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান না গড়ে তুললে ও না পরিচালনা করলে প্রাথমিক শিক্ষা তথা লিখনে বাংলা ভাষার ব্যবহার সর্বজনীন করা যাবে না। দশ থেকে বারো বয়োবর্গের সকল শিশুকে প্রাথমিক

শিক্ষার আবরণে না এনে বলনে ও লিখনে বাংলা ভাষার ব্যবহার সর্বজনীন হবে না। বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূলীয় এলাকা, সাঁওতাল ও গারো অধ্যুষিত আদিবাসী গ্রাম ও ছিটমহলে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিতান্তই অপ্রতুল। এসব এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অপ্রতুলতা দশ থেকে বারো বয়োবর্গের প্রায় ৫০% শিশুদেরকে এখনও নিরক্ষরতার স্থবিরতায় বেঁধে রেখেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই ক্ষেত্রে ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত জোট সরকারের কোনো লক্ষ্যণীয় তৎপরতা দেখা যায়নি। যেখানে প্রয়োজন সেখানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিবন্ধন দেয়া হয়নি, বেসরকারি পর্যায়ে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন উৎসাহিত করা হয়নি। তদুপরি প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক নির্বাচন ও নিযুক্তিতে দলবাজী ও দুর্নীতি সলেখ সাক্ষরতা বিস্তৃত করণের এই মৌল ভিত্তিতে নীতিভ্রষ্টতার শেকড় ঢুকিয়ে ও গজিয়ে দিয়েছে। ২০০১ সালে শেখ হাসিনার শাসনামলের শেষ বছরে ৬৫% এ উন্নীত দেশের সার্বিক সাক্ষরতার হারকে নিচে নামিয়ে আনার অশুভ সম্ভাবনাকে শিক্ষা বিষয়ক গোষ্ঠী স্বার্থিক পরিকল্পনার দেহলিতে নিয়ে এসেছে।

দুই, বাংলা ভাষার ব্যবহার ও অনুশীলন বিস্তৃতির লক্ষ্যে সাধনার দ্বিতীয় পর্যায় শিক্ষা ও ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর ব্যবহার। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর একক নির্দেশে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ও নিম্ন আদালত ও শিক্ষা পর্যায়ে বাংলার ব্যবহার প্রায় সর্বজনীন হয়েছে, কিন্তু উচ্চ আদালত, উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং বৃহৎ ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার প্রায় অনুপস্থিতির বৃত্তে এখনও বাঁধা পরে আছে। সংবিধানের ৩য় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় সাংবিধানিক ভাবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেয়া ও উন্নত করণ ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অবদান। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার ব্যবহার সময়ান্তরিক, ব্যতিক্রম সংবলিত কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে রেয়াত মূলক নয়। এতদসত্ত্বেও এখন পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে বাংলার ব্যবহার অপাংক্তেয় রয়ে গেছে। জানা গেছে যে একবার একটি মাত্র রায় বাংলায় লেখা ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ তাদের কোনো রায় বা নির্দেশ ইংরেজী ছাড়া বাংলায় দেননি বা দিতে সক্ষম হননি। ছাত্র জীবনে একুশের প্রভাতফেরীতে অগ্রগামী হাল আমলের জনৈক বিচারপতি নাকি তার বিচার কক্ষে কোনো আইনজীবীকে বাংলায় বক্তব্য পেশ করতে দিতেও নারাজ থাকেন। উচ্চ আদালতে ব্যবহৃত

আইনী প্রত্যয় মূলক শব্দাদি বাংলায় রূপান্তরণ দুরুহ স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, সাংবিধানিক বাধ্যকতা এক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইংরেজীর ব্যবহারকে কোনো বিচারেই বৈধতা দেয় না। উপরন্ত, বাংলা ভাষায় বিচার প্রক্রিয়া এই পর্যায়ে পরিচালিত না হলে অধিকাংশ বিচার প্রার্থীর জন্য উন্মুক্ত আদালতে বিচারিত হওয়ার অধিকার ক্ষুন্ন হয়। এই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট যত তাড়াতাড়ি ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবেন তত তাড়াতাড়িই বিভ্রান্তি দূর হবে। উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিভাষা ও মানসম্পন্ন বইয়ের অভাব বাংলার ব্যবহার সীমিত করে রেখেছে। বিশেষ করে প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বাংলার ব্যবহার নেই বললেই চলে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার ব্যবহার পূর্ণাঙ্গ ভাবে অনুপস্থিত। কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষা বা সাহিত্যর উপর কোনো পাঠক্রম গ্রহণ বা চালু করেনি। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস কমিশন, বিভিন্ন গণবিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমী সময়বদ্ধ কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিভাষা উদ্ভাবন ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন বিস্তৃত করে এইসব ব্যত্যয় দূর করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের তরফ হতে কোনো দৃশ্যমান তৎপরতা সাম্প্রতিক কালে দেখা যায়নি। বিশেষত জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কর্মপরিধিতে বাংলার ব্যবহার বাড়াতে পারত। এক্ষেত্রে এ দু'টি গণবিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার প্রতি আনুগত্য দেখাতে সক্ষম হয়েছে বলা চলে না। ইংরেজীর সাথে সাথে বাংলাকে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যম হিসাবে প্রচলন ও ব্যবহার বাংলাকে সমৃদ্ধ এবং ইংরেজীকে এদেশে প্রয়োগ-বান্ধব ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি ও বিস্তৃতি উভয়ই দিতে পারে।

তিন, এদেশের আদিবাসী শিশুরা আজও মাতৃভাষায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত (দ্রষ্টব্য, প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০০৬)। বাংলাদেশের ৪৫টি আদিবাসীদের ৩০টি ভাষা আছে। রাজশাহীতে দু'টি স্কুলে সাঁওতাল এবং মৌলভীবাজারে একটি স্কুলে মনিপুরীরা খুব সীমিত পর্যায়ে নিজ মাতৃভাষায় পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে। জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠী নিজ ভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকারী। বাংলাদেশ ঐ সনদের অন্যতম স্বাক্ষরকারী। ১৯৯৭ সালে শেখ হাসিনার শাসনামলে ঐ সনদ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের অনুকূলে একটি আইন গৃহীত হয়েছে। এই আইন অনুগামী কার্যক্রম গ্রহণ জোট সরকারের আমলে অনুচ্চারিত। গবেষণায় জানা গেছে যে ভাষা সমস্যার কারণে শিশু শ্রেণী ত্যাগ করার আগে ৫০% আদিবাসী শিশু বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়। অধিকাংশ আদিবাসী ভাষা কথিত, সুনির্দিষ্ট বর্ণমালা বিহীন এবং

ফলত অলিখিত। এই ক্ষেত্রে তাদের মাতৃভাষার সাথে বাংলার সুষম ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা শেখার সাথে সাথে বাংলা বর্ণমালায় আদিবাসীদের ভাষা লেখা ও পড়ার ব্যবস্থা করা লক্ষ্যানুগ হবে। জানা গেছে যে সাঁওতালরা তাদের বর্ণমালা 'অলচিকি' থাকা সত্ত্বেও সাঁওতালী ভাষার জন্য বাংলা বর্ণমালা গ্রহণ ও ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যান্য আদি ভাষার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বা লাগসই বর্ণমালা না থাকলে বাংলা বর্ণমালা গ্রহণে তাদের উৎসাহিত করা যেতে পারে। ফলত মাতৃভাষার অধিকার রক্ষা করার সাথে সাথে বাংলার প্রয়োগ ও ব্যবহার বাড়বে, দেশের অন্যান্য মাতৃভাষার সংস্পর্শে বাংলা সমৃদ্ধতর হবে এবং জাতি সাংস্কৃতিক সংহতি অর্জন করতে পারবে। ফলত সকল বাঙালির জন্য বাংলা বর্ণমালার এক একটি অক্ষর এক একজনের প্রাণ হয়ে গৃহীত ও বিকশিত হয়ে উঠবে।

চার, বৃহৎ ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার সীমিত। ১৯৭১ থেকে '৭৫ পর্যন্ত এসব ক্ষেত্রে বাংলার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। ক্ষমতা দখলকারী পুরানো উর্দিওয়ালাদের আপেক্ষিক ভাবে ইংরেজি (অশুদ্ধ) ব্যবহার ও উর্দু প্রীতি ১৯৭৫ থেকে '৯৫ পর্যন্ত এক্ষেত্রে শাসকের শক্তি অনুগামী বাংলার ব্যবহারে অনীহা সৃষ্টি করেছে। অবশ্য একই সময়ে অপেক্ষাকৃত নবীন সামরিক অফিসারদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় সামরিক বাহিনী সমূহে বাংলার প্রচলন লক্ষ্যণীয় মাত্রায় বেড়েছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত শেখ হাসিনার শাসনামলে সরকারি নীতির পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ার অবয়বে ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার স্তিমিত হয়নি। হাল আমলে এসব ক্ষেত্রে সরকারি আনুকূল্যের বৃত্ত থেকে বিতাড়িত হওয়ার শংকায় বাংলার ব্যবহার কমে যাচ্ছে, ইংরেজীর ব্যবহার বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। মুক্ত বাণিজ্য, বিশ্বায়ন ও প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের মহামন্ত্র নাকি ইংরেজী অনুকূল ও বাংলা ও অন্যান্য মাতৃভাষা প্রতিকূল। কিছু অর্ধসত্যের উপকরণ এই উক্তিতে হয়ত আছে। তথাপিও বলা চলে, সাংবিধানিক বাধ্যকতা অনুযায়ী ইংরেজীর সাথে বাংলার ব্যবহার ও প্রয়োগকে এসব ক্ষেত্রে যদি বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ, বিনিয়োগ বোর্ড, শুল্ক বিভাগ, সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন ও শুল্ক বিভাগ গুরুত্ব দেন তাহলে ইংরেজীর বোধগম্যতার সাথে বাংলার ব্যবহারও বিস্তৃত ও সাবলীল হবে। কমপিউটারে বাংলায় অক্ষর প্রক্রিয়াকরণ এই পর্যায়ে ব্যাপক ও সাবলীল হয়ে গেছে। বাংলায় ওয়েব সাইট সৃজিত হয়েছে। হিসাব রক্ষণ, গাণিতিক ও

পরিসংখ্যানীয় প্রয়োগ বাংলায় সফল ভাবে অবতারিত হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ে বাংলায় কোমল সম্ভার উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে। বাইনারি ও এলগারিথমের পরিমণ্ডলে পরিচিতির সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বেশ সংখ্যক বাঙালি কমপিউটারের গ্রাহক নির্দিষ্ট কোমল সম্ভার উদ্ভাবনে ব্রতী হয়েছেন। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের বহুল প্রচারিত ই-শাসন বা ই-গভার্নেন্সের সংশ্লিষ্ট শিট গুলো যদি বাংলায় লভ্য ও প্রচার করার পদক্ষেপ নেয়া হয় তাহলে সেসব লোকায়ত মাত্রায় কর্মানুগ ও বাংলা ভাষার ব্যবহার বিস্তৃত করণের লক্ষ্যানুগ উভয়ই হবে। সাক্ষরতা বিস্তৃতি বা বলনের সাথে লিখন-পড়নের প্রসার ই-শাসনকে অধিকতর ব্যাপ্ত ও ফলপ্রসূ করবে। অশিক্ষিত সমাজে ই-শাসন প্রহসন মূলক বিলাসিতা---একথা মনে রাখা সংগত হবে। বলা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে ইংরেজী বিশ্বব্যাপি উচ্চতর কমপিউটিং এর ভাষার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতে ইংরেজীর সাথে যোগসূত্র রক্ষা করা এবং বাংলা ও ইংরেজী দু'য়েরই প্রয়োগ বাংলাকে কমপিউটিং এর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রয়োগ যোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা দেবে। বাংলার সমৃদ্ধির জন্য বাংলাকে সন্দেহতীত ভাবে প্রযুক্তি উন্মুক্ত রাখতে হবে। কিন্তু এই প্রযুক্তিকে বাংলা-বান্ধব করে গ্রহণ, ব্যবহার ও বিকাশের কোনো সড়ক-মানচিত্র এই সরকার এখনও উন্মোচিত করতে পারেনি।

সমকালে বাংলা ভাষার সাধনার দ্বিতীয় পর্যায় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে ভাষা আন্দোলনের মূল্যবোধ ও দর্শন অর্জনকে বিবেচনা ও প্রসার করা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রতীতির সাধনায় এদেশে ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক মৌল ভিত্তি এই শতাব্দীর প্রথম দিকে গভীর ভাবে অনুধাবনের পরিধি এখনও বিস্তৃত। সমাজ গড়নে ও ব্যবস্থাপনায় সকল মানুষের সুযোগের সমতা বিধান গত শতাব্দীর ৫০ এর দশকের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম মৌল ভিত্তি হয়ে কাজ করেছে। সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল নীতি হিসাবে সুযোগের সমতা বিধানকে গ্রহণ করার পেছনে কাজ করেছে ভাষা আন্দোলনে গ্রন্থিত এই দর্শন। মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে ভিন্নতর ভাষা কৃত্রিম ভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন আদালত ও প্রশাসনের ভাষা হিসাবে চাপিয়ে দিলে মা'য়ের ভাষায় কথা বলতে শেখা মানুষের সুযোগের দরোজা দাম্ভিকতার জোরে লালিত ও পোষিত ব্যক্তিদের তুলনায় সীমিত হয়ে যায়। কার্যকরণ সূত্র অনুযায়ী এই অনুধাবনের অর্থ হলো সমাজের সকল ক্ষেত্রে বিকশিত হওয়ার সুযোগের সমতা স্থাপন ও প্রসার। এই অনুধাবিত মূল্যবোধের

বিকল্পে হাল আমলে দেখা যাচ্ছে দলবাজি ও দুর্নীতির বলে গোষ্ঠী বিশেষের অনুকূলে আর্থ-সামাজিক সুযোগের বৃত্তায়ন। গণবিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তি, সরকারি চাকুরিতে নিযুক্তি, সরবরাহ ও ঠিকাপ্রদান প্রক্রিয়া, রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ-সহায়তা, বিধবা ও বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তি, কাবিখা/কাবিটা জাতীয় কার্যক্রমের প্রয়োগ, এমনকি বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বিস্তার ইত্যাকার ক্ষেত্রে শাসক দলীয় আনুগত্য ও সন্তোষের উপকরণ হাতে তুলে দেয়ার ও নেয়ার এই সরকারের প্রবৃত্তি ও কার্যক্রম একুশ থেকে প্রাপ্ত সুযোগের সমতা বিধানের সূত্রকে পরিহাস করে দূরে ঠেলে দিয়েছে। সুযোগের সমতা বিধানে যে দর্শন ভিত্তিক সমর্থন ভাষা আন্দোলন জাতিকে উপহার দিয়েছে তা এই কয়েক বছরের দলীয় দূর্বৃত্তায়নের অশুভ প্রক্রিয়া থেকে সমষ্ঠিগত ভাবে আমাদেরকে মুক্ত করতে হবে।

আমাদের জাতিগত সাধনায় ভাষা আন্দোলন বাক্, বিবেক, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা উপহার দিয়েছে। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম ফলশ্রুতি হিসাবে দেশের সংবিধানের ৩৬ থেকে ৩৯ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসাবে বাক্, বিবেক, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা বিধৃত হয়েছে। এই চার বছরে জোট সরকারের শাসনামলে এই চার স্বাধীনতা বার বার নির্লজ্জ ও বেপরোয়া মাত্রায় লংঘিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী সমূহকে এই সরকার নাগরিকদের মানবাধিকার বলবৎ করণে নয়, বিকৃত মাত্রায় লংঘন করণে প্রযুক্ত করে আসছে। নিম্ন পর্যায়ের আদালত ও সার্বিক ভাবে নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রমে মৌলিক মানবাধিকার সমূহ বলবৎ ও প্রসারকরণে তৎপরতা সবসময় ও সকল কাজে অনুপস্থিত বলে প্রতিভাত হচ্ছে। ২০০১ এর ১০ অক্টোবর থেকে ২০০৫ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে (১) হত্যার অপরাধ ঘটেছে ৩৭৮৬২টি, (২) রাজনৈতিক নিপীড়নে আহত হয়েছেন ১৬০৯২৩ জন, (৩) নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ ও অত্যাচারের সংখ্যা হয়েছে ৬৫৭৪২ জন, (৪) বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হয়েছে ১ লক্ষেরও বেশি, (৫) এসব মামলার শিকার হয়েছেন ৬ লক্ষাধিক ব্যক্তি, (৬) বেআইনী জায়গা-জমি দখল, চাঁদাবাজি, ছিনতাই অপহরণের অপরাধ ঘটেছে ২১ লক্ষ ৩২ হাযারেরও বেশি এবং (৭) সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১৫ লক্ষ ১২ হাজার (দ্রষ্টব্য, মহীউদ্দীন খান আলমগীর, পুলিশ ও প্রশাসন ঃ ২০০১-২০০৪, দৈনিক জনকন্ঠ, নভেম্বর ৯, ২০০৫)। একুশ মানেই মাথা নত না করার দর্শন এসব মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড রুখে দাঁড়ানোর আহব্বান জানাচ্ছে এই ২০০৬-এ।

জোট সরকারের শেষ বছর

ভাষা আন্দোলনে এদেশের মানুষের সংগ্রাম ও ত্যাগের পৃথিবী ব্যাপি স্বীকৃতি এসেছে ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃতি দেয়ার ফলে। এই স্বীকৃতির পর পরই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার করার সিদ্ধান্ত ও প্রকল্প গ্রহণ করেন। সকল মাতৃভাষার সংশ্লিষ্টতায় বাংলাকে ফুটিয়ে তুলে, বাঙালির ভাষার প্রতি আনুগত্য ও মমত্ববোধ গৌরবের গাথা হিসাবে বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে দিয়ে এবং সকল মাতৃভাষীদের মানবিক অধিকার বিষয়ে বিস্তৃত সোহার্দবোধ গড়ে তুলে বাংলা ভাষাকে চিরায়ত গৌরবে ভাস্বর করতে প্রণীত হয়েছিল এই প্রকল্প। অগ্রাধিকার দিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছিল সেই বছরই। প্রতিক্রিয়াশীল স্থবিরতার প্রতিভূর ভূমিকায় সাহাবুদ্দিন-লতিফ গংরা ২০০১ এর অগাষ্ট মাসে এই প্রকল্পের কাজ স্থগিত করে। পরে তেমনি খালেদা-নিজামীর সরকার ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিভূ হয়ে সাহাবুদ্দিন-লতিফের সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই প্রকল্পের কাজ এখনও শুরু করেনি। আইয়ুব-ইয়াহিয়া গোষ্ঠী বাংলা ভাষা, বাংলার গৌরব, বাঙালির ঐতিহ্য ও অর্জনের বিরুদ্ধে যা করতে চেয়েছিল খালেদা-নিজামীর সরকার আন্তর্জাতিক ভাষা ইনষ্টিটিউটের কাজ বন্ধ রেখে তাই যেন করতে চেয়েছে। বিজাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আনুগত্যের এইসব উত্তরাধিকারীদের ক্লেদাক্ত পরিচিতি ২০০১ এর ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের ভুলে যাওয়া কোনো বিচারেই সংগত হবে না।

দৈনিক জনকন্ঠ, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০০৬

পাকিস্তান ফেরত খালেদা জিয়া : মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কথা

এই ফেব্রুয়ারিতেই খালেদা জিয়া পাকিস্তান সফর করে ফিরে এসেছেন। পত্রিকান্তরে সরকারি ভাষ্যঃ সফর সফল হয়েছে। পাকিস্তান নাকি বাংলাদেশকে সবরকম সহযোগীতা ও সহায়তা দেবে। বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান মুক্তবাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করতে ঐকমত্যে পৌছেছে। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সকল সহযোগিতা ও সহায়তার মধ্যে পাকিস্তানের সাথে এই মুক্তবাণিজ্য চুক্তিকরণের পাঁয়তারা আমার কাছে বাংলাদেশের বিদ্যমান সরকার কর্তৃক পাকিস্তানী প্রভূদের পাবন্দী করার খান্নাস সদৃশ্য মীরজাফরীয় পদক্ষেপ বলে মনে হয়েছে।

গত শতাব্দীর '৬০-এর দশকে এদেশের অর্থনীতির এক ডাকসাইটে অধ্যাপক ড. আখলাকুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত ম্যাসাচুসেটস্ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজিতে এক অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করেছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তানের পটভূমিকায় এই অভিসন্দর্ভে তিনি ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ, বিভাগ পরবর্তীকালে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের সংযুক্তকরণ ও অর্থনৈতিক সংহতিয়ন এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছিলেন। এই অভিসন্দর্ভে তিনি বলেছিলেন, ভারত বিভাগের পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংযুক্তি এই দুই অঞ্চলের বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুততম সময়ে বাড়িয়েছিল এবং রাজনৈতিক প্রভূত্বের মোড়কে বা বলে অর্থনৈতিক সংযুক্তি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে মূলত মুক্তবাণিজ্যের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক শোষণের উর্বরতম ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেছিল। এই শোষণের ফলে সৃষ্ট হয়েছিল ভীষণ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চারিত কণ্ঠ তুলেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক, আজকের সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের

(সিডিপি) চেয়ারম্যান, রেহমান সোবহান। আর তার বিপরীতে তৎকালীন শোষক সরকারের সমর্থনে, অন্যদের মধ্যে মাঠে নেমেছিলেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. এস. এম. আখতার। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান অর্থনীতি সম্মেলনে উপস্থাপিত এক নিবন্ধে ড. আখতার নির্লজ্জ ভারে বলেছিলেন অর্থনৈতিক উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য একেবারে দূর করা কখনই সম্ভব নয় এবং এই প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের তৎকালীন সংবিধানে গ্রন্থিত আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের বিধান (অনুচ্ছেদ-১৪৫) সংশোধিত হওয়া সংগত। বলেছিলেন, উন্নত পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকতর উন্নয়ন সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন বাড়াবে এবং সেজন্য পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানেই আগের দশকের মতো অধিকতর বিনিয়োগ করা সংগত (দ্রষ্টব্য, Dr. S. M. Akhtar, Problem of Regional Disparities in Economic Development, নিখিল পাকিস্তান অর্থনীতি সম্মেলন, পেশোয়ার, মার্চ ১৯৬৫)। ঐ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকার দুর্ভাগ্য আমারও হয়েছিল।

নিখাদ অর্থনীতির অনুসারী হিসাবে দুর্ভাগ্য এখনও আমার। পাকিস্তান ফেরত বাংলাদেশী প্রধানমন্ত্রীর সফর-সফলতার সূচক হিসাবে বাংলাদেশের পাকিস্তানের সাথে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি করণের ঐকমত্যের মারহাবা প্রত্যাশী ওয়াজ-মরতুবা আবার শুনতে হলো প্রায় ৫০ বছর পরে। মুক্তবাণিজ্যের মূল কথা, চুক্তির পক্ষাধীন দেশদ্বয়ের মাঝে দ্রব্য, পণ্য ও সেবার শুল্কবিহীন বাণিজ্য তথা আমদানী ও রপ্তানী। মুক্তবাণিজ্য চুক্তির আওতায়, উদাহরণত বাংলাদেশ পাকিস্তানে অবাধে শুল্কবিহীন পান ও সুপারি রপ্তানী এবং পাকিস্তান থেকে সুতা ও কাপড় আমদানী করতে পারবে। মুক্তবাণিজ্য চুক্তির বাইরে অন্য দেশে, উদাহরণত ভারত ও শ্রীলঙ্কায়, বিনা শুল্কে পান-সুপারি যাবে না, সেখান থেকে সুতা-কাপড় কিংবা কলকব্জা বিনা শুল্কে বাংলাদেশে আসবে না। পাকিস্তান আমলের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে মূলত ভৌগলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন দু'টি অর্থনৈতিক একক হিসাবে ধরলে এ দু'টি এলাকা (ড. আখলাকুর রহমানের ভাষ্য অনুযায়ী) একক রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় মুক্তবাণিজ্য রত দু'টি পৃথক অঞ্চল ছিল। একক রাজনৈতিক কাঠামোয় মুক্তবাণিজ্যের বেড়াজাল জোর করে চাপানো হয়েছিল এই দু'টি ভৌগলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের উপর। রাজনৈতিক প্রভূত্বের বলয়ে তথা জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সঞ্চয়, বিশেষত পাট

রপ্তানী প্রসূত বিদেশী মুদ্রা অবাধে ও প্রায় সর্বাংশে স্থানান্তর হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গণখাতে অবকাঠামো গড়ার সাথে সাথে অধিকতর বিনিয়োগের জন্য অধিকতর সঞ্চয় ও বিদেশী মুদ্রা বরাদ্দ হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, অধিকতর বিদেশী মুদ্রা বরাদ্দ ও উন্নতর অবকাঠামোর ভিত্তিতে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিল সেখানে, আর সেসব শিল্পজাত পণ্যাদির জন্য মুক্ত ও বিস্তৃত বাজার হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক আনুকূল্যে পশ্চিমে পাকিস্তানীদের মূলত তাদের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার বলয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক, বীমা ও সংশ্লিষ্ট সেবামূলক বাণিজ্যের বাজার বিস্তৃত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে। অর্থনীতির ভাষায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এরূপ বাণিজ্য সৃজনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বেশি উপযোগ পেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান। অন্যান্য দেশ থেকে আমদানীয় পণ্য সামগ্রীর উপর শুল্ক আরোপ করে তাদের সাথে বাণিজ্যের দিক পরিবর্তন করে পশ্চিম পাকিস্তানের পণ্য সামগ্রীর আমদানীর দরোজা অবারিত করে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। সেই পটভূমিকায় বাংলার সিংহ পুরুষ বঙ্গবন্ধু জবাব চেয়েছিলেন, সোনার বাংলা শ্মশান কেন? ঘোষণা করেছিলেন অর্থনৈতিক স্বশাসনের সেই ঐতিহাসিক ৬ দফা, যার মই বেয়ে স্বল্পতম সময়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার অমর অবিনাশী জাগৃতির আহব্বান----যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে অনুরণন করেছিলাম আমরা সকল বাঙালি এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। স্বাধীনতা অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, বিশেষত বাণিজ্য সৃষ্টির উপযোগ নেয়ার সকল দরোজা খুলে দিয়েছিল বাংলাদেশের জন্য।

যে অর্থনৈতিক শোষণের প্রক্রিয়া ১৯৭১ সালের আগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপর পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে প্রকৃত মুক্তবাণিজ্যের মাধ্যমে আরোপিত করা হয়েছিল, অধ্যাপক আখলাকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এখন বিপরীত দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে সমকালীন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে খালেদা জিয়া কর্তৃক রাজী-হয়ে-আসা পাকিস্তানের সাথে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি তা আবার অবারিত করবে। ২০০১ সালে পাকিস্তানে বাংলাদেশের রপ্তানী ২৩০ কোটি টাকা, আমদানী, ৫২২ কোটি টাকা হয়ে ছিল অর্থাৎ পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের প্রতিকূলে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ হয়েছিল ২৯২ কোটি টাকা। হাল আমলে পাকিস্তানে রপ্তানীর পরিমাণ কিছু বেড়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে

আমদানী। এই সময়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানে যা রপ্তানী করে তার দ্বিগুণের চেয়ে বেশি পাকিস্তান থেকে আমদানী করে থাকে। পাকিস্তানে মূলধন-দ্রব্যাদি ও ভোগ্য পণ্যাদির উৎপাদন ক্ষমতা বাংলাদেশ থেকে অধিকতর বিস্তৃত। এই প্রেক্ষিতে অন্যান্য দেশ থেকে আমদানীয় দ্রব্য ও পণ্য সামগ্রীর উপর শুল্ক আরোপিত রেখে পাকিস্তান থেকে আমদানীয় দ্রব্য ও পণ্যাদির উপর সকল শুল্ক খালেদা কর্তৃক রাজী-হয়ে-যাওয়া মুক্তবাণিজ্য চুক্তির আওতায় প্রত্যাহার করলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের করায়ত্ব বাজারে পর্যবশিত হবে, বাংলাদেশে সকল ক্ষেত্রের শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হবে। এর সাথে সাথে পাকিস্তান এই দেশে ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান, পরিবহন ব্যবসা ও হোটেল স্থাপন করতে পারবে। উদাহরণত দুর্নীতিতে বিপর্যস্ত বাংলাদেশ বিমানের পরিবহন খাত বা পরিধি পিআই-এ দখল করতে পারবে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি হওয়ার ঘোষণার পর পরই প্রায় ২০টি কাপড়ের কল পাকিস্তানীরা বাংলাদেশে স্থানান্তর বা স্থাপন করবে বলে ঘোষণা করেছে। ফলত ১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ মূলক বাণিজ্য ব্যবস্থায় আমরা ফিরে যাব। পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রভূত্ব ও কর্তৃত্বের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করার পরও আমরা পাকিস্তানের সাথে অর্থনৈতিক সংহতির বেড়াজালে ধরা দেব। পাকিস্তানের সাথে একক ভাবে মুক্তবাণিজ্য চুক্তির ফলে সম্ভাব্য বাণিজ্য সৃজনের প্রতিক্রিয়া (trade creation effects) অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যের দিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াকে (trade diversion effects) অতিক্রম করে কোনো নিট উপযোগ দেশের জন্য আনতে পারবে না। ১৯৭১ সালে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা যে শোষণের নাগপাশ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিলাম, এই সময়ে পাকিস্তানের সাথে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি করে সেই নাগপাশে আমরা আবারও আবদ্ধ হবে। সবচেয়ে লাভবান ও খুশি হবে পাকিস্তান, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে বাংলাদেশ, বিপর্যস্ত হবে বাংলাদেশের মুক্তি আর স্বাধীনতার দর্শন। খালেদা জিয়া-মোর্শেদ খান সহ পাকিস্তানের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কুশীলবরা হয়ত এই প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক কমিশন কিংবা পাকিস্তানী তন্দরী রুটি কাবাবের তন্দুরস্তির দস্তর খানা থেকে পোষা জানোয়ারকে ছুড়ে দেয়া উচ্ছিষ্ট পেতে পারেন, কিন্তু জাতিকে বাণিজ্য সৃষ্টির নিট উপযোগ দিতে বা দেখাতে সক্ষম হবেন না।

আর পাকিস্তান থেকে সব রকম সহযোগিতা ও সহায়তা পাওয়া? ইতিহাস এ পাওয়ার সম্ভাবনার অনুকূলে সাক্ষ্য দেয় না। পাকিস্তান এতদিন পর্যন্ত (১)

স্বাধীনতা পূর্বকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে হস্তান্তরিত নিট সম্পদ, (২) ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের অর্থাৎ স্বাধীনতা ঘোষণার সময়ের স্থিতি অনুযায়ী তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশী মুদ্রা ও অন্যান্য সম্পদের জনসংখ্যার মানে বাংলাদেশের প্রাপ্য পাওনা, (৩) স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানী বাহিনীর ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য অর্থ দেয়নি এবং (৪) প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশে আটকে পড়া বিহারী পাকিস্তানীদিগকে ফেরত নেয়নি। মুক্তিযুদ্ধকালীন সম্পদ ও অবকাঠামোর ধ্বংসের পরিমাণ ১৯৭৪ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক ১০০০ হতে ১৫০০ মিলিয়ন ডলার বা ১২৫০ মিলিয়ন ডলারে হিসাবকৃত হয়েছিল। বিশ্বব্যাঙ্ক একই সময়ে ২৫ মার্চ ১৯৭১-এ সমান ভাগের ভিত্তিতে বিভাজনীয় নিট সম্পদের হিসাবে পকিস্তানের কাছে ৪০০০ মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশের পাওনার পরিমাণ বলে হিসাব করেছে। এছাড়া সমতার হিসাবে একই তারিখে নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনশীল মূলধন সম্পদ হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানে অতিরিক্ত মাত্রায় সৃজিত অংশ থেকে বাংলাদেশ ৪১০০ মিলিয়ন ডলার ফেরত পাবে বলে হিসাবকৃত হয়েছে। আটকেপড়া পাকিস্তানীদের (৫ লাখ) খোরপোষ বাবদ বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের মুদ্রামানে মাথাপিছু বার্ষিক ৬০ ডলার হিসাবে ৩৩ বছরে (১৯৭১ থেকে ২০০৪) ন্যূনপক্ষে ৯৯০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে বলে ধরা যায়। এসকল খাত হিসাবে এনে ১৯৭১ সালের মুদ্রামানে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে ন্যূনপক্ষে মোট ১৮ হাজার ৮'শ ৮০ মিলিয়ন ডলার পাবে। ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ডলারের মূল্যমান কমেছে ১১.৭০ গুণ। এর অর্থ ২০০৪-এর ডলারের মূল্যে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে ১৯৭১ সালের অপরিশোধিত পাওনা হিসাবে পাবে ২'শ ২১ হাজার মিলিয়ন বা ২২১ বিলিয়ন ডলার। প্রতিবছর বার্ষিক ৫% সুদ অপরিশোধিত পাওনার উপর আরোপনীয় ধরে হিসাব করলে সমকালীন পর্যায়ে পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনা আরও বেশি হবে। দু'মাস আগে বাংলাদেশস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতির আওতায় বাংলাদেশে বিদ্যমান বিহারীদিগকে বাংলাদেশী বিহারী বলে আখ্যায়িত করে এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। ১৯৭১ সালের পর পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে রপ্তানীয় পণ্যদ্রব্যাদি আমদানী প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। পান-শুপারি তারা বাংলাদেশের বিকল্পে শ্রীলংকা থেকে এনেছে, চা' এনেছে আফ্রিকার কেনিয়া থেকে। এরপরও পাকিস্তান বাংলাদেশকে সবরকম সহযোগিতা ও সহায়তা দিবে-একথা বিশ্বাস করা আর

বেয়াকুবের দুহিতার শাহান-শাহকে মেহবুব বা সওহর রূপে খোয়াব দেখা এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা ও মনে রাখা প্রয়োজন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানী ইয়াহিয়া ও জানজুয়াদের আশ্রয়ে লালিত ও ফলত বিমোহিত মোহতারে'মা খালেদা জিয়া তার এইবার সার্কের চেয়ারম্যান হিসাবে পাকিস্তান সফরকালে পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী শওকাত আজিজ কিংবা প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশারফের সাথে পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশের প্রাপ্য মেটানো ও ক্ষতিপূরণ প্রদান কিংবা বিহারী পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে কোনো কথা বলার গোণজায়েশ পাননি। এসব বিষয়ে বাংলাদেশের ন্যায্য দাবী তাদের কাছে উত্থাপন না করে মোহতারে'মা খালেদা বাংলাদেশের প্রতি নিঃসন্দেহে অবিচার করেছেন, বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার পাকিস্তান সফর-সাথীদের একজন কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী পাকিস্তানী প্রভূদের পিনা-খানা-পরনা ও মিলনার আতিশয্যে তিনি তার এককালীন শশুরাল করাচীতে শাসুর মনসুর মিয়া ও শাঁচ রাণী বেগমের হাভেলী বা তার দেহলী দেখার বা খোঁজ করার ফুরসত পাননি। তার সফর-সাথীদের মধ্যে কেউ তাকে হয়ত মনে করিয়ে দেননি যে তার দর্শনের দুনিয়ার আলালম্বরদার পারভেজ মুশারফও বছর কয়েক আগে, বাজপেয়ী আমলে ভারতের দিল্লী সফরের সময় তার বাপ-দাদার এককালীন হাভেলী দেখতে ভুলেননি।

মুক্তিযুদ্ধ কালীন ঢাকায় পাকিস্তানী মেহমানদারী ও জেনারেল জানজুয়ার সুবা-শাম খবরদারীতে বিমোহিত খালেদা ও তার সহযোগীরা কি এখন আয়ুব-ইয়াহিয়ার গত শতাব্দীর '৬০ ও '৭০ দশকের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত এবং অসফল দর্শন সফল করার এরাদা নিয়ে সম্প্রতি পাকিস্তান সফর করে বাংলাদেশে এসেছেন? খালেদা-নিজামীর এই ৫ বছরের শাসনের প্রকৃতি, দিক ও বৈশিষ্ট নিয়ে সেদিন আলাপ করছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় সতীর্থের সাথে। অনেক আগে লস এনজেলেসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়েছিলাম আমি। জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান সংহতি স্থাপক মার্কিনী (কালা আদমী) রালফ বুশের স্মৃতিতে সমুজ্জল ইমারতের চত্বরে নরম ঘাসের উপর ক্লান্ত শরীর ছেড়ে দিয়ে প্রায়ই ভাবতাম গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, চৌর্যতন্ত্রের অভ্যুদয় ও প্রতিফলের কথা। সম্প্রতি সেই বিশ্ববাবিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য অধ্যাপক জারেদ ডায়মন্ড ১৩০০০ বছরের মানব ইতিহাসের নির্যাস এঁকেছেন নিপুণ হাতে। লিখেছেন, এই নির্যাসে সবার জন্য মনে রাখার মতো ছোট ইতিহাস। তার অলোকেই সতীর্থদের সাথে এই আলোচনা। খালেদা জিয়ার

দুঃশাসনের প্রতিফলক গুলো একে একে উপাত্ত আর চিত্র সহ তুলে ধরার পর সকল সতীর্থ একমত হলেন---সমকালীন বাংলাদেশ জোট সরকারের কল্যাণে গণতন্ত্রের মোড়কে কেবল স্বৈরতন্ত্র নয়, চৌর্যতন্ত্রে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। আসলে বাংলাদেশে ২০০১ সালের পর থেকে খালেদা-নিজামী গং গণতন্ত্রের লেবাসে ক্লেপট্রোক্রাসি বা চৌর্যতন্ত্র চালু করেছে। গত ১৩ হাজার বছরের বিশ্ব ইতিহাসের নির্যাস উপস্থাপক জারেদ ডায়মন্ডের ভাষ্য অনুযায়ী চৌর্যতন্ত্র তার নিকৃষ্টতম অবয়বে সমাজের নিট সম্পদ সাধারণ মানুষের কাছে থেকে চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে উপরের স্তরের মুষ্টিমেয় লুটেরা ধনীর অনুকূলে হস্তান্তর করে। আর উৎকৃষ্টতম অবয়বে ক্লেপটোক্রেসি ব্যক্তিগত ভাবে অনাহরণিয় ব্যয়বহুল সেবা পাওয়ার বা দেয়ার বড় বড় ঠিকা জনগণের স্বার্থের মোড়কে গোষ্ঠী স্বার্থ চরিতার্থে নিতে ও দিতে সমর্থ হয় (দ্রষ্টব্য, Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, Vintage, 2005, পরিচ্ছেদ-১৪)। খালেদা জিয়া ও তার সহযোগীরা ক্লেপটোম্যানিয়াকের মত এই ৫ বছরের কর্ম তৎপরতার মাধ্যমে এদেশে কমসেকম ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ জনগণের সম্পদ লুট করে এবং জনগণের জন্য সকল সেবা মূলক কাজে ব্যয়-বাহুল্যতার দখলী প্রবেশ ঘটিয়ে যুক্তিসংগত সন্দেহের উর্ধে প্রমাণ করেছে যে তাদের শাসন ক্লেপটোক্রেসির নিকৃষ্টতম অবয়ব। কেননা এই ক্লেপটোক্রেসী বা চৌর্যতন্ত্র খালেদা ও তার সহযোগীরা সীমান্তের ও স্বাধীনতার ওপারের সামন্ত প্রভুদের ইঙ্গিতে তাদের দর্শন অনুগামী পরিচালনা করে আসছেন। পাকিস্তান থেকে নির্দেশিত হয়েই কি তিনি পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের মুক্তবাণিজ্যিক চৌর্যতান্ত্রিক চুক্তি সাধনের কথা বলেছেন? মনে হচ্ছে, চৌর্যতন্ত্রের অনুসরণে খালেদা জিয়া আফ্রিকার জায়েরের এককালীন গণতন্ত্রের লেবাসে মুর্তিমান স্বৈর শাসক মবুতুকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, মার্চ ২, ২০০৬

সার সঙ্কটের কথা ঃ চালের কেজি ত্রিশ টাকা?

দেশে সারের সঙ্কট চলছে। সারের অভাবে এই বছরের বোরো ধানের উৎপাদন মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সারের দাবীতে চাষিরা বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভে ফেটে উঠেছেন, সড়ক ও সরকারি অফিস অবরোধ করছেন, পুলিশী নির্যাতন ও ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা প্রয়োগ তাদের অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ থামিয়ে দিতে পারছে না। সারের দাবীতে সাতক্ষীরায় সড়ক অবরোধ করেছে চাষিরা, ঘেরাও করেছে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস। ঠাকুরগাঁয়ে বিক্ষোভকারী চাষিদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। সারা উত্তরবঙ্গ ঘিরে সারের জন্য হাহাকার (দ্রষ্টব্য, সমকাল, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০০৬, ভোরের কাগজ ও সংবাদ, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০০৬, যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ২২, ২০০৬ ও দৈনিক জনকণ্ঠ, ফেব্রুয়ারি ২৩ ও মার্চ ৬, ২০০৬, প্রথম আলো, মার্চ ৯, ২০০৬)। কক্সবাজার ও সাতক্ষীরায় চাষিরা ডিলারদের দোকানে হামলা করেছে, অনেক জায়গায় ডিলাররা পালিয়ে বেড়াচ্ছে (দ্রষ্টব্য, প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০০৬)। কতিপয় এলাকায় সারের দাবীতে চাষিরা অনশনও শুরু করেছে (দ্রষ্টব্য, ভোরের কাগজ, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০০৬)। চাষিরা শ্লোগান তুলেছে, হয় সার দাও, না হয় বিষ দাও। এগার জেলায় সার বিতরন তত্ত্বাবধানে ১১ যুগ্মসচিবকে দায়িত্ব দেয়ার পরও সঙ্কটের মোচন ঘটছে না। বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ দমনে নিযুক্ত পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেসিকে চাষিরা বলছে, মারতে এসেছ মার, কিন্তু সার দিয়ে যাও। সার পাচারের অভিযোগে কয়েক স্থানে ডিলারশিপ বাতিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সমকালে বার্ষিক চালের মোট উৎপাদনের সবচেয়ে বেশি অংশ আসে উফশী (উচ্চ ফলনশীল) বোরো চাল থেকে। বোরো রোয়া হয় ডিসেম্বর থেকে মাঝ-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ফসল উঠে এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত।

সমকালে প্রায় ৯০ লাখ একর জমিতে বোরো উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে সেচকৃত জমির পরিমাণ ৮৪ লক্ষ একর। সেচকৃত জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে উফশী বোরোর উৎপাদন করা হয়। চাল অবয়বে বোরোর বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১১০ লক্ষ টন। বোরো চালের বার্ষিক উৎপাদন বাৎসরিক সকল চাল উৎপাদনের প্রায় ৪৭% ভাগেরও বেশি। উফশী বোরো উৎপাদনে ভালো বীজ ও সেচের সাথে প্রয়োজন হয় রাসায়নিক সারের। সমকালে দেশে সার ব্যবহারের বার্ষিক পরিমাণ প্রায় ৩৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টন। এর মধ্যে ইউরিয়ার অংশ ৬৯%, টিএসপি'র অংশ ১১% এবং এমপি'র অংশ ৭%। বোরো উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ইউরিয়া। এই সময়ের উফশী বোরোর জন্য সুষম প্রয়োগ-প্রয়োজনের নিরীখে একর প্রতি ইউরিয়ার প্রয়োজন ২ মন ২৫ সের, টিএসপি ২ মন এবং এমপি ১ মন ১০ সের (দ্রষ্টব্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০০০)। এই হিসাবে এই বোরো মৌসুমে ৮৪ লক্ষ একর জমিতে উফশী বোরো চাষের জন্য সারের চাহিদা ইউরিয়ার ক্ষেত্রে ৯.৫ লক্ষ টন, টিএসপি'র ক্ষেত্রে ৬ লক্ষ টন এবং এমপি এর ক্ষেত্রে প্রায় ৪ লক্ষ টন। একই সময়ে উফশী গম ও আলু চাষের জন্যও এসব সারের প্রয়োজন হয়। টিএসপি ও এমপি সময়মত না পাওয়া গেলে চাষিরা কিয়দংশে তাদের অভাব সুসম প্রয়োগের সূত্র না মেনে অধিকতর ইউরিয়া ব্যবহার করে পূরণ করে থাকে। সেই হিসাবে এই বছর বোরো মৌসুমে ইউরিয়ার চাহিদা (আলু ও গম চাষের প্রয়োজন মাত্রা হিসাবে নিয়ে) ১১ লক্ষ টনে প্রাক্কলিত হয়েছে। দেশে এখন ৬টি ২০ থেকে ৪০ বছরের পুরানো ইউরিয়া সার উৎপাদনের কারখানা আছে। এ ৬টির সারা বছরের উৎপাদন ক্ষমতা ১৯ লক্ষ টন। ইউরিয়ার সমকালীন বাৎসরিক চাহিদা ২৮ লক্ষ টন। নয় লক্ষ টন তাই ফি বছর আমদানী করা প্রয়োজন। দেশে টিএসপি'র বাৎসরিক উৎপাদন (এসএসপি সহ) প্রায় ২ লক্ষ টন এবং আমদানীর পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ টন। পূর্ণ ক্ষমতায় উৎপাদন, আমদানী ও সুবিনস্ত সরবরাহ এবং বিতরণের মাধ্যমে দেশব্যাপি কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সারের চাহিদা মিটানো যায়। যেমনি মেটানো হয়েছিল শেখ হাসিনার শাসনামলে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত।

এই বছরের সার সঙ্কটের কারণ গুলো এই প্রেক্ষিতে সনাক্ত করা কঠিন নয়। এক, জোট সরকারের আমলে বিশেষত এই বছরে, দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সারের উৎপাদন, আমদানী ও বিতরণ সরকার কর্তৃক প্রক্ষেপিত ও পরিকল্পিত হয়নি। গত বছর ১ জানুয়ারি দেশে সারের মজুদ ছিল ৫ লক্ষ ১১

হাজার টন। এই পরিমাণ মজুদ নিয়ে গত বছরের বোরো মৌসুম শুরু হলেও পরে সারের অভাব দৃষ্ট হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এই বছর ১ জানুয়ারিতে সারের মজুদ কমে দাঁড়িয়েছিল ৪ লক্ষ ২৩ হাজার টন। এতে সরকারের টনক নড়েনি। লক্ষণীয়, যথা প্রয়োজন পরিকল্পনা না করে দেশব্যাপি সার সঙ্কট এবং এই হেতু চাষিদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের মুখে এই সরকারের শিল্পমন্ত্রী সংসদে বলেছেন, সারের অভাব নেই, সার নিয়ে মিডিয়া বিভ্রান্তিকর খবর দিচ্ছে (দ্রষ্টব্য, দৈনিক জনকণ্ঠ, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০০৬)। এই ধরণের উক্তি নির্বোধের নয়, উদেশ্যমূলক ও দায়িত্বহীন। কৃষিমন্ত্রী সার উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে তার চেয়ে শক্তিধর আর এক মন্ত্রীর বিদ্যমানতা উল্লেখ করে প্রকারান্তরে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর এক্ষেত্রে অসহযোগ ও অপরিকল্পিত কার্যক্রমের প্রতি দোষ আরোপণ করেছেন (দ্রষ্টব্য, দৈনিক জনকণ্ঠ, মার্চ ৬, ২০০৬)। শেখ হাসিনার শাসনামলের সূত্র অনুসরণ করে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আওতায় কৃষি, শিল্প ও অর্থমন্ত্রণালয় সার উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করলে এই বছরের সঙ্কট সৃষ্টি হতো না।

দুই, দেশের অভ্যন্তরে ইউরিয়া ও টিএসপি'র উৎপাদন এই বছর বার বার ব্যাহত হয়েছে। ইউরিয়ার মূল উপাদান প্রাকৃতিক গ্যাস। গ্যাসের সরবরাহের অপ্রতুলতা এবং ফলত রেশনিং, সরকারি মালিকানায় পুরানো ইউরিয়া কারখানার যন্ত্রপাতি মেরামতে বিলম্ব ও ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক শক্তিধরদের গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রাধান্য এবং কার্যকরী মূলধন প্রাপ্তিতে সময়ান্তরিক অপ্রতুলতা ইউরিয়ার ক্ষেত্রে উৎপাদনকে অনুকূলতম শীর্ষে নিয়ে যায়নি। দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন ইউরিয়া কারখানা নির্মাণে জোট সরকার নিন্দনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে গত ৩ বছরে ইউরিয়া আমদানীতে যে ব্যয় হয়েছে তা দিয়ে দেশে ২টি সার কারখানা স্থাপন করা যেত (দ্রষ্টব্য, ডেইলি স্টার, মার্চ ৪, ২০০৬)। শেখ হাসিনার শাসনামলে অনুমোদিত শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ, ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট প্রকল্প, ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফেক্টরি লিঃ এর পুনর্বাসন ও ঘোড়াশাল সার কারখানা পুনর্বাসন প্রকল্প জোট সরকার যথা প্রয়োজন দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করেনি। তদুপরি ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (১ ও ২) প্রকল্প যা শেখ হাসিনার সরকার সার সঙ্কট মোকাবিলায় দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য ২০০০-এ অনুমোদন করেছিল তা জোট সরকার প্রথমে স্থগিত করে, উদ্যোক্তাদের (তৎকালীন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত আমি ও শিল্প

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত তোফায়েল আহমেদ) বিরুদ্ধে দুর্নীতির মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং পরে সেসব বিলম্বে অধিকতর ব্যয়ে (অতিরিক্ত ব্যয় ৭৭০ কোটি টাকা) বাস্তবায়নের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে। এ দু'টি কারখানা উৎপাদনে যেতে এখন থেকে আরও ২ বছর সময় লাগবে বলে ওয়াকেবহাল মহলের ধারণা। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে জোট সরকার অবহেলা দেখিয়েছে, দুর্নীতির আওতায় প্রথম পর্যায়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পরবর্তী পর্যায়ে প্রকল্পে মূল্যবৃদ্ধি ও বিলম্ব দুইই ঘটিয়েছে। এটি শেখ হাসিনার সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী সময়মতো বাস্তবায়িত করলে ৭৭০ কোটি টাকা কম ব্যয় হতো, এই ৩ বছরে এদের অতিরিক্ত উৎপাদন রপ্তানী করে ৩০ কোটি ডলার বা ২১০০ কোটি টাকা আয় করা সম্ভব হতো। টিএসপি'র ক্ষেত্রে মূল কাঁচামাল ফসফেট আমদানী প্রক্রিয়ায় অব্যবস্থাপনা এবং লোভ ও লালসার তেলেসমাতি উৎপাদন বন্ধ রেখেছে বার বার। জর্ডান না চীন, না মরক্কো থেকে কার মাধ্যমে কত ফসফেট কি করে কত কমিশনে কোনো সময়ে আমদানী হবে তা স্থির করতে কর্তৃপক্ষ বার বার অযোগ্যতা দেখিয়েছে, দুর্নীতির পথ ধরেছে।

তিন, ঘাটতি উৎপাদন আমদানী দিয়ে পূরণ করার প্রক্রিয়ায় সরকার সময়মতো সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি। এই সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প ও অর্থমন্ত্রণালয়ের সাথে এই লক্ষ্যে সমন্বিত ভাবে পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়নি। অযোগ্যতার সাথে যুক্ত হয়েছে দুর্নীতি। এই প্রেক্ষিতে সারের আমদানী বাজার এক সাংসদ ও এক মন্ত্রী পুত্রের নিয়ন্ত্রণে বলে বিস্তারিত প্রতিবেদন (দ্রষ্টব্য, সমকাল, ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০০৬) প্রকাশিত হওয়ার পরও সরকার নিশ্চুপ থেকে প্রকারান্তরে অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। এই বছর বর্ধিত চাহিদার (২৮ লক্ষ টন) বিপরীতে ৯ লক্ষ টন ইউরিয়া আমদানী করা হবে বলে কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয় যৌথ ভাবে অতিবিলম্বে স্থির করেছিল বলে জানা গেছে। এই প্রেক্ষিতে সরকারি দলভুক্ত কতিপয় নব্য আমদানীকারক রাসায়নিক শিল্প করপোরেশনকে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে ও কম-জানা-শোনা উৎস, এমনকি ইউক্রেন থেকে ইউরিয়া আমদানীর সরবরাহ নির্দেশ আদায় করে। এই সব সরবরাহ যথা সময়ে এবং প্রত্যাশিত দামে দেশে পৌছায়নি বলে জানা গেছে। এই এমনিতর উৎস থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে ইউরিয়া আমদানী সরকারের ক্রয় কমিটি মাত্র ক'দিন আগে অনুমোদন করেছে বলে জানা গেছে। ইউরিয়ার এই চালান আগামী এপ্রিল, অর্থাৎ বোরো মৌসুম শেষ হলে দেশে পৌছবে বলে জানা গেছে।

চার, সার বিতরণ প্রক্রিয়ায় ভর্তুকীর বরাদ্দও অবমুক্ত করণে অহেতুক বিলম্ব সারের দাম বাড়িয়েছে। গত মৌসুমে সরবরাহকৃত ইউরিয়া ও টিএসপি সার বাবদ আমদানীকারকদের ভর্তুকী পেতে প্রায় ১ বছর দেরী হয়েছে। কৃষকদের সার ব্যবহারে ভর্তুকী দেয়ার আবরণে এই সরকার আমদানীকারকদের আমদানী মূল্যের ২৫% হারে যথার্থ তত্ত্বাবধানের বাইরে ভর্তুকী দেয়ার তোগলকী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভর্তুকীর বকেয়া অর্থ পাওয়ার জন্য আমদানীকারকগণ সারের সরবরাহ বিভিন্ন আমদানী ও গুদামজাতকরণের কেন্দ্রে বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। সরকার আমদানীকারকের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করে যথা প্রয়োজন নিরীখ না করে ভর্তুকী দিয়েছে কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে ডিলার পর্যায়ে সারের প্রকৃত বিক্রয় মূল্য সারের অপ্রতুলতার কারণে কমেনি, বরং গত বছরের তুলনায় এবং আনুপাতিকহারে বেশি বেড়েছে। আমদানীকারকদের অনুকূলে প্রদানীয় ভর্তুকীর প্রতিশ্রুতি অন্য দিকে আমদানী মূল্যের উদ্দেশ্য মূলক বাড়তি ঘটিয়েছে। আমদানীকারকরা উচ্চতর আমদানী মূল্য দেখিয়ে ডিলার ও কৃষক পর্যায়ে নিম্নতর মূল্য সংরক্ষণ করার মোড়কে অধিকতর ভর্তুকী দাবী করেছে। তদুপরি অধিকতর মূল্যে আমদানী ও সরবরাহ কৃত সারের ডিলার পর্যায়ে অধিকতর মূল্য নিম্নতর মূল্যে আমদানীকৃত সারের প্রত্যাশিত নিম্নতর মূল্য চাষির পর্যায়ে রাখা যায়নি।

পাঁচ, সরকারি সার কারখানা গুলোকে ঘিরে সরকারি দলের পোষকতায় গড়ে উঠা মাস্তান ও চাঁদাবাজরা ডিলারদের কাছে সরবরাহ করণীয় সারের প্রকৃত মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সরকারের আমলে মিল কর্তৃপক্ষকে সন্তোষের উপকরণ না দিয়ে এবং চাঁদাবাজদের 'তোলা' থেকে সরবরাহ না বাঁচিয়ে কোনো ডিলার কারখানা থেকে সার তুলতে পারেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। তারা বলেছে সরকারি কারখানা থেকে সার সরবরাহের সময় তাদেরকে ওজনে ৫% থেকে ১০% ভাগ কম এবং সময় সময় জমাট বাঁধা পুরানো স্টকের সার গছিয়ে দেয়া হয়। সার ডিলারদের সমিতি এই বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেছে বলে জানা গেছে। কৃষি বা শিল্প মন্ত্রণালয় এর প্রতিবাদ এখনও করেনি বা করতে পারেনি।

ছয়, মিল পর্যায়ে অব্যবস্থাপনা ও চাঁদাবাজি পরিবহন ক্ষেত্রে অরাজকতা এবং ফলত অধিকতর পরিবহন ব্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলীয় পৃষ্ঠপোষকতার মোড়কে মিল গেট কিংবা বন্দর থেকে ডিলারদের ভাড়া করণীয় ট্রাক কয়েকটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বাইরে থেকে নিতে দেয়া হয়নি। সার

ডিলারদের সমিতি সুস্পষ্ট ভাবে অভিযোগ করেছে যে চট্রগ্রাম থেকে রংপুর/দিনাজপুর পর্যন্ত সার পরিবহনীয় এক ট্রাকের ভাড়া গত বছরের সর্বোচ্চ ৬ হাজার থেকে এ বছর ২০ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। তেমনি সরকারি পৃষ্টপোষকতায় কর্মরত শ্রমিক গোষ্ঠী ট্রাকে সার উঠানো ও ট্রাক থেকে সার নামানোর জন্য যুক্তির বাইরে পারিতোষিক দাবী করছে। তাদের কথা, উপরের কর্তারা, ট্রাক মালিকরা এই সুযোগে বেশি কামিয়ে নিচ্ছে, এই মাগ্গীর বাজারে আমরা আমাদের 'তোলা' নেবনা কেন?

সাত, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কর্মকর্তারা সারা দেশব্যাপি সার ডিলারদের কাছ থেকে 'তোলা' উঠিয়েছে। সারা দেশে প্রায় ৫০০০ সার ডিলার রয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এসব ডিলারদের ডিলারশিপ বাতিল করার ভয় দেখিয়ে কিংবা মিথ্যা কারচুপির মামলার পোড়া মরিচ সামনে ধরে মাসিক চাঁদা আদায়ে প্রবৃত্ত হয়েছে বেশ সংখ্যক কৃষি কর্মী ও অফিসারবৃন্দ। এরাও বলেছেন উচ্চ পর্যায়ে ঘুষ ও দুর্নীতির কারণে দ্রব্য মূল্যের লাগামহীন বেড়ে চলার সময়ে এদেরকে এদের 'তোলা' তুলেই বাঁচতে হবে।

আট, সার বিতরণের জন্য রাসায়নিক শিল্প করপোরেশন সারা দেশকে ৬টি কারখানা জোন এবং ২১টি বাফার জোনে বিভক্ত করে এসবের এক জোন থেকে অন্য জোনে সার সরবরাহ বন্ধ রেখেছে। গত ৬ মাসে দেশের বৃহত্তম সার কারখানা যমুনায় ৩ বার উৎপাদনে ব্যত্যয় সৃষ্টি হয়েছে। সারের দাবীতে চাষিরা নিরুপায় হয়ে যমুনা সার কারখানা ঘেরাও করেছে (দ্রষ্টব্য, সংবাদ, মার্চ ২, ২০০৬)। ফলত যমুনা সার কারখানা কেন্দ্রীক জোন গুলোতে সারের অপ্রতুলতা দেখা দেয় যা চট্রগ্রাম কেন্দ্রীক জোন থেকে সার এনে দূর করা সম্ভব ছিল। বলা প্রয়োজন স্বৈরশাসক এরশাদ আমলের চুক্তি অনুযায়ী স্থাপিত কর্ণফুলী সার কারখানা থেকে দেশী গ্যাসে উৎপাদিত সার এদেশে সরবরাহ ও ব্যবহারের জন্য তার মূল্য আমাদেরকে আমদানীয় সারের মূল্য মাত্রায় পরিশোধ করতে হয়। এই উৎস থেকে প্রাপ্ত সারও বিভিন্ন বাফার জনে সরবরাহ ও মজুদ করণের প্রক্রিয়ায় এই সরকার বাস্তব সম্মত কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। মার্চের ৫ তারিখ পর্যন্ত আমলাতান্ত্রিক অবহেলা ও অপরিকল্পনার ফলে এক জোন থেকে অন্য জোনে সার সরবরাহ ও গুদামজাত করা বন্ধ ছিল। ফলত স্থান বিশেষের ঘাটতি অন্য স্থান থেকে সার এনে পূরণ করা কিংবা সাময়িক ভাবে স্থানীয় ঘাটতি সামাল দেয়া সম্ভব হয়নি। সারের সার্বিক অপ্রতুলতার কারণে যতটা সঙ্কট হতো, অপরিকল্পিত ও অপরিচ্ছন্ন মজুদ করণ ও দুর্নীতিমুক্ত সরবরাহ

করণের জন্য তার চেয়ে বেশি সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে।

এই ৮টি কারণে এই বোরো মৌসুমে দেশের সর্বত্র, বিশেষত উত্তরাঞ্চলে সারের তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সারের দাম কৃষক পর্যায়ে গত বছরের তুলনায় স্থান বিশেষে ইউরিয়ার ক্ষেত্রে ৩০% এবং টিএসপি'র ক্ষেত্রে ২০% বেড়েছে। এই সরকারের তরফ হতে ক্ষুদ্র কৃষককে দেয়া আর্থিক সহায়কী এবং দু'টি কৃষি ব্যাঙ্ক ও চার'টি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে প্রদত্ত কৃষি ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়ায় সন্ত্রাস, দলবাজি ও চাঁদাবাজি গড় কৃষকের হাতে যথার্থ মূল্যে সার কেনার কাবেলিয়াত দেয়নি। এর সাথে যোগ হয়েছে বিদ্যুৎ ও ডিজেলের অপ্রতুলতা প্রসূত সেচ সঙ্কট এবং গত ৫ মাস ধরে খরার তাণ্ডব। ফলত মাঠের ধান হলুদ বিবর্ণ হয়ে গেছে। কাক ডাকা ভোরে গ্রাম থেকে শহরে এসে দিনভর অপেক্ষা করেও চাষির চাষবাসে অপরিহার্য সার ডিজেল মিলছে না (দ্রষ্টব্য, দৈনিক জনকণ্ঠ, ফেব্রুয়ারি ২, ২০০৬)। ফলত এই বছর বোরো ফসলে উৎপাদন ২০% কম হবে বলে মনে হচ্ছে। ২০০৩ সালের চূড়ান্ত হিসাবে দেশে বোরো চালের উৎপাদন হয়েছিল প্রায় ১ লক্ষ ২৩ হাজার টন। এই বছর ২০% কম হওয়ার অর্থ প্রায় ২৪ লক্ষ টন কম হওয়া। একই বছরে প্রায় ২৮ লক্ষ টন খাদ্য শস্য আমদানী হয়েছিল। এর অর্থ উৎপাদন ও আমদানীর এই অবস্থা পরিবর্তিত না হলে এই বছর কমসে কম বোরো চালের উৎপাদনে ঘাটতি মোকাবেলায় ৫২ লক্ষ (২৪ + ২৮) টন খাদ্য, চাল ও গম, আমদানী করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক কালের ডলারের মূল্য বৃদ্ধির ফলশ্রুতি হিসাবে চালের আমদানী মূল্য (দেশীয় টাকায়) বাড়ার সাথে আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অপ্রতুলতা যোগ হয়ে মোটা চালের মূল্য কেজি প্রতি ৩০ টাকায় উঠে যাওয়ার অশনি আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। চালের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে টাকার হিসাবে ডলারের দাম বাড়ার কারণে বাড়বে গম, ভোজ্য তেল ও ডালের দাম। তেমনি বিনিময়ের সূত্র অনুযায়ী বাড়বে অন্যান্য জিনিসপত্তরের দাম, মূল্যস্ফীতির পরিস্থিতি ভয়ানক সঙ্কটের আবর্তে নিয়ে যাবে সারা দেশকে। মোটা চালের কেজি ৩০ টাকায় উঠলে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর খানার তন্দুরস্তিতে নিশ্চয়ই ঘাটতি হবে না, কিন্তু আমজনতা ভুখা নাংগা থাকবে। প্রমাণিত হবে এ দেশে হালআমলে সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিত্তবানের স্বার্থান্বেষী চৌর্যতন্ত্রের উদ্ভাবক, নিয়ামক ও প্রসারক।

সার সংকটের উপরোক্ত কারণ গুলো অনুধাবন করলে একথা স্পষ্ট হবে যথা ইপ্সিত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খালেদা-নিজামী-সাইফুর-

আনোয়ার পরিচালিত এই সরকার সার সঙ্কট পরিহার করতে পারত। এই সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জোট সরকারের অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও অসংবেদনশীলতা এই মৌসুমে সারের সঙ্কট সৃষ্টি ও প্রকট করে দেশকে বিস্তৃত দুর্ভিক্ষ ও নিশ্চিত নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যে চাষি এখন সারের জন্য সড়ক অবরোধ করছে, সারের ট্রাক লুট করছে, মন্ত্রী, সাংসদ, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ঘেরাও করছে, কাল প্রতিরোধী ও প্রতিবাদী ভুখা মানুষের সাথে মিশে সোচ্চারিত অবয়বে সে গদীনশীন খালেদা-নিজামী-সাইফুর-আনোয়ারকে এই, স্বৈর ও চৌর্যতন্ত্র ভিত্তিক দুঃশাসনের হোতা হিসাবে নিশ্চয়ই সনাক্ত করবে। সমাজ ব্যবস্থা ও প্রশাসন বিপর্যস্ত হওয়ার এ অশনি সঙ্কেত সারের জন্য চারদিকের হাহাকারে এখনও কি এই তিন জন দেখতে অক্ষম? অনুধাবনের মরুতে উট পাখির অথর্বতা নিয়ে অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

দৈনিক জনকণ্ঠ, মার্চ ১৩, ২০০৬

হংকং-এ হোঁচট : বাণিজ্য প্রসারে বিভ্রান্তি

গত ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে হংকং-এ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ১৫০টি দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে গৃহীত ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের রপ্তানী প্রসারের পথে অপ্রত্যাশিত কোমর ভাঙ্গা হোঁচটের সৃষ্টি করেছে। এই হোঁচটের প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আমাদের স্পষ্টতর ধারণা থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গ্যাট (GATT) বা ট্যারিফ ও বাণিজ্যের সাধারণ চুক্তির আওতায়, অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রত সকল দেশের শুল্ক বিভিন্ন দফায় কমানো হয়। বিশ্ববাণিজ্য প্রসারে প্রযুক্ত উরুগেয় দফার আলোচনার শেষে ১৯৯৫-এর ১ জানুয়ারি গ্যাট অধিকতর সংহত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। গ্যাটের আওতায় বিভিন্ন দফায় বিশ্বব্যাপি শুল্ক কমানোর প্রক্রিয়ায় শিল্পোন্নত দেশ সমূহের পণ্যাদি স্বল্পোন্নত দেশে ক্রমান্বয়ে অবাধে আমদানী হওয়ার ফলে শেষোক্ত দেশ সমূহের সদ্য সৃষ্ট শিল্পজাত পণ্যাদি অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। একই সাথে শিল্পোন্নত দেশে তাদের কৃষি উৎপাদনকে সহায়কী ও ভর্তুকী দেয়ার নীতি এসব দেশে স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের প্রধান রপ্তানীয় দ্রব্য---কৃষিজাত পণ্যের---বাজার সীমিত রাখে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের তরফ থেকে মূলত উন্নত দেশ সমূহে (১) শুল্ক ও কোটামুক্ত রপ্তানী এবং (২) কৃষি পণ্যের উৎপাদনের উপর সহায়কী ও ভর্তুকী প্রত্যাহারের দাবী উঠানো হয়। একই সাথে ট্রিমস (Trade Related Aspects of Investment Measures বা বাণিজ্য সম্পর্কিত বিনিয়োগ প্রসার মূলক কার্যক্রম) ও ট্রিপস (Trade Related Aspects of Intellectual Properties বা বাণিজ্য সম্পর্কিত আঁতেল সম্পতি) বিষয়ে স্বল্পোন্নত দেশের

সরকারি সহায়তা ও প্রতিরক্ষণ যুক্তিসংগত মাত্রা ও ব্যাপ্তিতে রাখার অধিকার আদায়ের চেষ্টাও চলে। ট্রিপসের আওতায় আন্তর্জাতিক কপি ও পেটেন্ট রাইটস খাতে স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পোন্নত দেশের অনুকরণে উৎপাদন যাতে অন্তর্বর্তী কালীন সময়ে হতে পারে তার জন্য সম্মতি ও সমঝোতা আশা করা হয়। তেমনি ট্রিমসের আওতায় ক্রান্তি কালীন সময়ে স্বল্পোন্নত দেশের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারে সরকারি সহায়কী ও ভর্তুকী দেয়ার সুযোগ রাখার দাবী করা হয়।

শিল্পোন্নত দেশ সমূহের তরফ হতে সেসব দেশে কৃষিতে সহায়কী ও ভর্তুকী বজায় রেখে বিশ্বব্যাপি শুল্ক হ্রাস এবং স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের তরফ হতে শিল্পোন্নত দেশ সমূহে স্বল্পোন্নতদের উৎপাদিত রপ্তানী পণ্যের শুল্ক ও কোটা বিহীন প্রবেশাধিকার এবং ক্রান্তি কালে স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে ট্রিমস ও ট্রিপসের সহায়তা মূলক প্রয়োগের দাবীর নিস্পত্তি করণের লক্ষ্যে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আওতায় প্রথমে ১৯৯৯ যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎকালীন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। উন্নত ও অনুন্নত দেশ সমূহের মত পার্থক্যের কারণে অবাধ বিশ্ববাণিজ্য প্রসারে সদস্য দেশ সমূহের অভ্যন্তরে যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠা শিল্প ও কৃষির ক্ষতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণকারীগণের বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলন বাণিজ্য প্রসারে ঐকমত্যে পৌছতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের দাবী জোরে শোরে উত্থাপিত হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় হিসাবে উন্নত দেশ সমূহের স্বীকৃতি লাভ করে। পরে এসব অনিষ্পন্ন কাজ শেষ করার লক্ষ্যে ২০০১ এর নভেম্বরে কাতারের দোহায় মন্ত্রী পর্যায়ে আবার আলোচনা শুরু হয়। দোহা দফায় আগ থেকে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত উপরোক্ত বিষয়াবলীর সাথে সেবা ও কৃত্য খাতে বাণিজ্য অবাধ করণ স্থান পায়। পরে সিংগাপুরে আবারও মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনা ক্রমে প্রতিযোগিতা, বিনিয়োগ ও সরকারি সংগ্রহে স্বচ্ছতা এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে সহায়কী প্রদান প্রক্রিয়ায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সকল সদস্য দেশ কর্তৃক অনুসরণীয় বিশ্ববিধি প্রণয়ন স্থান পায়। এরপর ২০০৩ এ মেক্সিকোর কানকুনে মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনায় শিল্পোন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের স্বার্থের বৈপরীত্য আবারও এসব বিষয়ে উত্থাপিত সমস্যাদি নিরসনে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করণে ব্যর্থ হয় (দ্রষ্টব্য, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, নাকের বদলে নরুল ঃ কানকুন, বিলাসী গাড়ি ও দলিত অর্থনীতি, সময় প্রকাশন, ২০০৪)। জোট সরকারের তরফ থেকে এই সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন তখনকার বাণিজ্য

মন্ত্রী আমীর খসরু চৌধুরী। এই সম্মেলনে ভারত ও চীনের নেতৃত্বে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের ২১ দেশ-দলে আগের দশকের ৭৭ দেশ-দলের মুখপাত্র বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হতে ব্যর্থ হয়। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রাক্কলন অনুযায়ী ধনী ও দরিদ্র দেশ সমূহের মধ্যে আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে সকলের জন্য গ্রহণীয় সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিবছর বিশ্ববাণিজ্য ২৫০ বিলিয়ন ডলার পরিমাণ প্রসারিত হতো এবং এর ভিত্তিতে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ১৫০টি দেশ তাদের আয় ও কুশল বাড়াতে এবং অসহনীয় দারিদ্র বিমোচনে আরও অগ্রগামী হতে পারত (দ্রষ্টব্য, The Economist, Sept. 20-26, 2003)।

কানকুন সম্মেলনের পর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আওতায় জেনেভাতে দীর্ঘ আলোচনাক্রমে ২০০৪ এর ১ অগাষ্ট ধনী ও দরিদ্র দেশ সমূহের স্বার্থ সমন্বিত করে একটি কাঠামো চুক্তি (framework agreement) সম্পাদিত হয়। এর পরে ২০০৫ এর ২-৪ মার্চে কেনিয়ার মোম্বাসায় সদস্য দেশ সমূহের মন্ত্রীদের একটি মিনি সম্মেলন বা বৈঠকে এই কাঠামোচুক্তি পর্যালোচনা করে তা বাংলাদেশের সম্মতি সহ সমর্থন করা হয়। ২০০৫ এর ডিসেম্বরে হংকং এ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনার বিষয় ভিত্তি হিসাবে এই কাঠামোচুক্তিই প্রযুক্ত হয়। এই কাঠামোচুক্তিতে বিশ্বব্যাপি শুল্ক হ্রাস করণের প্রক্রিয়ায় স্বল্পোন্নত দেশ সমূহকে (১) কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের উপর শুল্ক হ্রাস করণ থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেয়া, (২) প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষির অনুকূলে আভ্যন্তরীন সরকারি সহায়কী অব্যাহত রাখা, (৩) শিল্পোন্নত দেশে অনুন্নত দেশ সমূহের রপ্তানী পণ্যের কোটা ও শুল্ক মুক্ত প্রবেশাধিকার স্বীকার করার অবকাশ দেয়া, (৪) স্বল্প-দক্ষ শ্রমিকদের আন্তঃদেশ গতায়তের পরিধি বাড়ানো বিবেচনায় আনা এবং (৫) স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের জন্য বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে উন্নত দেশ সমূহ হতে কারিগরী সহায়তা ও সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০০৫ এর ডিসেম্বরে হংকং এ অনুষ্ঠিত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে জেনেভায় প্রণীত ও মোম্বাসায় পরিমার্জিত কাঠামোচুক্তির বিধানাবলী ঘোষণা পত্রে পূর্ণাঙ্গ অবয়বে গ্রহণ করার কথা ছিল। এই প্রত্যাশার বিপরীতে মূলত যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ও জাপানের সমর্থনে হংকং ঘোষণা পত্রে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার স্বার্থের প্রতিকূলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকূল বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হংকং ঘোষণা পত্রের ৫৯ অনুচ্ছেদের মধ্যে ৪৭ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে ২০০৮ কিংবা এই ঘোষণা বাস্তবায়নের শুরু থেকে সকল উন্নত দেশ স্বল্পোন্নত সকল

দেশ থেকে উৎসারিত সকল পণ্য সামগ্রীকে উন্নত দেশ সমূহে স্থায়ী ভাবে কোটা ও শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকার প্রদান করবে। এইরূপ প্রবেশাধিকার, বাণিজ্য ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও প্রাকদর্শণের নিশ্চয়তা দেবে। যেসব উন্নয়নশীল দেশ এই ধরণের প্রবেশাধিকার স্বল্পোন্নত দেশ সমূহকে দেয়ার অবস্থানে আছে বলে ঘোষণা করবে তারাও এই ক্ষেত্রে উন্নত দেশ সমূহের অনুগামী হবে। ঘোষণা পত্রের ৪৭ অনুচ্ছেদের এই অঙ্গীকার কানকুন বা তার আগে সিয়াটলে ধনী ও দরিদ্র দেশ সমূহের পারস্পরিক বিপরীত অবস্থানের তুলনায় সার্বিক ভাবে উত্তম ও স্বাগতীয়। কিন্তু ঘোষণা পত্রের এই অঙ্গীকারকে একই পত্রের সংলাগ চ এর ৩৬এ(২) এ প্রদত্ত ব্যাতিক্রম অনেকাংশে অকার্যকর করে ফেলেছে। এই সংলাগে বলা হয়েছে যে স্ব স্ব অসুবিধার বিবেচনায় যে কোনো উন্নত দেশ স্বল্পোন্নত দেশের অনুকূলে প্রদানীয় শুল্ক ও কোটা বিহীন রপ্তানীর প্রবেশাধিকার থেকে অনুর্ধ ৩% ট্যারিফ লাইন বাদ দিতে পারবে।

শতকরা ৩ ভাগ ট্যারিফ লাইনে শুল্কের হারমোনাইজড কোডের ৮ ডিজিটের বিভাজন অনুযায়ী ৩০০ এর চেয়ে বেশি সুনির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শুল্ক ও কোটা বিহীন প্রবেশাধিকার থেকে এই ৩০০ এরও বেশি ব্যতিক্রমের পরিধিতে কোনো পণ্য সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্ধারণ করবে সংশ্লিষ্ট উন্নত দেশ। যেহেতু একটি গড় অনুন্নত দেশের উন্নত দেশে রপ্তানীয় পণ্য সামগ্রীর সংখ্যা সীমিত এবং এর মূল রপ্তানী সামগ্রী প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ৩০০ এর চেয়ে কম সেহেতু এই ব্যতিক্রমী বিধানের আওতায় যে কোনো উন্নত দেশ তার সাথে বাণিজ্যরত যে কোনো অনুন্নত দেশের সকল রপ্তানীয় পণ্য সামগ্রীর শুল্ক ও কোটা মুক্ত প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দিতে পারে। এই বিধানের আওতায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে সে দেশে রপ্তানীয় অধিকাংশ তৈরী পোষাকের আইটেম ও হিমায়িত চিংড়ি বা অন্যসব রপ্তানীয় পণ্যের উপরে কোটা ও শুল্ক আরোপ করতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া প্রায় সকল দেশে শুল্ক ও কোটামুক্ত মাত্রায় প্রায় সকল পণ্য রপ্তানী করতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশ সমূহ, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এসব দেশের অন্তর্ভুক্ত। এসব দেশ একপাক্ষিক ভাবে বাংলাদেশকে এই রপ্তানীর সুযোগ দিয়েছে। তথাপিও হংকং ঘোষণা অনুযায়ী এসব দেশ কর্তৃক প্রদত্ত বাণিজ্য সুবিধা তাদের স্ব স্ব বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যাহার করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক বিবেচনার বাইরে বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি, শিশু শ্রমের ব্যবহার, লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি

অজুহাতে হংকং ঘোষণা পত্র গ্রহণের পর এসব দেশ বাংলাদেশের রপ্তানীর উপর কোটা ও শুল্ক আরোপ করতে পারে। সমকালে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরী পোষাক ও চামড়াজাত পণ্য সামগ্রীর কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার আছে, শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার নাই। হংকং ঘোষণা পত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিকূলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিদ্যমান শুল্ক ব্যবস্থা বা নীতি অব্যাহত রাখতে পারে। সকল পোষাক পণ্যাদির বাইরে অন্যান্য পণ্য, উদাহরণত হিমায়িত চিংড়ির আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করতে পারে। তেমনি অন্যান্য উন্নত দেশ এখন থেকে ইচ্ছা করলে নির্বাচিত ভাবে বাংলাদেশের রপ্তানীর উপর কোটা ও শুল্ক আরোপ করতে পারে। সমকালে যুক্তরাষ্ট্রে একক দেশ হিসাবে আমাদের সবচেয়ে বেশি রপ্তানী হচ্ছে। ২০০৪-২০০৫ অর্থবৎসরে আমাদের মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার। এর প্রায় ২৮% যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানীকৃত প্রধান পণ্য হলো হিমায়িত চিংড়ি, হোম টেক্সটাইল, নিট ওয়ার ও ওভেন পোষাক। ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানীকৃত ওভেন পোষাকের ৪৪%, নিটওয়ারের ১৫% ও হিমায়িত চিংড়ির ৪৩% যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছে। সমকালীন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে তৈরী পোষাকের বৃহত্তম বাজার হিসাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রান্তিক মাত্রায় ছাড়িয়ে গেছে বটে, কিন্তু একক দেশ হিসাবে আমাদের তৈরী পোষাকের সবচেয়ে বিস্তৃত ও বড় বাজার হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র রয়ে গেছে। এবং হংকং ঘোষণা পত্র অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র এই সকল আইটেমের উপর কোটা ও শুল্ক আরোপন করতে বা ক্ষেত্র বিশেষে অব্যাহত রাখতে পারবে। হংকং-এ যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় প্রতিভাত হয়েছে যে এই দু'দেশ বাংলাদেশের সকল রপ্তানীর উপর শুল্ক এই পর্যায়ে প্রত্যাহার করতে রাজী কিংবা আগ্রহী নয়। জাপান ৫টি আমদানীয় পণ্যের উপর শুল্ক আরোপণ অব্যাহত রাখবে বলে ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে।

হংকং ঘোষণা পত্রে ৩% ট্যারিফ লাইনের কোটা ও শুল্ক আরোপণের অধিকার রক্ষাকরণের ফলে বাংলাদেশের তৈরী পোষাক আইটেমের রপ্তানী যুক্তরাষ্ট্রে তুলনা মূলক ভাবে সীমিত হবে। এই সীমাবদ্ধতা না থাকলে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী পোষাকের রপ্তানী অধিকতর প্রসারিত হতো, বস্ত্র ও বুনন এবং এদের পিছ-দুয়ারী খাতে বিনিয়োগ বাড়ত, এসব খাতে আরও বিদেশী বিনিয়োগ আসত। ফলত এক প্রাক্কলন অনুযায়ী দেশীয় উদ্যোক্তরা প্রতিবছর অতিরিক্ত ১০০ মিলিয়ন ডলার নিট লাভ করতে পারতেন, প্রায় ৭ লক্ষ লোকের বেকারত্ব

ঘুচত, দেশের প্রবৃদ্ধির হার আরও ১% বাড়ত এবং দারিদ্র বিমোচনের পথে দেশ লক্ষণীয় হারে অগ্রসর হতে পারত। লাভের ও সঞ্চয়ের সন্দিপনীয় শক্তি অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়িয়ে সার্বিক সমৃদ্ধি অর্জনের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করত।

বাংলাদেশ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার হংকং ঘোষণায় বিধানের সুক্ষ্ম হেরফেরে পরাজিত হয়েছে। ঘোষণা পত্রের সামনের ভাগে যা দেয়া হয়েছে, তা পেছনের সংলাগে কৌশল-বিন্যস্ত বিধানের আওতায় ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। গ্যাটের আওতায় উরুগেয় দফা ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আওতায় সিয়াটেলের আলোচনায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের স্বার্থ রক্ষাকরণে একই পর্যায়ের অন্যান্য দেশের সাথে সমন্বয় করে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত হয়েছিল। হংকং আলোচনায় বাংলাদেশ প্রস্তুতির অভাবে এই সম্মানজনক অবস্থান থেকে ছিটকে পড়ে গেছে। বাণিজ্য প্রসারের পথে মারাত্মক হোঁচট খেয়েছে। ২০০৩ এর কানকুন সম্মেলনে যথা প্রয়োজন প্রস্তুতির অনুপস্থিতিতে এবং সমন্বয় করার যোগ্যতার অভাবে বাংলাদেশ থেকে আফ্রিকার অনুন্নত দেশ সমূহও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেই বিবর্তন থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে হংকং এ বিষয় ভিত্তিক যোগ্যতা ও পূর্ব-প্রস্তুতির অনুপস্থিতি বাংলাদেশের ভূমিকায় মূর্ত হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রী হিসাবে হাওয়াই যোদ্ধার মতিছন্ন মত্ততায় হারিয়ে যাওয়া আলতাফ চৌধুরী ও তার সাগরেদরা হংকং এ পারিবারিক সওদাপাতি করণকে দেশের বাণিজ্য প্রসারের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন বলে শোনা গেছে। পরে দেশে ফিরে এসে প্রায় নির্বোধের মতো চৌধুরী পরাজিত পরিস্থিতিতে জয়ডংকা বাজানোর সকরুণ চেষ্টায় বলেছেন, তৈরী পোষাক শিল্প হোঁচট খেলে কি হবে, হংকং ঘোষণা অনুসরণ করে এই দেশ ব্যাঙের পা থেকে বিমান পর্যন্ত রপ্তানী করতে পারবে। আরও বলেছেন, রপ্তানী বাণিজ্য থেকে পাটের মতো তৈরী পোষাক হারিয়ে গেলে নতুনতর রপ্তানী পণ্য দেশ খুঁজে পেতে পারবে। এ বক্তব্য দেয়ার সময় তিনি অবহিত ছিলেন না যে পরিবেশিক কারণে বাংলাদেশ ব্যাঙ রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছে। আর বিমান উৎপাদন ও রপ্তানী করার প্রকৌশলীয় যোগ্যতা বাংলাদেশের থাকলে শুল্ক বা কোটা বিষয়ে রেয়াত বা সুযোগের কোনো কথা বাংলাদেশ থেকে উঠানোর প্রয়োজন হতো না। তার উপরের ও পাশের সহযোগীরা নিরেট নির্বোধের মতো তার বক্তব্য মেনে নিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এর বিপরীতে বলেছেন যে বিদ্যমান বাণিজ্য মন্ত্রী হংকং-এ বাংলাদেশের পোষাক

শিল্পের জানাযা পড়ে এসেছেন। আওয়ামী লীগের তরফ হতে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে হংকং সম্মেলনে বিদ্যমান বাণিজ্য মন্ত্রী জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এসেছেন (দ্রষ্টব্য, যুগান্তর, ডিসেম্বর ২১, ২০০৫)। গত ২২ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলি বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনার সাথে ঢাকায় দেখা করার সময় বলেছেন, হংকং ঘোষণার পর যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশকে তৈরী পোষাকের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়া কঠিন হবে। হংকং এ এই কোমর ভাঙ্গা হোঁচটের পর এদেশের পোষাক শিল্পকে বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে একমাত্র শেখ হাসিনাই সর্ব প্রথম এই ধরণের প্রবেশাধিকার দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেছেন।

নিঃসন্দেহে হংকং সম্মেলনে বাংলাদেশ পরাজিত ও একঘরে হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সিয়াটল সম্মেলনে তৎকালীন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের স্বার্থের ও অবস্থানের মুখপাত্র হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ফ্রান্সের কাছে গুরুত্ব পেয়েছিল, স্বল্পোন্নত পৃথিবীর অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থায় স্বার্থ সনাক্ত ও রক্ষা করণে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছেছিল। ফলপ্রসূ যোগাযোগের মাধ্যমে জোট সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান পরবর্তী বছর গুলোতে ধরে রাখতে পারেনি। ফলত এক কমবোডিয়া ছাড়া অন্যকোণ স্বল্পোন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশ হংকং এ বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ায়নি। ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও শ্রীলংকাও চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশের চকিত অবস্থানকে সমর্থন করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপ্রত্যাশিত ভাবে বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় বাংলাদেশে পোষাক শিল্পের প্রসার বেশ ঘটেছে এবং এই জন্য এই দেশকে অতিরিক্ত রেয়াত বা সুবিধা দেয়ার প্রয়োজন নেই। জানা গেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা বেষ্টনীতে তুলা চাষি ও বুনন শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষাকরণে যুক্তরাষ্ট্রকে এই অবস্থান নিতে হয়েছে। জাপান, প্রতিবেশী চীনও বাণিজ্যিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভারতের চেয়ে স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে অধিকতর সুবিধা দিতে চায়নি। স্পষ্টত বাংলাদেশ হংকং সম্মেলনের আগে যে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল তা করেনি। এক্ষেত্রে কোনো ফলপ্রসূ গবেষণা ও মৌল কৌশলীয় বিশ্লেষণের ভিত্তিতে চয়ন নির্ধারণ কিংবা অপশন সনাক্তকরণ বাংলাদেশের ভূমিকাকে সহায়তা দেয়নি কিংবা ফলপ্রসূ করেনি। সাম্প্রতিক কালে দেশের উদ্যমীদের কল্যাণে রপ্তানী ক্ষেত্রে যে তাৎপর্যপূর্ণ প্রসারের ধারা লক্ষ্য করা গেছে হংকং এর পরাজয় তাতে এক বিরাট হোঁচট দিয়েছে। মাল্টিফাইবার চুক্তির

অবসায়নের পরে ২০০৫ এর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ইউনিট প্রতি গড় মূল্য কমে যাওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে চীনের তৈরী পোষাকের রপ্তানী বেড়েছে ৭২%, ভারতের ৩৩% আর বাংলাদেশের বাড়তি হয়েছে ১৯%। হংকং এর এই কোমর ভাঙ্গা পরাজয়ের হোঁচট অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের তৈরী পোষাক রপ্তানির বাড়তির হার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ম্লানতর করবে বলেই আশঙ্কা হচ্ছে।

হংকং সম্মেলনে খাওয়া এই কোমর ভাঙ্গা হোঁচটের আলোকে বাংলাদেশের তরফ হতে রপ্তানী প্রসারে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ এখন থেকেই জরুরি। এক, হংকং সম্মেলনের পরবর্তী অনুগমনীয় পর্যায়ে, জেনেভায় ঘোষণাটি চূড়ান্ত ও পরবর্তীকালে বাস্তবায়ন করার সময়ে যথা প্রয়োজন সংযোজন ও সংশোধন করার লক্ষ্যে বিশ্লেষণ ভিত্তিক পদক্ষেপ সনাক্ত করতে ও নিতে হবে। একই সাথে যুক্তরাষ্ট্রে ও জাপানের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে ৩% ট্যারিফ লাইনের মধ্যে যাতে গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক তৈরী পোষাকের আইটেম অন্তর্ভুক্ত না হয় তার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতে হবে। বাণিজ্য বিষয়ে কর্মকর্তাদের গবেষণা ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বাণিজ্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে লাগসই লোকবল সংস্থাপনীয় নীতি গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবেশী ভারতে এই ধরণের নীতির আওতায় পিসি আলেকজান্ডার, আবিদ হাসান, আনোয়ার হোদা ও রমা মজুমদার প্রমুখ আইএএস অফিসারদের বাণিজ্য বিষয়ে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে পদায়িত রেখে কি ভাবে বিশেষজ্ঞ হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল তা অনুধাবন ও অনুসরণ করতে হবে। এই লক্ষ্যে ট্যারিফ কমিশনকে সুসংহত করণ এবং ব্যক্তি উদ্যোগ ও একাডেমিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি বৈদেশিক বাণিজ্য ইনষ্টিটিউট গড়ে তোলা হাতে নিতে হবে। সকল সম্মেলনে কিংবা আলোচনায় যাওয়ার আগে ক্রম বিবর্তনশীল বাণিজ্যিক জ্ঞান আহরণের বাড়ির কাজটি সুসম্পন্ন করতে হবে। বিদেশে সম্মেলনে যাওয়া দেশের জনগণের স্বার্থ বাদ দিয়ে যে পারিবারিক প্রয়োজনে শপিং-এ ডুবে যাওয়ার মিশন নয় তা বুঝতে হবে। বাণিজ্য আলোচনায় সমন্বিত প্রচেষ্টার শক্তি যে একক প্রচেষ্টার বিফলতা প্রায় সকল ক্ষেত্রে কাটিয়ে উঠতে পারে তা অনুধাবন করতে হবে। দুই, স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের সাথে অব্যাহত আলোচনার আলোকে স্বল্পোন্নত দেশের সমস্যা সমাধানে একক ও সুসংহত অবস্থানে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা প্রযোজিত

করতে হবে। কালক্রমে সকল উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ ৩% ট্যারিফ লাইন শুল্কায়নের জন্য সংরক্ষণ করবে না করবে তা নির্ভর করবে শুল্কমুক্ত রপ্তানীর অনুকূলে স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের ঐকমত্য ও সুসংহত অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করণের উপর। তিন, অদূর ভবিষ্যতে হংকং ঘোষণার বস্তুগত পরিবর্তন তেমন হবে না ধরে নিয়ে দেশের রপ্তানীর ভিত্তি প্রসারিত করার কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। অপ্রচলিত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানী বাড়ানোর নীতি ও কৌশল উদ্ভাবন এবং গ্রহণ করতে হবে। চার, রপ্তানী প্রসারের লক্ষ্যে অবকাঠামো, বিশেষত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, যোগাযোগ ও বন্দর ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে মনোযোগ দিতে হবে। দুর্নীতিকে পরিহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং কেন্দ্রীয় বন্ডেড ওয়ার হাউস প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দিকে অগ্রসর হতে হবে, নিজস্ব ফ্যাসন উদ্ভাবন ক্ষমতা বাড়াতে হবে, বিদেশী ফ্যাসন প্রতিষ্ঠান ও বাজারের সাথে ফলপ্রসূ যোগাযোগ স্থাপন করতে ও ক্রমান্বয়ে বাড়াতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, সকল রপ্তানীর ক্ষেত্রে গুণগত উৎকর্ষের সাথে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি একথাগুলো চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পোষাক শিল্প মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে বলেছিলাম। একই অনুষ্ঠানে হংকং এ হোঁচট খাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিষয়ে বলেছেন বিজিএমই'র সাবেক সভাপতি আনিসুল হক ও সমকালীন সভাপতি টিপু মুন্সি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমএ তসলিম। বলেছেন, সুস্পষ্ট ভাষায় সহরাজনীতিবিদ সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। সমর্থন জানিয়েছিলেন স্থানীয় পোষাক শিল্পের অন্যান্য দিকপাল বৃন্দ। এসব কথা এই সমাপনী অনুষ্ঠান ও এর আগে অনুষ্ঠিত অন্যান্য সভা সেমিনারেও প্রকারান্তরে বলা হয়েছে। হংকং এ পরাজয়ের গ্লানি বহন করে ব্যাঙের 'পা থেকে বিমান পর্যন্ত রপ্তানীর খোয়াবে মশগুল হাওয়াই যোদ্ধার অভিজ্ঞান সংবলিত বাণিজ্য মন্ত্রী আলতাফ চৌধুরী গং এই বিষয়ে ওয়াকেবহাল আছেন কিনা তা ১ মাসের পরও জানা যায়নি। হংকং এর কোমর ভাঙ্গা হোঁচট সামলানোর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠিত ৩টি তথাকথিত বিশেষজ্ঞ কমিটি এখন পর্যন্ত কোনো নিরাময়ী পথ সনাক্ত করতে পারেনি। হংকং এর হোঁচট সামলানোর পথে কার্যক্ষম ভাবে এখনও এগিয়ে না এসে এসব বিষয়-নির্বোধ অথচ স্বস্বার্থ-সজাগ কলন্দর মজনুরা এখন কিসের মাস্ত-এ মজবুর তার হিসাব উন্নয়নকামী জনগণ নিশ্চয়ই একদিন দাবী করবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, মার্চ ২২, ২০০৬

বিদ্যুৎ সঙ্কট : জোট সরকারের অযোগ্যতার কথা

সারাদেশে বিদ্যুৎ সঙ্কট চলছে। বছরের শুরুতে ৩ ও ২৩ জানুয়ারি চাঁপাই নবাবগঞ্জের কানসাটে বিদ্যুতের দাবীতে ১০ নাগরিক পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন। ভোরের কাগজ গত ২০ ফেব্রুয়ারি বিদিত করেছেঃ বিদ্যুৎ সঙ্কটে দুঃসহ পরিস্থিতিঃ রাজধানী সহ সারাদেশে জনজীবনে দুর্ভোগ। দৈনিক জনকণ্ঠে গত ২২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত প্রতিবেদনঃ বিদ্যুৎ সঙ্কটে মানুষের নাভিশ্বাসঃ ঘাটতি ১৭'শ মেগাওয়াট। যুগান্তর গত ২১ ফেব্রুয়ারি জানিয়েছেঃ খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির ১১ উপজেলায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। ফেব্রুয়ারি ১৪ তে ডেইলি স্টারে প্রকাশিত সংবাদঃ বিদ্যুৎ খাত বিপর্যস্ত হচ্ছে অথচ সরকার প্রকল্প ধরে বসে আছে। ৫ মার্চ দৈনিক জনকণ্ঠ বিদিত করেছেঃ খুলনা ও বাঘাবাড়ীর কয়েকটি ইউনিট বন্ধঃ ৩৫ জেলায় মারাত্মক লোডশেডিং।

১৯৯৪-'৯৫ সালে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২১৩৩ মেগাওয়াট। গ্যাসের চাপে তারতম্য এবং সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনের ব্যত্যয় এই মাত্রার উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুতের প্রকৃত সরবরাহ ২০০০ মেগা ওয়াটের বেশি হয়নি। এই পরিমাণ প্রকৃত সরবরাহের বিপরীতে ১৯৯৫ সালে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ২৪৮৫ মেগাওয়াট (দ্রষ্টব্য, পরিকল্পনা কমিশন, Fifth Five Year Plan, 1997-2002, পৃষ্ঠা-৩৩৬-৩৩৭)। দেশের সার্বিক বিদ্যুতায়ন, শিল্পায়ন ও সেচ সম্প্রসারণের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া তাই শেখ হাসিনার সরকারের (১৯৯৬-২০০১) জন্য প্রথম থেকেই চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়িয়েছিল।

সে চ্যালেঞ্জ শেখ হাসিনার সরকার প্রজ্ঞা, বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনা ও দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করেছিল। পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২০০১ সালে বিদ্যুতের চাহিদা ৩৭৩৬ মেগাওয়াট হবে এই ধরে শেখ হাসিনার সরকার

বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থায়ী ক্ষমতা ৪১৯৬ মেগা ওয়াটে উন্নীত করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। এই কার্যক্রমে চাহিদার অতিরিক্ত ৪৬০ মেগাওয়াট আপত কালীন জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য সংরক্ষিত বা অতিরিক্ত ক্ষমতা হিসাবে ধরা হয়েছিল। এই লক্ষ্যে গণ খাতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় (১) ২১০ মেগাওয়াট ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৬ষ্ঠ সম্প্রসারণ), (২) ২১০ মেগাওয়াট সিদ্দিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩) ১১০ মেগাওয়াট হরিপুর সংযুক্ত সাইকেল কেন্দ্র, (৪) ৬০ মেগাওয়াট শাহজি বাজার গ্যাস টারবাইন কেন্দ্র, (৫) ২১০ মেগাওয়াট চট্রগ্রাম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট), (৬) ৯০ মেগাওয়াট সিলেট সংযুক্ত সাইকেল কেন্দ্র (২য় ইউনিট), (৭) ৩০০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বড় পুকুরিয়া) এবং (৮) পূর্বাঞ্চলে আরও ২টি ১৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর বাইরে ব্যক্তি খাতে ও যৌথ উদ্যোগ হিসাবে (১) ৪টি (৪ x ১০০) বার্জের উপরে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, (২) ময়মনসিংহে ১৬০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন কেন্দ্র, (৩) বাঘাবাড়ীতে ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন কেন্দ্র, (৪) মেঘনা ঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট সংযুক্ত সাইকেল কেন্দ্র এবং (৫) খুলনায় ২১০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে অতিরিক্ত ৩৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয় (দ্রষ্টব্য, Fifth Five Year Plan, 1997-2002, পৃষ্ঠা-৩৪৯)। এর মধ্যে গণ খাতে বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারিত হয় ১৩৯০ মেগাওয়াট এবং ব্যক্তি খাতে ও যৌথ উদ্যোগে ১৯৩০ মেগাওয়াট । পরে মূল পরিকল্পনার বাইরে বেসরকারি খাতে ব্যক্তিগত বা নিজস্ব শিল্পোদ্যোগের ও পাশ্ববর্তী কারখানার জন্য ধৃত উৎপাদন (captive generation) এবং বিভিন্ন লাগসই স্থানে ১০ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করণের পরিধি বিস্তৃত করা হয়। উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য তেমনি ২০০১-২০০২ সালের মধ্যে (১) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ১৪০৮ কি মি সঞ্চালন ও ৫৩০৭ কি মি বিতরণ লাইন, (২) ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষের আওতায় ৬৬ কি মি সঞ্চালন ও ৩৭১৪ কি মি বিতরণ লাইন এবং (৩) পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ডের আওতায় ৫০,০০০ কি মি বিতরণ লাইন স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জুলাই ২০০১ এর মধ্যে শেখ হাসিনার সরকার ৪টি বার্জ মাউন্টেড উৎপাদন কেন্দ্র (৪০০ মেগাওয়াট), ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২১০ মেগাওয়াট), হরিপুর সংযুক্ত সাইকেল কেন্দ্র (১১০ মেগাওয়াট), চট্রগ্রাম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

(২১০ মেগাওয়াট), বাঘাবাড়ী গ্যাস টারবাইন কেন্দ্র (১০০ মেগাওয়াট) নির্মাণ শেষ করে জাতীয় গ্রিডে ১৬৪০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সমর্থ হয়। (ময়মনসিংহে ১০০ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন গ্যাস টারবাইন কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে সমাপ্ত হয়। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটে জোট সরকারের আমলে)। এর বাইরে ব্যক্তি উদ্যোগে ৩০ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন ৩টি ক্ষুদ্রাকার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানো হয়। সাথে সাথে ইতোমধ্যে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের পরিকল্পিত পুনর্বাসন ও মেরামত সম্পন্ন করে ১৯৯৫ এর তুলনায় অতিরিক্ত ৫৩০ মেগাওয়াট উৎপাদন নিশ্চিত করা হয়। ফলত ২০০১ সালের জুলাইতে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের দৃঢ় ক্ষমতা (firm capacity) ৪২০০ মেগা ওয়াটে উন্নীত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই পরিবর্ধিত ক্ষমতা ১৯৯৫ সালে লব্দ দৃঢ় উৎপাদন ক্ষমতা ২০০০ মেগাওয়াটের চেয়ে ২১০% বেশি। বাংলাদেশের ইতিহাসে মাত্র ৪ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এত বেশি হার এর আগে কখনও অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৯৭-২০০২) আওতায় এসব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পরও শেখ হাসিনার সরকারের সমাপনী বছরের অর্থাৎ ২০০১-২০০২ এর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নের জন্য ১৮টি বিদ্যুৎ উৎপাদনের চলতি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এদের মোট অনুমোদিত উৎপাদন ব্যয় ছিল ২২ হাজার ২ শত ২৩ কোটি টাকা। এর বাইরে সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষেত্রে গ্রন্থিত হয়েছিল ৩২টি প্রকল্প (দ্রষ্টব্য, পরিকল্পনা কমিশন, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০০১-২০০২, পৃষ্ঠা-১৫৩-১৬৯)। দেশের দ্রুত শিল্পায়ন, সেচ পরিচালনা ও পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য অপরিহার্য উপকরণ হিসাবে বিদ্যুতের সরবরাহ চাহিদার আগে বাড়ানোর লক্ষ্যে এসব প্রকল্প শেখ হাসিনার সরকার গ্রহণ করেছিল। ২০০১ এর জুলাই এ লতিফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা পদে আসীন হয়ে সংবিধান লংঘন করে এই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সকল কার্যক্রম স্থগিত করে। সংবিধান বিরোধী এ কাজ লতিফ গংরা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জনমত অনৈতিক ভাবে প্রবাহিত করার অপচেষ্টায় প্রযুক্ত করে। পরে ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর খালেদা-নিজামীর জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে এই সব প্রকল্পের কাজ বন্ধ রেখে প্রকল্পের সরবরাহকারী ও ঠিকাদারদের সাথে সরকারি গোষ্ঠীর স্বার্থের অনুকূলে কথিত বন্দবস্তে পৌছার অপচেষ্টা চালায়। ফলত সকল প্রকল্পের

অগ্রগতি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। একই সাথে ২০০২ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে জোট সরকার নতুন প্রকল্প গ্রহণে ব্যর্থ হয়। ২০০১-২০০২ অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি স্থগিত রেখে ২০০৪ পর্যন্ত নতুন প্রকল্প গ্রহণ না করার ব্যর্থতা দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় ধ্বস নামিয়ে আনে। শিল্পায়ন, সেচ কাজ ও সার্বিক ভাবে দেশব্যাপি পল্লী বিদ্যুতায়নের কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়। যেখানে বার্ষিক দেশজ উৎপাদ বাড়ার হারের কমপক্ষে দেড়গুণ হারে প্রতিবছর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ার অভিজ্ঞতা লব্ধ প্রয়োজন বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত, সেখানে বিদ্যুতের উৎপাদন শেখ হাসিনার শাসনামলের পর ২০০৪ পর্যন্ত কার্যত ১ মেগাওয়াট পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হয়নি। ২০০৫-এ শেখ হাসিনার সরকারের আমলে পরিকল্পিত টংগীর ৮০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র খালেদা জিয়া উদ্বোধন করেন। বাস্তবায়নাধীন প্রক্রিয়ায় অসংগতি এবং দুর্নীতির কারণে উদ্বোধনের ১ ঘন্টার মধ্যে কেন্দ্রটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। শুধু এই নয়, প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এবং পুরানো ও অকর্মণ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের ইউনিট সমূহকে অবসর প্রদানের কারণে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের দৃঢ় ক্ষমতা ৩৭০০ মেগাওয়াট এর নিচে নেমে আসে। ২২ মার্চ সারাদেশে ৩৩৫৮ মেগা ওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি। এর বিপরীতে ঐদিন বিদ্যুতের চাহিদা ৪৬০০ মেগাওয়াটে প্রাক্কলিত হয়। ফলত ঐদিনই লোডশেডিং এর মাত্রা দাঁড়ায় ১২৪২ মেগাওয়াট।

২০০৫-২০০৬ এর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিদ্যুৎ খাতের জন্য মোট বরাদ্দ হয়েছে ৩২৭০ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ প্রক্ষেপিত হয়েছে ১১৭৭ কোটি টাকা। এই বরাদ্দের বিপরীতে ৬০টি বিনিয়োগ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের চলতি প্রকল্প। এর প্রতিটি প্রকল্প শেখ হাসিনার সরকারের আমলে অনুমোদিত (দ্রষ্টব্য, পরিকল্পনা কমিশন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০০৫-২০০৬, পৃষ্ঠা-১১৮-১২০)। অন্য কথায়, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সঞ্চালন ও বিতরণ বাড়ানোর জন্য খালেদার সরকার কার্যত কোনো নতুন প্রকল্প বা কার্যক্রম এখন পর্যন্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। অব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্তহীনতা ও দুর্নীতির আছরে বা টানাপোড়নে ইতোমধ্যে অনুমোদিত ২০০৫-২০০৬ এর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে গ্রন্থিত চলতি প্রকল্প গুলো ২০০৬ এর মধ্যে বাস্তবায়িত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এই পটভূমিকায় ক'দিন আগে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী জরুরি ভাবে

ভাসমান কিংবা স্থানান্তরক্ষম অধিক মূল্যের বিদ্যুৎ কেন্দ্র আনয়ন ও স্থাপন করার নির্দেশ জরুরি গণ প্রয়োজনের মোড়কে গোষ্ঠী বিশেষের আখের গোছানোর অপচেষ্টা বলে প্রতিভাত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর তথাকথিত নির্দেশ অনুযায়ী আগামী তিন মাসের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে অতিরিক্ত ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ করার প্রচার অভিযান বিদ্যুৎ খাতে অব্যাহত অব্যবস্থাপনার পটে মিথ্যার বেসাতি বলেই মনে হচ্ছে (দ্রষ্টব্য, দৈনিক জনকণ্ঠ, মার্চ ২৩, ২০০৬)। ফলত ২০০৭ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ খাতে কোনো উন্নয়নের সম্ভাবনা নাই বললেই চলে।

বিদ্যুৎ খাতে এই বিপর্যয় কেন হলো? কারণ মূলত ৪টি। এক, সাহাব-লতিফ চক্র কর্তৃক ২০০১ সালের জুলাই থেকে বিদ্যুৎ খাতে শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক গৃহীত ও ২০০১-২০০২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন স্থগিত রাখা। এই সকল প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় তৎকালীন সংসদ কর্তৃক ২০০১-২০০২ সালের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বা কার্যক্রম হিসাবে অনুমোদিত। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন বা তাদের জন্য ব্যয় নির্বাহ কারণ স্থগিত করে সংবিধান ও আইন লংঘন এবং দেশের উন্নয়নের পথে দায়িত্বহীন পথ-বন্ধক সৃষ্টি করেছিল। বিদ্যুৎ খাতে বিপর্যয়ের সূচনা ঘটিয়ে জনস্বার্থ লংঘন এবং সংবিধান ও আইনবহির্ভূত ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের অপরাধে সাহাব-লতিফ গংদের এজন্য দেশের প্রচলিত আইনে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। দুই, ২০০১ এর অক্টোবরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর খালেদা গং এর সরকার ঈর্ষাকাতর হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনুমোদিত এসব প্রকল্পের বাস্তবায়নের উপর স্থগিতাদেশ বহাল রাখে। একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে ৩ থেকে ৫ বছর সময় প্রয়োজন। খালেদার সরকার ঈর্ষাকাতরতার তামসীতে আবিষ্ট হয়ে সাহাব-লতিফ গংদের বেআইনী ভাবে প্রদত্ত স্থগিতাদেশ বহাল রেখে যে কালক্ষেপণ করে তা পরবর্তী দেড় বছরে তারা পুষিয়ে নিতে সক্ষম হয়নি। অধিকাংশ প্রকল্পের জন্য যে সব প্রকল্প সাহায্য বা সরবরাহ ঋণ বিদেশী উৎস হতে সংগ্রহনীয় ছিল সে সবের চুক্তি-আলোচনায় তারা যথা সময়ে হাত দিতে সক্ষম হয়নি। ফলত এখন পর্যন্ত শিকলবাহা (১০০ মেগাওয়াট) সংযুক্ত চক্র প্রকল্প, সিদ্ধিরগঞ্জ (২৪০ মেগাওয়াট) প্রকল্প এবং ময়মনসিংহ (৭০ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ইতোপূর্বে প্রস্তাবিত প্রকল্প

সহায়তা ও সরবরাহকারীর ঋণ চুক্তি তারা সম্পাদিত করতে পারেনি। এসব প্রকল্প সমূহের শুরু বা শেষ ২০০৬ এর ডিসেম্বরের মধ্যে হবে বলে আশা করা যায় না। তিন, প্রায় সব প্রকল্পের অর্থায়ন, দরপত্র-বাছাই, সরবরাহ ও স্থাপন চুক্তিকরণে খালেদা-নিজামী সরকারের অব্যাহত ও সীমাহীন দুর্নীতি প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে পথ-বন্ধক সৃষ্টি করেছে। খুলনার (২১০ মেগাওয়াট) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিলেটের (১৫০ মেগাওয়াট) সংযুক্ত চক্র কেন্দ্র, ভেড়ামারার (৪৫০ মেগাওয়াট) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সরবরাহ ঋণ পাওয়ার প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত বা কাজ আটকিয়ে গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধার করার মচ্ছবে প্রযুক্ত হয়েছে এই সরকার। চাঁদপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে দরিয়া ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে (দ্রষ্টব্য, মহীউদ্দীন খান আলমগীর, চাঁদপুর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণঃ দরিয়া ডাকাতি, সেপ্টম্বর ২৫, ২০০৪)। এই প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠীবাজরা বার বার প্রকল্পের বিনির্দেশিকা, টেন্ডার বা বিড দলিল, যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহে অনুসৃতব্য পদ্ধতির বেশরম হেরফের করেছে। এসব কেন্দ্র সম্পর্কিত আর্থিক ও প্রযুক্তিক চুক্তি সমূহের মধ্যে নিহিত মধ্যস্থতাকারীর কমিশন প্রকল্প ব্যয় কত বাড়িয়ে, কার মাধ্যমে, কোথায়ও কার উপযোগে প্রযুক্ত হবে, উপযোগ-প্রাপ্তির সিংহভাগ সিরাজগঞ্জ, না বগুড়া না মৌলভীবাজারের শকুন-শকুনীদের মচ্ছবধামে পৌঁছান হবে তা নির্ধারন করতে করতে অনেক সময়ক্ষেপণ হয়ে গেছে এদের। সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে সিদ্ধান্তায়ন শ্লথ না হলেও দুর্নীতির রাহুগ্রাসে প্রায় একই মাত্রায় স্থবির ও অকার্যকর হয়েছে। দুর্নীতির কারণে সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের প্রকল্প সমূহের বিপরীতে সরঞ্জাম আহরণ প্রক্রিয়ায় প্রকৃত বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত সরবরাহ ইপ্সিত গুণগত উৎকর্ষ সম্পন্ন ৬০% এর বেশি পরিমাণে আহরিত হয়নি বলে ওয়াকেবহাল মহলের ধারণা। দুর্নীতির এই মচ্ছবে বিদ্যুৎ খাতে প্রতিষ্ঠিত ও কর্মরত সকল সংগঠনের পদ সমূহ নীলামে তুলে যোগ্যতার বিবেচনা নির্বাসনে ঠেলে দিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে রাজনৈতিক প্রভুরা বিক্রী করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলত বিদ্যুৎ বিতরণে সিস্টেম লস বা চুরি এই সরকার নিজেরাই ক্লেপটক্রেসির তমঘা নিয়ে কমাতে সক্ষম হয়নি। সিস্টেম লস কমানোর কার্যক্রমেও মিথ্যা সফলতার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ডেসার পুরস্কারের ১০ কোটি টাকাও লোপাট করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য, ডেইলি স্টার, মার্চ ২৪, ২০০৬)। সঞ্চালন ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় এই দুর্নীতি মণ্ডিত বিপর্যয় স্বল্পতর মাত্রায় উৎপাদিত বিদ্যুতের সুষম কিংবা সর্বাপেক্ষা ব্যবহার বিদ্যুৎ খাতে অনুসরণীয় সূত্র থেকে নির্বাসিত করে ফেলেছে।

এই প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাঙ্ক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বিদ্যুৎ খাতে তেমন কোনো সহায়তা দিতে অস্বীকার করেছে, জার্মানি প্রতিশ্রুত সহায়তা প্রত্যাহার করেছে। চার, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সময় ব্যাপ্তিতে অর্থনীতির সকল খাতের সাথে সমন্বিত করে প্রসারিত করার জন্য প্রয়োজন মেয়াদী পরিকল্পনা। খালেদা-নিজামী গংরা শেখ হাসিনার সরকার প্রণীত পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) এর পর প্রণীতব্য ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। চার বছর পর্যন্ত পরিকল্পনার প্রত্যয়কে অবকাশে রেখে তারা ২০০৫ এ দারিদ্র বিমোচনীয় মৌল কৌশল পত্রে উন্নয়নের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে নিশ্চুপ রয়েছেন। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করে কখন কোথায় কি মাপের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হবে, সঞ্চালন, বিতরণ ও উৎপাদনের সাথে খাপ খাইয়ে কি মাত্রায় ও কি ভাবে প্রসারিত হবে সেসব বিষয়ে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা, এখন কি ভাবনাও তাদের আছে বলে প্রতিভাত হয়নি। ফলত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন বিষয়ক প্রকল্প নিয়ে গোষ্ঠীগত স্বার্থের দানবী শাবল বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে সময়ক্ষেপণ ও প্রতিনিয়ত অথর্বতার আওয়াজ তুলে যাচ্ছে।

তাহলে কি দেখা যাচ্ছে? খালেদা-নিজামীর জোট সরকার বিদ্যুৎ খাতে (১) সাহাব-লতিফ গং এর অসাংবিধানিক বেআইনী ও অনৈতিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সৎসাহসিকতা দেখায়নি, (২) ঈর্ষাকাতরতার বাইরে শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক প্রণীত বাস্তবসম্মত এবং ফলপ্রসূ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প সমূহ যথাযথ সময়ে ও সুনির্দিষ্ট ভাবে অনুসরণ করেনি, (৩) প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে অকথ্য দুর্নীতিকেই একমাত্র নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে, বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহকে জাহেলের তামসী জাঙ্গালে হারিয়ে ফেলেছে এবং (৪) সময়ব্যাপ্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারি অযোগ্যতার এই চতুর্মাতিক সর্বনাশা বিস্তৃতি ও অভিব্যক্তি গত ৫০ বছরে একমাত্র মিয়ানমার ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার অন্য কোনো দেশে প্রতিভাত হয়নি। ফলত দেশের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ও সার্বিক উন্নয়নে ও দারিদ্র বিমোচনে বিদ্যুতের অভাব জোট সরকারের সার্বিক ব্যর্থতাকে প্রকটতর করেছে, ক্ষমতার শেষ বছরে বিদ্যুৎ সঙ্কটে জনরোষের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে সরকারের নেতৃবৃন্দকে (দ্রষ্টব্য, দৈনিক জনকণ্ঠ, মার্চ ২৪, ২০০৬)।

২০০৬ এর ১১ ফেব্রুয়ারি দেশের শিল্পবাণিজ্য সংস্থার ফেডারেশনের এক সভায় দেশের শিল্পবাণিজ্যের দিকপালরা বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের কাজের উপর

সরকারের কিসমত নির্ভর করছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য,. ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ১২, ২০০৬)। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে খালেদা-নিজামীর সরকারের বিস্তৃত ব্যর্থতা তাদের সীমাহীন অযোগ্যতাকে বিমুর্ত করে গরিমা-ফাঁপানো কিসমত জনরোষে সিল-গালা করে উন্নয়ন-ইতিহাসের অন্ধকারে টেনে তোলার সিমার নিচে ঠেলে দিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, মার্চ ২৭, ২০০৬

থাইল্যান্ডের থাকসিন, বাংলাদেশের খালেদা

২০০৬ এর ১৯ এপ্রিল ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর অফিস ঘেরাও করেছিল জনতা। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ১৪ দলের নেতাকর্মীরা প্রধানমন্ত্রীর অফিসে যাওয়ার জন্য ব্যবহার্য ১৭টি সড়কে অবস্থান নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অফিসে এবং সেই অফিসে কাজ সারার জন্য ভিন্নতর অফিসের লোক ও অন্যান্য নাগরিকদের কাউকে যেতে দেননি। প্রধানমন্ত্রীর অফিসে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মুখ্যসচিবের নির্দেশে আগের রাত্রি থেকে অফিসেই অবস্থান নিয়েছিলেন। অবরুদ্ধ অবস্থায় সেদিন প্রধানমন্ত্রীর অফিসে কোনো কাজ করা সম্ভব হয়নি। সরকারের পেটোয়া পুলিশের সড়ক-বন্ধক, ঢিল, লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, রবার বুলেট ও ছররা গুলির হুমকি-হামলা সত্ত্বেও বিক্ষুব্ধ লাখো জনতা নিষ্কাম অর্থবতায় শুনশান করে দিয়েছিল স্বৈরতান্ত্রিক-চৌর্যতন্ত্রের সেই পীঠস্থানকে। জননেতা আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, মোহাম্মদ নাসিম, রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু প্রমুখ বিভিন্ন অবস্থানে বিক্ষুব্ধ জনগণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শাসক গোষ্ঠীর পেটোয়া পুলিশ বাহিনীর নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন মতিয়া চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিম, আসাদুজ্জামান নূর, সাবের হোসেন চৌধুরী সহ তিন শতাধিক নেতাকর্মী। পুলিশী নির্যাতন থেকে রেহাই পাননি আলেম সমাজের প্রতিনিধি, স্কুলগামী শিশু-কিশোর ও নিরীহ পথচারী বৃন্দ। গ্রেফতার করা হয় শত শত কর্মী ও বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতিভূদিগকে। পুলিশী বাঁধা, তাদের ঢিল, লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, রবার বুলেট, ছররা গুলি ও নির্বিচার গ্রেফতার ছাপিয়ে রাজধানী কেঁপে উঠেছিল লাখো জনতার অপ্রতিরোধ্য প্রতিবাদে (দ্রষ্টব্য, দৈনিক জনকণ্ঠ, সংবাদ, যুগান্তর, এপ্রিল ২০, ২০০৬)।

প্রধানমন্ত্রীর অফিস অবরোধ কেন করা হলো? কারণ, ২০০১ এর অক্টোবর থেকে বাংলাদেশে অব্যাহত সন্ত্রাস, নিপীড়ন ও অত্যাচার, দুর্নীতি, মূল্যস্ফীতি,

মোট কথা, সার্বিক দুঃশাসনের নিশানে-হায়দার হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর অফিস। এই অফিস থেকে উৎসারিত নির্দেশ অনুযায়ী ২০০১ এর অক্টোবর থেকে চলেছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংখ্যালঘুদের উপর সন্ত্রাস ও নির্যাতন। ২০০১ এর অক্টোবর থেকে ২০০৫ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে (১) হত্যার অপরাধ ঘটেছে ৩৭৮৬২টি, (২) রাজনৈতিক নিপীড়নে আহত হয়েছেন ১৬০৯২৩ জন, (৩) নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ ও পাচারের সংখ্যা হয়েছে ৬৫৭৪২ জন, (৪) বিরোধী দলীয় নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ১ লাখেরও বেশি এবং এসব মামলার শিকার হয়েছেন ৬ লক্ষাধিক নির্দোষ ব্যক্তি, (৫) ডাকাতি, লুট, দখল, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও অপহরণের অপরাধ ঘটেছে ২১ লক্ষ ৩২ হাজারেরও বেশি, (৬) সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১৫ লক্ষ ১২ হাজার এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনের অপব্যবহার ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলা বাবদ সমাজের ক্ষতি হয়েছে ২০৪৮ কোটি টাকা (দ্রষ্টব্য, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, পুলিশ ও প্রশাসন ঃ ২০০১-২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ, নভেম্বর ৯, ২০০৫)। দুর্নীতির মচ্ছবে এই সরকার ও তার চেলাচামুণ্ডরা ২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত ৪ বছরে কমসেকম ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ জনসম্পদ লুট করেছে। দুর্নীতিবাজ নেতৃত্ব ও লুটেরারা দেশ থেকে হুণ্ডি, ওভারইনভয়েসিং, আন্ডার ইনভয়েসিং এবং কার্ববাজার থেকে নগদে তুলে ১.৫ বিলিয়ন ডলার দেশের বাইরে পাচার করে নিয়ে গেছে (দ্রষ্টব্য, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, জোট সরকারের অর্থনৈতিক অথর্বতা, দৈনিক জনকণ্ঠ, সেপ্টেম্বর ৫, ২০০৩)। রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্ক সমূহ থেকে জনগণের গচ্ছিত টাকার বিপরীতে কেবলমাত্র দলীয় নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের ঋণ দিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বেশরম অপপ্রয়োগ ও ধ্বংস সাধন করেছে খালেদার অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নক্রমে লোপাট করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ। সন্ত্রাস, নির্যাতন, দুর্নীতি, মূল্যস্ফীতি সম্বলিত এই সার্বিক দুঃশাসন এখনও অব্যাহত রয়েছে। এই সরকারের নেতৃত্বের অশালীন অর্থলিপ্সা ও স্বজন তোষণের ফলশ্রুতিতে বিদ্যুতের অলভ্যতা দেশের শিল্পায়ন ও সেচ তথা কৃষি উৎপাদনকে স্থবির করেছে, ১০ টাকা কেজি চালের দাম ২২, ২৪ টাকা কেজি ডালের দাম ৭০ টাকা, ২৮ টাকা কেজি চিনির দাম ৭২ টাকা, ৩০ টাকা লিটার সয়াবিনের দাম ৬৫ টাকায় উঠিয়ে সারা দেশে সাধারণ মানুষের জীবনকে অপ্রতুলতা, অভাব আর অপুষ্টির শৃংখলে বেঁধে দিয়েছে। জনগণ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর অফিস অবরোধের অর্থ তাই হয়েছে সন্ত্রাস, নির্যাতন, লুট, দুর্নীতি,

দ্রব্য মূল্যের অব্যাহত উর্ধগতি সম্বলিত সার্বিক দুঃশাসনের প্রতিকূলে অবরোধ স্থাপন। এই অবরোধে প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের দাবী ও শ্লোগানঃ দুঃশাসন নিপাত থাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক। অনুরণিত হয়েছে এককণ্ঠ থেকে লাখো কণ্ঠে, গত শতাব্দীর শেষ দশকের সূচনা লগ্নে শহীদ নুর হোসেনের সেই অমর আর্তি---স্বৈরতন্ত্র নিপাত থাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক। অখণ্ডনীয় সামষ্টিক দৃঢ়তার সাথে উচ্চারিত হয়েছে এদেশের গণ মানসঃ সারা দেশে দুঃশাসনকে অবরোধ করে যাবে এই জাতি স্বাধীন সত্বায় সমৃদ্ধি অর্জনের স্বপ্নের পথে।

সেদিন ১৯ এপ্রিল প্রখর রোদে মাথা উঁচু করে মূলত এই কথাগুলোই বলেছি মহাখালীর রেলগেটে, ট্রাকের উপর দাঁড়িয়ে, সমবেত হাজার হাজার মানুষের মিলে, সহ রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, কাজী জাফর উল্লাহ, রাশেদ খান মেনন, এডভোকেট সাহারা খাতুন, এ কে এম রহমতউল্লাহ ও অন্যান্যদের পাশে দাঁড়িয়ে। আগে ও পরে, আসতে আসতে, যেতে যেতে রেলগেটের পূর্ব দিকের চত্বরে বসে, তুলে ধরেছি স্থানীয় নেতা কর্মীদের কাছে। মনে করেছি, ক'দিন আগে থাইল্যান্ডে ঘটে যাওয়া জনরোষের সামনে প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনওয়াত্রার সরকার থেকে সরে যাওয়ার ও নির্বাসিত হওয়ার কথা।

এপ্রিলের পহেলা সপ্তাহে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ছিলাম আমি। ২ এপ্রিল হয়েছিল সেদেশের আগাম নির্বাচন। প্রধানমন্ত্রী থাকসিনের অপশাসন ও দুর্নীতির প্রতিবাদে পিওপল'স এলায়েন্স ফর ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রের জন্য জনতার মোর্চার নেতৃত্বে সারা থাইল্যান্ড প্রতিবাদ মুখর হওয়ায় আগাম নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। ২০০৫ এ পুনর্বার বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাই-রাক-থাই (সরল অর্থে, থাইরা থাইদের ভালোবাসে) পার্টির প্রধান হিসাবে থাকসিন ধরাকে সরা জ্ঞান শুরু করেন। তার প্রতিষ্ঠিত ও মালিকানাধীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বিশেষত সিন করপোরেশন অভাবিত মাত্রায় প্রসারিত হয়। তার সরকার তাদের দলভুক্ত সংসদ সদস্যদের এলাকায় সরকারি নিরীখের বাইরে স্থানীয় উন্নয়ন ও কুশলের মোড়কে বিরাট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ দেয়। একই সময়ে তার সরকার সংবিধান অনুযায়ী নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলীতে নগ্ন হস্তক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত সমূহে গোষ্ঠীস্বার্থিক প্রভাব বিস্তার করে চলে। নির্বাচন কমিশন, সাংবিধানিক আদালত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বিচার বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসন ব্যাংককে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বেপরোয়া বেসরকারিকরণ ও

প্রতিবেশী দেশ সমূহের সাথে ক্ষণিক বা খেয়ালী বিবেচনায় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করণের অপচেষ্টা জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলে। ২০০৬ এর জানুয়ারিতে প্রকাশ পায় যে থাকসিনের পরিবার তাদের মালিকানাধীন টেলিকম কোম্পানি সিন করপোরেশনের প্রায় ৫০% শেয়ার সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ সংস্থা টেমাসেকের কাছে দেয় কর না দিয়ে ১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বিক্রী করেছে (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সিটি সেলের প্রায় ৫০% শেয়ার সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রীয় টেলিকম সংস্থা সিঙ্গ টেলের কাছে বিক্রি-লব্ধ আয়ের বিপরীতে সিটি সেলের রাজনৈতিক শক্তিধর মালিকরা আইনানুগ করদায় শোধ করেছেন কিনা তা এখনও জানা যায়নি)। অভিযোগ সোচ্চারিত হয়েছে থাকসিনের পুত্রের সীমাহীন ও অব্যাহত দুর্নীতির বিরুদ্ধে। জনতার অদমনীয় দাবীর মুখে সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ কমিশন থাকসিনের পুত্র পনথঙ্গটানকে ২০০১ এর সেপ্টেম্বর থেকে ২০০5 পর্যন্ত কারবারী অস্বচ্ছতা ও প্রতিবেদন দাখিলে বিফলতার দায়ে জরিমানা করে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার অপচেষ্টায় দেশব্যাপি মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে। সরকারি চাকুরি ও সরবরাহ-নির্মাণ প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কুক্ষিগত করে। দক্ষিণ থাইল্যান্ডের মুসলিমদের উপর অহেতুক পুলিশী নির্যাতন চালান হয়। সংবাদ মাধ্যম ও আইন অনুগামী সংবাদসেবীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার অপচেষ্টা বার বার প্রযুক্ত হয়। দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আদালত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এগাত পিএলসি বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া বেআইনী ঘোষণা করে বন্ধ করে দেয়। ব্যাংককের দি নেশন পত্রিকার মূল্যায়ন অনুযায়ী পাঁচ বছরের থাকসিনের শাসনামলে থাইল্যান্ডে (১) গণতন্ত্রকে গুরুত্ব বিবর্জিত, (২) দুর্নীতিকে বিস্তৃত, (৩) সাংবিধানিক শাসনের চেক ও ব্যালান্সের প্রক্রিয়া অবদমিত, (৪) সংবাদ মাধ্যমকে শৃংখলিত, (৫) নাগরিকদের মানবাধিকারকে পদদলিত এবং (৬) সুশীল সমাজকে আতংকিত করা হয় (দ্রষ্টব্য, সম্পাদকীয়, দি ন্যাশন, ব্যাংকক, এপ্রিল ৬, ২০০৬)। ফলত তার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল ও অসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ গণতন্ত্রের জন্য জনতার মোর্চা বা পিওপল'স এলায়েন্স ফর ডেমোক্রেসি গড়ে তুলে সাংবিধানিক সংস্কার ও নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন এবং তার পদত্যাগ দাবী করে। পদত্যাগের দাবী দেশব্যাপি বিক্ষোভ আর সমাবেশের মাধ্যমে বিস্তৃত ও জোরদার হতে থাকে। সারা দেশে সোচ্চারিত হয় ইপ্সিত সাংবিধানিক সংস্কার ছাড়া নির্বাচন ফলপ্রসূ হবে না এবং থাকসিনকে প্রধানমন্ত্রী রেখে সংস্কার সম্ভব হবে না। নির্বাচনের আগে ২৯ মার্চ ব্যাংককের

সিয়াম চত্বরে লাখো নাগরিকদের সমাবেশে থাকসিনের পদত্যাগের দাবী জাতীয় দাবী হিসাবে ধ্বনিত হয়। তার এককালীন শক্ত সমর্থক সংধি লিমথংকুল ও অন্যরা তার অপকর্ম জনসম্মুখে তুলে ধরে পদত্যাগের দাবী অপ্রতিরোধ্য করে তুলে। তার পূর্বতন মিত্র বৌদ্ধ শ্রমণ নেতা চামলং শ্রীমুয়াংও এই দাবীতে সামিল হন। এসব পাশ কাটিয়ে উঠার উদ্দেশ্য থাকসিনই ২ এপ্রিল আগাম নির্বাচন দিয়েছিলেন। জনতার মোর্চার অন্তর্ভুক্ত প্রধান ৩টি বিরোধী রাজনৈতিক দল নির্বাচন বয়কট করে। এসব প্রতিবাদী রাজনৈতিক দল ভোটারদিগকে ব্যালট পেপারে কোনো ভোট চিহ্ন রেকর্ড না করে থাকসিনের প্রতিকূলে না সূচক ভোট দেয়ার আহব্বান জানায়। নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ডে অস্বচ্ছতা, পক্ষপাতিত্ব ও কারচুপির অভিযোগ উঠে। থাকসিন কর্তৃক নির্বাচন বিধি লংঘনের সুস্পষ্ট দলিলায়িত অভিযোগ নির্বাচন কমিশন আমলে না নিয়ে থাকসিনের অনুকূলে নির্বাচনী বুথের অবস্থান সমূহও পরিবর্তন করে। বহু নির্বাচন বুথেই থাকসিনের প্রচারপত্র দেখা যায়। ৫০০ সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টে থাকসিনের দলভুক্ত ৩৬০ জন প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচিত ঘোষণা করে। এর মধ্যে ২৭৬ জন বিনাপ্রতিদ্বন্দিতায় জয়ী হন বলে বলা হয়। ফলত নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী আন্তর্জাতিক ও দেশী সংস্থা সমূহ জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনগণের গোপন ভোটাধিকার লংঘন করার দায়ে অভিযোগ উত্থাপন করে। এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন জানান যে মানবাধিকার কমিশনের জেনেভাস্থ সদর দফতর অভিযোগটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করে। বেশ কয়েকটি স্থানীয় এলাকায় ভোটের ফলাফল বাতিল করার জন্য মামলা দায়ের করা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসাবে জানা যায় যে ২০০৫ এর নির্বাচনের তুলনায় বেশ কম সংখ্যক ভোটার এই নির্বাচনে ভোট দিতে যান এবং সারা দেশে সকল ভোট প্রদানকারীর মধ্যে ৫০.১৩% ব্যালট পেপারে কোনো ভোট চিহ্ন রেকর্ড না করে থাকসিন ও তার দলের প্রতিকূলে জনতার মোর্চার না সূচক ভোট দেয়ার আহব্বান অনুযায়ী কাজ করেন। এর অর্থ, পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন থাকসিনের দলকে বিজয়ী ঘোষণা করলেও বাস্তবে সংখ্যাগরিষ্ট ভোটাররা তাকে প্রত্যাখ্যান করে (দ্রষ্টব্য, অনুরাজ মনিবন্ধু, No Vote is a Lesson for Thaksin, ব্যাংকক পোষ্ট, এপ্রিল ৪, ২০০৬)। সকল দিক বিবেচনা করে সর্বজন শ্রদ্ধেয় থাই নৃপতির সাথে আলোচনা করে ৪ এপ্রিল থাকসিন সিনওয়াত্রা প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। জনতার মোর্চা গণতন্ত্র ও জনগণের বিজয়কে চৌর্যতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের

করাল গ্রাস থেকে ফিরিয়ে আনে। থাইল্যান্ডের প্রায় সকল জনগোষ্ঠী স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলেন, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য আবার প্রশাসনে আস্থা স্থাপন করে অধিকতর অর্জনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নিশানা দেখায়। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের অন্তর্বপ্রবাহ বাড়াতে সন্দিপীত হোন। মুদ্রা বাজারে থাই মুদ্রা বাথ দু'দিনেই ডলারের আপেক্ষিকতায় অধিকতর মূল্যমান অর্জন করে (দ্রষ্টব্য, দি নেশন, ব্যাংকক, এপ্রিল ৬, ২০০৬)।

এই ১৯ এপ্রিলে এই ঢাকায় অবরোধ শেষে ভেবেছি, থাইল্যান্ডের থাকসিনের ২ এপ্রিলের নির্বাচনী প্রহসন ও কলঙ্কের মাধ্যমে জনতার বিজয়কে স্বীকার করে বিদায় নেয়ার কথা। সেদেশের থাকসিনের সাথে এদেশের খালেদা ও তার সরকারের বেশ মিল আছে। ২০০১ এর অক্টোবর থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার মোড়কে খালেদার সরকার বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও নির্যাতন দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার অপচেষ্টা চালায়, দুর্নীতিকে মুখ্যনীতি হিসাবে গ্রহণ করে জনগণের সম্পদ গোষ্ঠীগত স্বার্থে লুট করার মচ্ছবে প্রবৃত্ত হয়, সকল সাংবিধানিক সংগঠন ও পদ্ধতি থেকে নিরপেক্ষতার প্রত্যয়কে বিসর্জন দেয়, বিচার বিভাগ ও নির্বাচন কমিশনকে গোষ্ঠীগত স্বার্থের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের হোলি খেলায় মেতে উঠে। চট্টগ্রাম এম এ হান্নান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বছর দেড়েক আগে থাকসিন এসেছিলেন তার দেশের সিল্ক এয়ারের সার্ভিস উদ্বোধন ও প্রসারণ উপলক্ষে। শোনা যায় তখনই খালেদা-থাকসিনের মাঝে অনুক্ত সমঝোতা হয়েছিল জাপানি সহায়তায় নির্মিত এদেশের ঐ বিমানবন্দর গোষ্ঠীস্বার্থে থাই ব্যবস্থাপনার আওতায় তুলে দিতে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খানের তথাকথিত পূর্বমুখী কূটচালের মোড়কে ঘটা করে খালেদাকে এর পরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ব্যাংককে। পরে থাকসিন বিমান ভরে থাই মেওয়া পাঠিয়েছিলেন নাকি খালেদা গং এর সাথে সম্পর্ক উষ্ণতর করার লক্ষ্যে। বিবেচনার যে কোনো নিরীখে দোস্তি সমপর্যায়ে থাকা সত্ত্বেও দুঃশাসন, নির্যাতন, দুর্নীতি ও অগণতান্ত্রিক আচরনে খালেদার সরকার থাকসিনের সরকারের উপরে অনেক কাঠি উঠে এসেছে। দলীয় স্বেচ্ছাচারিতার মানদণ্ডে খালেদার বিএনপি রয়েছে থাকসিনের থাই-রাক-থাই দলের সমপর্যায়ে। রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান, উদাহরণত বিচার বিভাগ, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নির্বাচন কমিশন, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড, এমনকি বেসরকারি স্কুল-কলেজ পরিচালনায় খালেদা সরকারের অশুভ চাপ ও দলীয় হস্তক্ষেপ সর্বজন বিদিত। খালেদার দুঃশাসনিক পায়তারায় দেশের সকল গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রযুক্ত সার্ভিস সমূহ অশুভ

রাজনৈতিক চাপে দিশাহারা এবং জনস্বার্থ বিবর্জিত সংগঠনে পর্যবশিত হয়েছে। গণতান্ত্রিকতা ও সুশাসনের অনুকূলে জনগণের দাবী খালেদা গং ক্রমাগত অবজ্ঞা করে যাচ্ছে। ১৯ এপ্রিলের অবরোধ এবং তার পরে ২০ এপ্রিলে দেশব্যাপি হরতাল প্রতিভাত করেছে যে নৈরাজ্য ও অপশাসন থেকে সুশৃংখল জনস্বার্থিক শাসনকে পৃথক করে রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে খালেদার অবস্থান ও উপস্থিতি। থাইল্যান্ডের থাকসিন দেশের বিপর্যয় রোধে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে সড়ে দাঁড়িয়েছেন। থাকসিনের অপসারণ আবারও প্রমাণ করেছে যে দুঃশাসন কোনো দেশেই চিরস্থায়ী হয় না। অপশাসন ও দুর্নীতির অকাট্য অভিযোগ সত্ত্বেও থাইল্যান্ডের জনগণ শেষ পর্যায়ে থাকসিনের এই সুবুদ্ধি উৎসারিত সিদ্ধান্তকে স্বাগত করেছেন। আমার সাথে ৩ এপ্রিল রাতে সবজি, গারুপা মাছ আর ফলফলাদি সহযোগে খেতে বসা কয়েকজন বিদগ্ধ থাই বন্ধুদের ভাষ্যঃ দুর্নীতিবাজ ও অপশাসক হওয়া সত্ত্বেও থাকসিনের প্রান্তিক মাত্রায় লজ্জাবোধ তাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে ৪ এপ্রিল সরে যেতে প্রণোদিত করেছে। খেতে খেতে বললাম আমি, থাকসিন ও খালেদার শাসনের একই ধরণের বৈশিষ্টের কথা, বাংলাদেশে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, মূল্যস্ফীতি ও দুঃশাসনের বিস্তৃতির কথা। বললেন তারা, তোমার দেশ বাংলাদেশে এই মাত্রার লজ্জাবোধ শাসকগোষ্ঠীর থাকলে তারা নিশ্চয়ই থাকসিনের মতো সরে দাঁড়াবেন। থাকসিনের মাত্রার প্রান্তিক লজ্জাবোধ ত তোমাদের প্রধানমন্ত্রী ও তার সাগরেদদের আছে। শুনেছি আমাদের থাকসিন আর তোমাদের খালেদা একে অপরের বন্ধু। উত্তরের বদলে ঘৃণার অনিচ্ছায় হাসি এল আমার মুখে। খালেদার দুঃশাসনিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে জেল খেটেছি আমি ও আমার ভাইপো ড. মুনতাসীর মামুন। তেমনি বিনাদোষে জেলে খাটানো হয়েছে অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদিগকে। থাই বন্ধুরা জানেন না হয়ত এর আগে এদেশের স্বৈরশাসক আর এক বিশ্ব বেহায়াকে গদী থেকে টেনে নামাতে হয়েছিল বাংলাদেশের জনতার মোর্চাকে। ১৯ এপ্রিলের অবরোধের শেষে পড়ন্ত বিকেলে তাই বলেছিলাম ১৪ দলের জনতার মোর্চার নেতা ও কর্মীবৃন্দকেঃ এদেশের সমকালীন বেশরম বিক্রমকে পরাভূত করার লক্ষ্যে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ আর সংগ্রামের জয়যাত্রায় শিথিলতা কিংবা সংগ্রামীদের বিশ্রামের কোনো অবকাশ নেই। সাংবিধানিক সংস্কার ভিত্তিক নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহীর দায়ে দায়বদ্ধ সরকার প্রতিষ্ঠিত করে সন্ত্রাস, দুর্নীতি আর দুঃশাসনের চির অবসান পর্যন্ত তা চলবেই, তা চলতেই হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, এপ্রিল ২৮, ২০০৬

বিদ্যুৎ সঙ্কট : বাংলাদেশ

থাইল্যান্ডে ছিলাম এই বছরের এপ্রিলের এক সপ্তাহ। ঢাকায়, বাংলাদেশে ফিরে এসে আবার দেখলাম দেশব্যাপি বিদ্যুৎ সঙ্কট। লোডসেডিং এর বিস্তৃতিতে সেচ বন্ধ, নতুন শিল্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া অসম্ভব, শহর বাজারে সন্ধার আলো নেই। পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থীরা মোমবাতি-হারিকেনের যুগে ফিরে গেছে। বিদ্যুতের দাবীতে কানসাটে কৃষকদের গুলি করেছে খালেদা-নিজামীর দুর্বিনীত দাম্ভিক সরকার। দেশের সকল এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে ধ্বস্ নেমেছে (দ্রষ্টব্য, সংবাদ, ভোরের কাগজ, এপ্রিল ১৩, ২০০৬)। ছোট ছোট জেনারেটর আর আইপিএসের বাজার বেড়ে চলেছে। থাইল্যান্ডে লোডসেডিং অশোনা, অজানা পরিস্থিতি; সেদেশের রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ ঘাটতি নয়, বরং উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ভাবছেন (দ্রষ্ট্রব্য, ব্যাংকক পোষ্ট, এপ্রিল ২, ২০০৬)।

থাইল্যান্ডে সমকালীন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০৫০০ মেগাওয়াট। এর বিপরীতে বিদ্যুতের সমকালীন চাহিদা ২০০০০ মেগাওয়াট, উদ্ধৃত্ত্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ মেগাওয়াট। বাংলাদেশে সমকালীন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩৩০০ মেগাওয়াট, চাহিদা ন্যুনপক্ষে ৪৫০০ মেগাওয়াট, উৎপাদন ঘাটতি ন্যুনপক্ষে ১১০০ মেগাওয়াট। থাইল্যান্ডে বিদ্যুতের সহজ ও প্রায় তাৎক্ষণিক লভ্যতা সেচের প্রসার ঘটাচ্ছে, কার্যক্ষম উপাদান হিসাবে দেশব্যাপি শিল্পায়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বাণিজ্য প্রসারের গতিকে শহরে গ্রামে প্রতি নিয়ত ঝলমল করছে। সেদেশে শিল্প উদ্যাক্তাদের কাছে জানতে পেরেছি, আবেদনের অনধিক ৭ দিনের মধ্যে তারা বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত ভাবে পেয়ে যান। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে স্থাপিত শিল্পগুলো লোডসেডিং এর আওতায় লোকসান গুণছে, নতুন শিল্পের ক্ষেত্রে এক বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া

অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। খালেদা-নিজামী গং দাবী করেছেন বাংলাদেশে নতুন নতুন শিল্প নাকি ঢাকা-সিলেট-চট্রগ্রাম-বগুড়া-খুলনা জনপথের দু'ধারে অহর্নিশি গড়ে উঠছে। বিদ্যুতের অলভ্যতা তাদের দাবীকে হয় পাগল না হয় শিশুর অবুঝ অর্থবিহীণ প্রলাপ কিংবা স্বভাবী মিথ্যুকের বেশরম প্রচারের নামান্তর করে ফেলেছে।

থাইল্যান্ডের নীতি নির্ধারক ও নির্বাহীদের সাথে কথা বলেছি, সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রকল্প বিষয়ক কাগজ পত্তর দেখেছি। তাদের কথা ও কাগজে তাদের সফলতার পেছনের কারণ গুলো স্পষ্ট হয়েছে। এক, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ানোর ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণীয় নীতির ভিত্তিঃ বিদ্যুতের বেলায় চাহিদার আগে সরবরাহ দিতে হবে, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সরবরাহই চাহিদা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ আগে শিল্প-কারখানা বাড়বে, সেচযন্ত্র স্থাপিত হবে, তারপরে বিদ্যুতের সরবরাহ দেয়া হবে, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এসূত্র অনুসরণ করা যায় না, এসূত্রে তারা বিশ্বাসী নন। বিদ্যুতের সরবরাহ চাহিদা সৃষ্ট হওয়ার আগে প্রদত্ত হলে চাহিদা অনুযায়ী তাৎক্ষণিক ভাবে বিদ্যুৎ লভ্য হয়। থাইল্যান্ডে বিদ্যুতের নিশ্চিত লভ্যতা এ ক্ষেত্রে শিল্প-কারখানা স্থাপন সম্ভব ও সহজ করে চাষি কর্তৃক সেচযন্ত্রাদি আহরণ লাভজনক করে রেখেছে, শহরে গ্রামে দেশের উৎপাদিত শস্য, ফল-ফলাদি ও অন্যান্য কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করণ ব্যক্তি-উদ্যমের অর্জনের স্বপ্নের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছে। ফলত অধিকতর উৎপাদনে ব্রতী হওয়া, উন্নয়নের পথে নিরন্তর সামনে এগ্রিয়ে যাওয়া, সমৃদ্ধির সঞ্জীবনী সর্বস্তরে বিস্তৃত করার জাতীয় প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ প্রধান ইহলৌকিক উপাদান হিসাবে কাজ করছে। দুই, চাহিদা দেখা দেয়ার আগে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করণের সূত্র অনুযায়ী থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সৃজন, সঞ্চালন ও বিতরণের মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে এসেছে। দেশের কোথায় কখন কোনো উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়ে কোথায় কিভাবে সঞ্চালন ও বিতরণ করা হবে তার জন্য মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে থাইল্যান্ড দক্ষিণ এশিয়ার সফল পরিকল্পক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন লাগসই অবস্থানে তেল, গ্যাস, কয়লা ও জল শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। সম্প্রতিময়ানমার ও থাইল্যান্ডের সীমান্তবর্তী নদী-উপনদীর বিভিন্ন লাগসই অবস্থানে এই কর্তৃপক্ষ ৫টি জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন

সমূহ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অবস্থান ও সময়ের সাথে সমন্বয় করে নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ক্ষেত্রে থাইল্যান্ডের নিপুণতা প্রতিভাত করেছে। তিন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে থাইল্যান্ড সরকার ও বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের নীতি ও কাজ স্বচ্ছ ও প্রায় দুর্নীতি বিহীন। দেশী ও আন্তর্জাতিক মুক্ত প্রতিযোগিতার সূত্র অনুসরণ করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন বা সরবরাহ করণের ডাক আহব্বান, পূর্ব নির্ধারিত ও ঘোষিত পদ্ধতি ও মান অনুযায়ী মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্তায়ন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ তত্ত্বাবধান বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে কমিশনবাজী তৎপরতাকে হয় একেবারে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, নয় যুক্তিসংগত মাত্রায় সীমিত রেখেছে। সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন স্থাপনে তেমনি টেন্ডারপত্র মূল্যায়নের স্বচ্ছ পদ্ধতি ও দেশে উপকরণাদির বিস্তৃত এবং ফলত প্রতিযোগী উৎপাদন ও সরবরাহ ক্ষমতা দুর্নীতিকে অর্থনৈতিক ভাবেই দূরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। থাইল্যান্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার প্রক্রিয়ায় সংযোগ স্থাপন সমাপনে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের একবার ভোজে ও ফল-ফলাদি সহকারে আপ্যায়িত করার রেওয়াজ আছে, কিন্তু এর বাইরে সংযোগ ঠেকিয়ে রেখে, মিথ্যা বিল দেখিয়ে কিংবা মিটার-তেলেসমাতির মারফতে জনগণকে শোষণের কোনো অপচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি। বাংলাদেশে দৃষ্ট ও কানসাটে প্রতিরোধকৃত বিতরণ প্রক্রিয়ার দুর্নীতি থাইল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলে শোনা যায়নি বলেই ব্যাংককের সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা বলেছেন।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে থাইল্যান্ডের এরূপ সফলতার বিপরীতে বাংলাদেশে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এক, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনো দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেই। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে প্রণীত ও বাস্তবায়িত পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার পর খালেদা-সাইফুরের সরকার ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়নি। এর বাইরে শেখ হাসিনার শাসনামলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গুলো এই সরকার অযৌক্তিক ঈর্ষা ও মিথ্যা দাম্ভিকতায় আসক্ত হয়ে স্থগিত করেছেন। ২০০১ এর অক্টোবর থেকে শুরু করে ২০০৫ এর শেষ পর্যন্ত দেশকে পরিকল্পনা বিহীন রেখে তারা এই বছরের জানুয়ারিতে তাদের তথাকথিত দারিদ্র বিমোচনীয় মৌল কৌশলপত্র প্রকাশ করেছেন। এই কৌশল পত্রে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে দারিদ্র বিমোচনীয় পদক্ষেপাদি যেমনি সনাক্ত করা হয়নি, তেমনি হয়নি উন্নয়ন ও শিল্পায়নের মৌল উপাদান হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ানোর বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে দিবানিশি বিপর্যয়ের পটে সাম্প্রতিক প্রতি মন্ত্রীত্ব পরিবর্তনের পরপরই জানান হয়েছে যে এই সরকার সংকট মোচনের লক্ষ্যে শেখ হাসিনার শাসনামলে প্রণীত ও গৃহীত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন করবেন। কিন্তু খালেদা-নিজামী সরকারের বাকী ৫ মাসে এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সুফল পৌঁছে দেয়ার কোনো সুযোগ এই সরকারের ৫ বছরে ধরে বিদ্যুৎ খাতে পরিকল্পনার অনুপস্থিতির অন্ধকার দূর করতে সক্ষম হবে না নিশ্চিত ভাবে বলা চলে। দুই, মেয়াদী পরিকল্পনার শৃংখলার বাইরে খালেদা-নিজামীর সরকার বিদ্যুৎ খাতে গোষ্ঠী ও ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার স্বার্থে (১) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহে কমিশন-বাজীর আওতায় সিদ্ধান্তায়ন প্রলম্বিত, (২) সমন্বয়ের সূত্র লংঘন করে উৎপাদন না বাড়িয়ে কেবল সরবরাহ ও বিতরণ লাইন বিস্তৃত এবং (৩) রক্ষণাবেক্ষণ কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিত্বের সূত্র পরিহার করে উপকরণ সমূহের বেশি দাম দেয়া ও গুণগত বৈশিষ্ট অবজ্ঞা করার কার্যক্রম গ্রহণ করে। ফলত উৎপাদন কেন্দ্র সমূহের সমকালীন ব্যয় মাত্রা বেড়ে যায়, সরবরাহ ও বিতরণ লাইন সমূহে বিনিয়োগের বিপরীতে ইপ্সিত ফিরতি আনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং রক্ষণাবেক্ষণে ত্রুটি, এমনকি সময়ান্তরিক বিপর্যয় দেখা দেয়। বিদিত হয়েছে যে ২০০১ এর অক্টোবর থেকে বিদ্যুৎ খাতে এই সরকার নাকি ১৪০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এই পরিমাণ বিনিয়োগ কোথায় কার উপযোগে প্রযুক্ত হয়েছে তা এই সরকার বলতে সমর্থ হয়নি। তিন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ করার ক্ষেত্রে মূলধন ব্যয়, গ্যাস ও তেলের মূল্য, বিদ্যুতের ট্যারিফ ও ট্যাক্স, হুইলিং চার্জ বা সঞ্চালন ব্যয় নির্ধারণ ও পরিবর্তনের জন্য এই সরকার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা পদ্ধতি উদ্ভাবন বা প্রয়োগ করেনি। ফলত এদেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে বিদ্যুতের মূল্যের কোনো সংগতি নেই, গ্যাসের দাম অপরিশোধিত থাকছে, বিভিন্ন সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদ্যুতের দাম শোধ করা যাচ্ছে না, ব্যবস্থাগত লোকসান বা সিস্টেম লস কমছে না। তিতাস গ্যাস কোম্পানির বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কাছে ৩০০ কোটি টাকা বকেয়া পড়েছে, সরকারের কাছে সারের মূল্যের উপর ভর্তুকী বাবদ কেমিক্যাল শিল্প করপোরেশনের ৪০০ কোটি টাকা অনাদায়ী রয়েছে। বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে যে দামে বিদ্যুৎ কেনা হচ্ছে সার্বিক ভাবে তার চেয়ে কম দামে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড তা বিক্রি করে ফতুর হচ্ছে, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বেতনাদি কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল থেকে উঠিয়ে মেটানো হচ্ছে। এতদ্বসত্ত্বেও এই সরকার জরুরি

প্রয়োজন মেটানোর মোড়কে ব্যক্তি স্বার্থে অধিকতর মূল্যে তেল ও গ্যাস চালিত বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছে। এই সকল অসংগতি জনস্বার্থিক ভাবে দূর করার কোনো সমন্বিত কার্যক্রম এই সরকারের আছে বলে দেখা যাচ্ছে না।

সম্প্রতি বিদ্যুৎ খাতের প্রতিমন্ত্রী পরিবর্তিত হয়েছে। নয়া প্রতিমন্ত্রী বিদ্যুৎ খাতের বিপর্যয় এই জুন মাসের মধ্যে দূর করার লম্বা কথা বলে নেতৃত্বের কুরশীতে এসেছেন। সাবেক প্রতিমন্ত্রী বিদ্যুৎ খাতের বিপর্যয় ও দুর্নীতির কেন্দ্র ও কারণ হিসাবে তার উপরের কর্তৃপক্ষ ও নেতৃত্বকে দোষারোপ করেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ্যে জাতির তরফ হবে প্রশ্ন করা হয়েছে ব্যর্থ এক প্রতিমন্ত্রী না থাকলে কি হয় (দ্রষ্টব্য, সংবাদ, মে ১, ২০০৬)? সরকারি দুর্নীতির রাহুগ্রাসে অতিষ্ঠ এবং বিদ্যুতের ঘন ঘন লোডশেডিং এ বিপর্যস্থ হয়ে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু দুর্নীতির রক্ত, আমজনতার প্রতিবাদ ও রোষানলের বহিঃপ্রকাশকে এখনও জলবৎ মনে করে স্বার্থের রক্তের ঘনত্বকে গুরুত্ব দিয়ে চলছে। থাইল্যান্ড বা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সফল দেশের উদাহরণ অনুসরণ করে দুর্নীতির রক্তের ঘনত্বের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে জনস্বার্থে বিদ্যুতকে উন্নয়নের মৌল উপাদান হিসাবে বিস্তৃত করার কোনো নিশানা দেখাতে এখনও অক্ষম এই সরকার। দুর্নীতি, গোষ্ঠীস্বার্থ ও অদক্ষতা কেমন করে কত গভীর ও বিস্তৃত ভাবে উন্নয়নকে পেছনে ঠেলে দিতে পারে তার উজ্জলতম উপাখ্যান হিসাবে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত এই সময় ঝলমল করে বিদ্যমান।

সম্প্রতি সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে দুর্নীতিকে বড় প্রতিবন্ধক হিসাবে এদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী স্বীকার করেছেন। এই স্বীকৃতির আলোকে থাইল্যান্ডের সফলতার প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে কর্মরত এক নির্বাহীকে বলেছিলাম, এক্ষেত্রে এদেশে পরিবর্তন আনার কোনো পরিকল্পনাই প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারছেন না আপনারা? উত্তরে স্মিত হেসে তিনি বললেন, পাকিস্তানের মুসলিম লীগ শাসনামলে এদেশে উন্নয়নের শ্লথগতির বিড়ম্বনায় স্কুল কলেজের ছাত্ররা গোষ্ঠীস্বার্থে স্ফীতোদর নেতৃত্বের পিছু পিছু চলার এক ছড়া বানিয়েছিলঃ কে যায়? পেট যায়। কার পেট? নওয়াব শাহ্‌র পেট। তিনি কোথায়? পেছনে আসছেন। বললেন, এই আমলের দুর্নীতিতে স্ফীতোদর বয়োশীর্ণ চলৎ শক্তিতে মুহ্যমান নেতৃত্বের ভারে বিপর্যস্থ আর্থিক সংস্কার ও পরিকল্পিত পরিবর্তনের সকল ক্ষেত্রে স্বীয় উদর পুর্তিকে সকল চলার

সামনে রেখে চলাইত নীতি। এখানে এই সময়ে আগে পেট না ভরালে পুরানো দেহ যে নড়েনা তাকি জানেন না আপনারা? জানেন না এই আমলের স্ফীতোদরদের খাই খাই এর পরিমাণ ও তাড়না আগের মুসলিম লীগ জমানার তুলনায় অনেক বেশি, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ছড়িয়ে বিস্তৃত। এই খাই খাই প্রত্যাশিত যায় যায় দিনকে যেই তিমিরে শুরু সেই তিমিরেই রেখে দিয়েছে। এখানে এই সময়ে আমাদের কি করণীয় আছে? কোনো জবাব দিতে পারিনি আমি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, জুন ৮, ২০০৬

বাজেট ২০০৬-২০০৭
দুঃশাসন ও দুর্নীতিতে কবলিত বাংলাদেশ

সাইফুর রহমান উত্থাপিত ২০০৬-'০৭ অর্থবৎসরের বাজেটকে জোট সরকারের আমলে সরকারি সম্পদ আহরণ ও ব্যয়ের সবচেয়ে বড় সমাহার বলে প্রকারন্তরে প্রচার করা হয়েছে। মনে হচ্ছে প্রচারে সাইফুরের অবস্থান প্রসার করার লক্ষ্যে কতিপয় লবিষ্টও নিযুক্তি পেয়েছেন। তারা ইনিয়ে বিনিয়ে ১২ বাজেটে পোড় খাওয়া সাইফুরকে সরকারের অর্থব্যবস্থাপনায় কৃতবিদ্যতম ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রকাশ ও পরিচিত করার নিরলস কোশেশ করতে এগিয়ে এসেছেন। এতদসত্ত্বেও ২০০৬-'০৭ অর্থবৎসরের বাজেটের অসংগতি ও অপূর্ণাঙ্গতাকে ঢেকে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। মূলত ৫টি মোটা দাগে এই অসংগতি ৬৯ হাজার ৭৪০ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেটের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে।

এক, দেশের সমকালীন অর্থব্যবস্থার বিপর্যস্ততার প্রধান দ্যোতক মূল্যস্ফীতিকে সামাল দেয়ার জন্য সাইফুর কোনো ফলপ্রসূ পদক্ষেপ এই বাজেটে নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। দেশে মূল্যস্ফীতি ঘটছে (১) রপ্তানী আয় ও বিদেশ থেকে শ্রমিক প্রেরীত অর্থ বৃদ্ধির বিপরীতে দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়াতে ব্যর্থতা, (২) দুর্নীতি, চাঁদাবাজী ও সন্ত্রাসের বলে মূলত ভোগবাদী অনুৎপাদনশীল লুটেরার কাছে সঞ্চয়ী ও অন্যান্য উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী থেকে অব্যাহত ভাবে আয় স্থানান্তর এবং (৩) সরকারি অর্থায়নে ক্রমাগত ঘাটতি ও অপচয়ের কারণে। ২০০৫-'০৬ অর্থবৎসরের এপ্রিল পর্যন্ত দেশের রপ্তানী হয়েছে প্রায় ৮.৪ বিলিয়ন ডলার। তেমনি বিদেশ থেকে শ্রমিক প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বার্ষিক ৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। রপ্তানী ও শ্রমিক প্রেরিত আয় আগামী অর্থবছরের এই মাত্রায় থাকবে বলে ধরে নেয়া যায়। রপ্তানী আয় দুই মাত্রায় মূল্যস্ফীতি মূলক রপ্তানী একই সাথে দেশের

অভ্যন্তরে আয় বাড়ায় এবং অন্যান্য লভ্য দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহ কমিয়ে দেয়। বিদেশ থেকে শ্রমিক প্রেরিত অর্থ ও দেশের অভ্যন্তরে ব্যয়যোগ্য আয়ের পরিমাণ বাড়ায়। লাগসই মাত্রা ও ভাবে দেশের সার্বিক চাহিদার সামঞ্জস্য বিধান করে এবং প্রাপ্ত অর্থের উৎপাদনশীল ও সুষ্ঠু বিনিয়োগ করে রপ্তানী আয় ও বিদেশ থেকে শ্রমিক প্রেরিত অর্থ প্রসৃত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। কিন্তু এই ধরণের ব্যবস্থাপনা সাইফুরীয় আর্থিক কার্যক্রমে ২০০১ এর অক্টোবর থেকে অনুপস্থিত রয়ে গেছে। এক হিসাবে দেখা গেছে যে ২০০১ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে এদেশের লুটেরা শাসক শ্রেণী দেশ থেকে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি অর্থাৎ গড়ে প্রতিবছর প্রায় ৪৮০০০ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। জন সম্পদ লুটের এই মাত্রা ও গতি জোট সরকারের এই শেষ বছরেও অব্যাহত রয়েছে। এই পরিমাণ অর্থ লুটেরাদের অনুপর্জিত আয় এবং সেজন্য তা মূলত বিলাস ব্যসন ও ভোগে প্রযুক্ত হচ্ছে। এই অর্থ অন্যথায় সঞ্চয়ী ও পরিশ্রমী জনগোষ্ঠী উৎপাদনশীল বিনিয়োগে প্রযুক্ত করতে পারতেন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অনুৎপাদনশীলতায় আসক্ত সরকারি গোষ্ঠীর এই পরিমাণ লুট বন্ধ বা সীমিত করা সাইফুরের অসাধ্য। মূল্যস্ফীতির কঠিন উপাদান হিসাবে এই অর্থ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। কর প্রাপ্তিতে ঘাটতি, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সমূহের ক্রমাগত লোকসান ও প্রশাসনিক রাজস্ব আদায়ে গাফিলতিতে সার্বিক রাজস্ব আদায়ের মাত্রা সাইফুরীয় ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্যমাত্রার পেছনে পড়ে আছে। এর বিপরীতে ক্রমাগত মাত্রায় রাজস্ব ব্যয়ে বাড়তি এবং লোক দেখানো ও গোষ্ঠী স্বার্থিক উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারি অর্থ ব্যয় ও অবমুক্তির সদর দরোজা খুলে দেয়া হিসাব-রক্ষক হিসাবেও সাইফুরের অদক্ষতা ও অপরিণামদর্শিতা ফুটিয়ে তুলেছে। সরকারি স্থাপনা সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের মোড়কে জনগণের অর্থের হরিলুট, সামাজিক ও নিরাপত্তাবাহিনীর জন্য কমিশন তাড়িত সাজ সরঞ্জাম ক্রয় রাজস্ব ব্যয়ের মাত্রা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে শতাধিক কোটি টাকা ব্যয় করে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন রাজস্ব ব্যয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাওয়ার পথে গোষ্ঠী স্বার্থের উপসর্গকে সকলের সামনে তুলে ধরেছে। উন্নয়ন খাতে সরকারদলীয় সাংসদদের অনুকূলে ভোটার ভুলানো উন্নয়ন কাজের জন্য থোক বরাদ্দ, বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার মোড়কে ভর্তুকী, সহায়তা ও মেরামতী ব্যয়, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের মোড়কে রাজনৈতিক কর্মীদের মোটা তাজা করণ,

ছাগল পালন-লালনে ও নারকেল গাছের রোপন বিস্তারে কোটি কোটি টাকার জিয়াফত, আওয়ামী লীগ আমলে প্রণীত ও অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের প্রলম্বিত বাস্তবায়নে ব্যয়াঙ্ক বাড়ানো এই সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় তুলে ধরেছে। এসব খাতে ব্যয়ের বিপরীতে লভ্য দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ ইপ্সিত মাত্রায় না বেড়ে মূল্যস্ফীতির চাপাকে অদমনীয় করে ফেলেছে। ফলত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় জোট সরকারের অথর্বতাকে এসব ভাস্মর করে তুলেছে।

দুই, ২০০৫ এর শেষ দিকে জোট সরকার দারিদ্র বিমোচনীয় মৌল কৌশল পত্র বা পিআরএসপি গ্রহণ করেছেন। শেখ হাসিনার শাসনামলে প্রণীত ও বাস্তবায়িত পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার পরে এই সরকার প্রত্যাশিত ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হননি। এই পটে ৪ বছরে পরিকল্পনার প্রত্যয়কে অবসরে রেখে এই সরকার দাতাদের চাপে দারিদ্র বিমোচনীয় মৌল কৌশলপত্র রচনা করে বলে এসেছে যে এর পর থেকে সরকারের সকল কার্যক্রম, বিশেষত বাজেট এই কৌশলপত্রে বিধৃত লক্ষ্য ও পদ্ধতি অনুগামী হবে। সাইফুর প্রদত্ত ২০০৬-'০৭ এর বাজেট বিশ্লেষণ করলে এ সহজেই প্রতিভাত হয় যে দারিদ্র বিমোচনীয় কৌশলপত্র অনুযায়ী এর আয়-ব্যয় বিন্যাশ করা হয়নি। কর কাঠামোর ৩ প্রধান উপকরণ, আমদানী শুল্ক, আয়কর ও মূল্য সংযোজন করের প্রকৃতি, হার বা বিস্তৃতি সনাতনী ধাচ বা রক্ষণশীলতা অতিক্রম করেনি। প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক রাজস্ব বা প্রাপ্তি সমূহের আরোপণ ও আহরণের বিস্তৃতি ও পদ্ধতি দরিদ্রের অনুকূলে সংস্কার করা হয়নি। জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল কর্তৃক গত ৩১ মে অনুমোদিত ২৬০০০ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সমূহে সার্বিক ভাবে দারিদ্র বিমোচন কিংবা উপশমক্ষম বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়েছে একথা এর প্রণেতারাও বলতে সক্ষম হবেন না। বরং গোষ্ঠী স্বার্থে প্রদত্ত থোক বরাদ্দ ও সুশাসন সম্পর্কিত প্রশ্নাদির মীমাংসা করণে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের নীরব অনুপস্থিতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিকে দারিদ্র বান্ধব ও কল্যাণকর কার্যক্রম হিসাবে অপরিচিতির আবরণে অস্পষ্ট, ক্লিষ্ট এবং ক্ষেত্র ও প্রকল্প বিশেষে ম্লান করে ফেলেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাইরে রাজস্ব বাজেটে ৩৬০০ কোটি টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম লুটপাট ও গোষ্ঠী স্বার্থে প্রযুক্তিয় গণ অর্থের সমাহার বলে প্রতিভাত। গণতন্ত্রায়ণ, স্থানীয় প্রশাসন শক্তিশালী করণ, অব্যাহত দুর্নীতি ও লুট বন্ধ করণের কোনো ফলপ্রসূ প্রস্তাব বা কার্যক্রম বাজেটে স্থান পায়নি।

তিন, প্রস্তাবিত বাজেটে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টা বা উদ্যমের আকার সীমিত। ২০০৬-'০৭ এর বাজেটে সরকারের রাজস্ব ব্যয় ৪২ হাজার ২৮৬ কোটি টাকা। সার্বিক বাজেট ব্যয়ের ৬৯ হাজার ৭৪০ কোটি টাকার মধ্যে রাজস্ব ব্যয়ের এই অংশ ৬০ ভাগেরও বেশি। এর বিপরীতে ২৬০০০ কোটি টাকা মাত্রার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ ৩৮% এর বেশি নয়। জোট আমলে প্রণীত ও অনুসৃত গত ৪ বছরের বাজেটের আকার ও গঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সরকার বাজেটে নির্ধারিত রাজস্ব ব্যয় সীমিত রাখতে এবং উন্নয়ন ব্যয় সর্বাংশে সংকুলান করতে পারেনি। রাজস্ব প্রাপ্তিতে ঘাটতি, ক্রমহ্রাসমান বিদেশী সহায়তা এবং প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার দুর্নীতি ও অপূর্ণাংগতার কারণে আগের বছর গুলোর মতো ২০০৬-'০৭ অর্থবৎসরেও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে গড়ে ১২.৫% ঘাটতি হবে এবং রাজস্ব ব্যয় না বাড়লেও কোনোমতে কমবে না ধরে নেয়া যায়। এবং এই হলে বছর শেষে সাইফুরীয় বাজেটের প্রায় ৬০% হবে রাজস্ব ব্যয় এবং বাকি ৩৫% হবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার (বাকী ৫% এডিপি বহির্ভুত উন্নয়ন ব্যয়, উদাহরণত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, কর্মসংস্থান সৃজন, অনেকাংশে সমকালীন ব্যয় বলে ধরে নেয়া যায়)। যদি দাতা-আরোপিত আর্থিক সংস্কারের শর্ত সমূহ অপূরিত থাকে তাহলে ২০০৬-'০৭ র্অবৎসরে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদানীয় যথাক্রমে দারিদ্র বিমোচনীয় প্রবৃদ্ধি সুবিধা (পিআরজিএফ) এবং উন্নয়ন সহায়ক ঋণ (ডিএমসি) এর বরাদ্দ (১৬০ + ২০০ মিলিয়ন ডলার) যথা সময়ে কিংবা পূর্ণ অংকে অবমুক্ত না হওয়ার আশংকা রয়েছে। তেমনি আশংকা রয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন করসমূহের প্রাপ্তিতে ১৮% বাড়তি অর্জনের লক্ষ্য অর্জনে অনিশ্চয়তা। বৎসরের শেষ ভাগে নতুন সরকারের দায়িত্ব হবে উন্নয়ন বাজেটের ক্রমহ্রাসমান আকার রাজস্ব বাজেটের আপেক্ষিকতায় বাড়িয়ে সাইফুর প্রবর্তিত বাজেটের ভোগমূলক প্রকৃতিতে পরিবর্তন। বছরের মাঝ ভাগে এই ধরণের পরিবর্তন আনয়ন সহজ হবে না।

চার, ২০০৬-'০৭ এর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে দেশের বিধ্বস্থ অবকাঠামো যথা বিদ্যুৎ, গ্যাস, বন্দর, রেল ও টেলিযোগাযোগ বিস্তার ও সংহত করণের ফলপ্রসূ কার্যক্রম স্থান পেয়েছে বলা চলে না। জোট সরকারের আমলের এই ৪ বছরে মেয়াদী পরিকল্পনার অনুপস্থিতি ও দুর্নীতির রাহু বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনকে যে স্থবিরতায় ঠেলে দিয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য

২০০৬-'০৭ অর্থবৎসরের উন্নয়ন প্রকল্প যে কোনো মানেই অপর্যাপ্ত। তেমনি গ্যাস উত্তোলন ও বিতরণ এবং বন্দর উন্নয়নের প্রস্তাবিত কার্যক্রম অস্পষ্ট ও অপূর্ণাঙ্গ। গ্যাসের উত্তোলন না বাড়িয়ে কমিশনতাড়িত হয়ে গ্যাস রপ্তানীর অপচেষ্টা এবং বন্দর ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অপর্যাপ্ততা এই সরকারের কপালে আরও দু'টি কলংক তিলক পরিয়েছে। রেলে বিনিয়োগ ত দূরের কথা, সম্পদের বিয়োজন ঘটেছে, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ডের কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে, বিশেষত বিদেশের সাথে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা পৃথিবীব্যাপি তথ্য প্রযুক্তির বিস্তারণের সাথে তাল রাখতে না পেরে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এসব ক্ষেত্রে অসংগতি দূর করে জাতীয় উদ্যোগের সহায়ক উপকরণ হিসাবে সংযুক্তি সাধন ২০০৬-'০৭ এর বাজেটে প্রস্তাবিত সরকারি কার্যক্রমে যথার্থ স্থান পেয়েছে একথা বলা যায় না।

পাঁচ, ব্যক্তি-উদ্যমকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মৌল চালিকা শক্তি হিসাবে প্রযুক্তকরণের লক্ষ্যে ঋণ ও সমমূলধন সহায়তা দিতে এই সরকার ব্যর্থ হয়েছে এবং এই ব্যর্থতা ঘুচানোর কোনো সময়বদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ২০০৬-'০৭ অর্থবৎসরের বাজেটে প্রতিভাত হয়নি। গত ৪ বছরে বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক ও ইনভেষ্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ ব্যক্তি উদ্যোগের অনুকূলে ব্যাপক সমমূলধনীয় সমর্থন দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষায়িত ব্যাঙ্ক, যথা শিল্প ব্যাঙ্ক, শিল্প ঋণ সংস্থা, কৃষি ব্যাঙ্ক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রয়াত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহ ব্যক্তি-উদ্যোগের অনুকূলে প্রত্যাশিত মাত্রায় ঋণ-সহায়তা দিতে সমর্থ হয়নি। এর বিকল্পে শেয়ার বাজার হতেও আশাকৃত মূলধন-সমর্থন ব্যক্তি উদ্যোগ গত ৪ বছরে লাভ করেছে বলা যায় না। রাষ্ট্রায়াত্ত্ব ব্যাঙ্কও আর্থিক ক্ষেত্র থেকে উৎসারিত সমমূলধন ও ঋণ সমর্থন সাইফুরীয় তত্ত্বাবধানে প্রধানত দলীয় বিবেচনায় অর্থনৈতিক সূত্র লংঘন করে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠীস্বার্থে প্রযুক্ত করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে যে সূত্র ধরে রাষ্ট্রীয় আর্থিক ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাপনা থেকে ঋণ ও আর্থিক সুবিধা দিয়ে রাজনৈতিক দল গড়া ও ভাংগার অপপ্রয়াস প্রযুক্ত হয়েছিল, জোট সরকারের শাসনামলে তা আরও বিস্তৃত করে অপপ্রয়োগ করা হয়েছে। এইসব অপপ্রচেষ্টা ও অর্থনৈতিক অপরাধ দূর বা সীমিত করার কোনো কার্যক্রম ২০০৬-'০৭ এর সরকারের প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমে স্থান পায়নি। একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করে রাষ্ট্রয়াত্ত্ব ব্যাঙ্ক ও আর্থিক

ক্ষেত্রে দলবাজীর ভয়াবহতা সনাক্ত করা সংগত হবে। ব্যাংক ব্যবস্থা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে দলবাজীর বাইরে ব্যক্তি-উদ্যোগকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিবেচনায় সমর্থন দিয়ে দেশব্যাপি শিল্পায়নের সহযোগী হওয়া পরবর্তী সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে সাইফুর রেখে গেছেন।

এই সময়ে দেশ দুঃশাসনে কবলিত। দেশে একটি উদ্যমী, সৃজনশীল ও বিনিয়োগ উন্মুখ শ্রেণী সৃষ্টি হওয়া ও অস্তিত্বমান থাকা সত্ত্বেও এই সাড়ে ৪ বছরের ব্যাপক আর্থিক অব্যবস্থাপনা, বিস্তৃত দুর্নীতি, জনসম্পদের নিরন্তর লুট, বেশরম গোষ্ঠীস্বার্থ বিস্তারণে তৎপরতা এবং মেয়াদী জনকল্যাণকর পরিকল্পনার অনুপস্থিতি দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে স্থবির করে ফেলেছে। সার্বিক দুঃশাসনে কবলিত দেশকে আর্থিক ও অর্থনৈতিক খাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো পথ বা পন্থা কিংবা কার্যক্রম ২০০৬-'০৭ অর্থবৎসরের বাজেটে সাইফুর প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বরং গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষা এবং দুর্নীতি ও জনসম্পদের নিরন্তর লুটকে অবজ্ঞা করে সাইফুর আর্থিক কার্যক্রমে তার দুর্মতিকে দুঃশাসনের সহযোগী মূলধন হিসাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থনৈতিক নিরক্ষরতা ও অর্থবতা তার কার্যক্রমে হিসাব-রক্ষকের ভাষায় দেশের কন্টিনজেন্ট লায়বিলিটি বা বিষয়ান্তরিক দায় হিসাবে তার হিসাবেই অন্তর্ভুক্ত ও খতিয়ানবদ্ধ হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২ বাজেটে পোড় খাওয়া হিসাব রক্ষক সাইফুর তার ১৩ এবং সম্ভবত শেষ বাজেটে দেশের কপাল পুড়িয়ে কোন হিসাবের সৃজনশীলতায় পরিচিতি রেখে যাবেন তা সাধারণ বোধগম্যতার বাইরে নয় বলেই প্রতিভাত হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, জুন ১১, ২০০৬

ডেট লাইন, ঢাকা, জুন ১১, ২০০৬
নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা

জুন ১১, ২০০৬ ছিল ১৪ দলের 'ঢাকা অবরোধ' দিবস। এই দিবসে ঢাকার প্রবেশ পথ আশুলিয়া ও টংগী সড়কের সংযোগ স্থলে সমাবেশে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মতিয়া চৌধুরী ও কাজী জাফরউল্লাহ্। সংগে ছিলেন আওয়ামী লীগের তরুণ সাংসদ সোহেল তাজ ও জাহিদ হাসান রাসেল, টংগী পৌরসভার চেয়ারম্যান এডভোকেট আজমত উল্লাহ্ খান ও অন্যরা। সাভার দিয়ে প্রবেশ পথের সমাবেশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। তার সাথে ছিলেন সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ ও অন্যরা। ঢাকা-মাওয়া সড়কের মুখে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ। তাদের সাথে অন্যদের মধ্যে ছিলেন সাবেক এমপি সাগুফতা এমিলি, মুন্সীগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমেদ ও সুকুমার ঘোষ। কাঁচপুরে চট্টগ্রাম-সিলেট থেকে ঢাকার প্রবেশ মুখে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আমার উপর। আমার সাথে ছিলেন সাবেক সেনা প্রধান ও মুক্তিযুদ্ধের প্রবীণতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ্, আওয়ামী লীগের জেলা সভাপতি এস এম আকরাম, মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভূইয়া, আবু নূর বাহাউল হক, এমদাদ ভূইয়া ও অন্যরা। এই চার প্রবেশ মুখে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের উপর পুলিশি নির্যাতনের তাণ্ডব এবং প্রতিরোধী জনতার ভূমিকা বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশতি হয়েছে (দ্রষ্টব্য, জনকণ্ঠ, ইত্তেফাক, যুগান্তর, সংবাদ, জুন ১২, ২০০৬)। দেশী ও বিদেশী ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় পৃথিবীব্যাপি প্রচারিত হয়েছে এসব সংবাদ। যেমনি প্রকাশিত হয়েছে মহানগরের ভেতরে মগবাজার, রাসেল স্কোয়ার, মতিঝিল,

লালবাগ ও বঙ্গবন্ধু এভিন্যুতে শান্তিপূর্ণ মিছিল ও সমাবেশের উপর পুলিশের নির্যাতন এবং বিএনপি-জামাত দলের ক্যাডারদের আক্রমণের বিবরণ ও ছবি। বিদিত হয়েছে হঠাৎ করে অবরোধকে বেআইনী কর্মকাণ্ড হিসাবে ঘোষণা করার আদালতের অবসরকালীন তৎপরতার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের প্রতিবাদ। এর সব কিছুর প্রতিফলন ঘটিয়ে দৈনিক সংবাদের ১২ জুনের শিরোনাম ছিলঃ 'অবরুদ্ধ ঢাকাঃ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ'। দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদ-শিরোনাম ছিল 'অবরুদ্ধ ঢাকা'। দৈনিক যুগান্তরের প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিলঃ অবরুদ্ধ ঢাকা ঃ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। সারাদেশে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে দৈনিক জনকণ্ঠ তাদের প্রতিবেদনের শিরোনাম দিয়েছিলঃ 'অবরুদ্ধ ঢাকা ঃ অবরুদ্ধ দেশ'।

ঢাকার চার পাশে ও ভেতরে সংবাদ মাধ্যমে বিদিত ঘটনাবলী এবং কাঁচপুরে নিজের চোখে দেখা পুলিশ ও জোট সরকারের ভাড়াটেদের তাণ্ডবের আলোকে জুন ১১ এর ঘটনাক্রমের কতিপয় কার্যকরণ সূত্র সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য বিবৃত করা যায়ঃ

এক, জুন ১১ এর সকালে এসব স্থানে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে শুনেছি এবং কয়েকজনের হাতে দেখেছি ১০ জুন, অবরোধ অবৈধ বলে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট রিট আবেদনকারী আবু বকর সিদ্দিকের সইকৃত নোট। এই নোট সংশ্লিষ্ট থানা থেকে সিলমোহর লাগিয়ে এসব নেতা কর্মীদের হাতে প্রস্তাবিত অবরোধ ঠেকানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টের কথিত নির্দেশ জারীর ৩-৭ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে দেয়া হয়েছে, কতিপয় স্থানে জোরে শোরে মাইকিং করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। রিট আবেদনকারী কোনো সরকারি কর্মকর্তা কিংবা কর্তৃপক্ষের প্রধান বা প্রতিনিধি নন। একজন বেসরকারি নাগরিক কর্তৃক দায়েরকৃত রিট মামলায় অর্জিত আদালতের কথিত আদেশ এত ক্ষিপ্রতার সাথে সরকারি খরচে পুলিশের মাধ্যমে পৌঁছান ও প্রচার করার ঘটনা এর আগে এই দেশে আগে ঘটেনি। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান সূত্র সংবলিত সংবিধানাধীন এই দেশে পূরো প্রক্রিয়াটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও পর্যায় এবং স্তর থেকে অক্রেস্ট্রেটেড করার অশুভ ও ঘৃণার্হ অপচেষ্টা হিসাবে আমাদের চোখে ধরা পড়েছে। কয়েকজন প্রবীণ পুলিশ কর্মকর্তা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে নতমুখে স্মিত হাসি ছাড়া অন্য কিছু উপহার দিতে পারেননি আমাদের। জিগগেস করেছি, সুপ্রিম কোর্টের কথিত আদেশে নগর অবরোধকে বেআইনী বলা

হয়েছে, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ কি বন্ধ করা হয়েছে? কোনো উত্তর দেননি তারা।

দুই, অবরোধ ঠেকানোর লক্ষ্যে সরকার ঢাকার বাইরে ৫টি বিভাগ থেকে ১৫ হাজারেরও বেশি পুলিশ-বিডিআর অফিসার, কনস্টেবল ও জোয়ান নিয়ে এসেছিল। এদের পরিবহন ও খাওয়া দাওয়া-বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে এবং সবচেয়ে বড়কথা, আইনানুগ কোনো ব্রিফিং সকল ক্ষেত্রে দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও ব্রিফিং বিপর্জিত সশস্ত্র পুলিশ ও অন্যসব নিরাপত্তাকর্মীরা ক্ষেত্র ও সময় বিশেষে উশৃংখল আচরণে ব্রতী হয়েছে। বিশেষত সম্প্রতি জোট সরকার কর্তৃক দলীয় ও আর্থিক বিবেচনায় নিয়োজিত ও স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুলিশ কনস্টেবল ও এএসআইদের মধ্যে বেপরোয়া উশৃংখলতা সকল নিরাপত্তা বাহিনীতে জোট সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত দলবাজির ভয়াবহতা সকলের সামনে ফুটিয়ে তুলেছে।

তিন, এদিন কতিপয় স্থানে পুলিশ, এমনকি অন্যসব নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা, বিএনপির ক্যাডারদের প্রতিরক্ষণ দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের উপর আক্রমণ করতে সুযোগ ও উৎসাহ দুইই দিয়েছে। কাঁচপুরে, লালবাগে, সাভারে এবং টংগিতে পুলিশের ছত্র-ছায়ায় এসব ভাড়াটেরা নিরস্ত্র ও শান্তিপ্রিয় প্রতিবাদকারীদের উপর হামলা চালিয়ে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সংবিধানে প্রদত্ত প্রজাতন্ত্রে কর্মরত কর্মচারীর মান, মর্যাদা ও কর্তৃত্বকে পরিহাস ও অবিশ্বাসের আবর্জনার স্তুপে ছুঁড়ে ফেলেছে। শোনা গেছে যে এসব ভাড়াটেদের নাকি 'হাওয়া ভবনে'র খোয়াবে পাওয়া দৌলতের লোভে ও লাভে লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল। অপরিণামদর্শী দুঃশাসনের লাগেজবাহীদের এহেন তাণ্ডব রাজনৈতিক ভাড়াটে গুণ্ডা ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনীর ভিন্নতাকে ঘৃণার ধুলোকাদায় মিশিয়ে দিয়েছে।

চার, পুলিশ, কনস্টেবল পর্যায়ে, মুক্তিযুদ্ধের প্রবীণতম সেক্টর কমান্ডার, বাংলাদেশের প্রথম সেনা প্রধান মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ্কে তার পরিচিতি পাওয়া ও জানা সত্ত্বেও লাগাম ছাড়া পশুর মতো আঘাত করেছে, ইট ছুঁড়ে তার নাক মুখ ক্ষতবিক্ষত করছে, দর দর করে রক্ত ঝরা অবস্থায় লাঠি দিয়ে বার বার তাকে পিটিয়েছে। যদ্দুর জানা গেছে, উপস্থিত পুলিশ বাহিনীর জোট সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক বিবেচনায় নিযুক্ত ও স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের পর পদায়িত ৩ জন পুলিশ সজ্ঞানে তার উপর এরূপ পাশবিক হামলা করেছে। এই হামলা মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতিকূলে পাকিমতাবলম্বী ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের হামলা এবং পেটোয়া পুলিশ দিয়ে

প্রজাতন্ত্রের সেনাবাহিনীর মর্যাদাহানির অপপদক্ষেপ হিসাবে সামরিক বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ অফিসার, সকল পদবীর সেনানী এবং জনগণ মনে করেছেন (দ্রষ্টব্য, দৈনিক জনকণ্ঠ ও যুগান্তর, জুন ১৩, ২০০৬)। তেমনি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম ও সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী সাইয়িদ, অন্যান্য নেতা ও আমার উপর পুলিশি হামলা প্রমাণ করেছে যে জোট সরকারের আমলে প্রযুক্ত পুলিশ বেপরোয়া, হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জিত, স্বল্পমাত্রায় প্রশিক্ষিত, জনস্বার্থ লংঘনকারী প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুপস্থিতিতে কোনোরকম পূর্ব হুশিয়ারী না দিয়ে লাঠিচার্জ ও গুলি চালনার মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেছে যে তারা সংশ্লিষ্ট আইন ও কানুনের তোয়াক্কা করে না, রাষ্ট্রের আইনশৃংখলা প্রয়োগকারী সার্ভিস সমূহ সুশীল প্রশাসনিক সূত্রের সম্পূর্ণ বাইরে চলে গেছে।

পাঁচ, বিএনপি-জামাত ভাড়াটে গুণ্ডা ও সরকারের পেটোয়া পুলিশ বাহিনীর হামলার সামনে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলের কর্মীরা তাদের নেতাদের সবসময় তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ধৈর্য ও সাহসের সাথে প্রতিরক্ষণ দিয়েছেন। ভাড়াটে গুণ্ডা ও পেটোয়া পুলিশ যখন বিভিন্ন স্থান ও সময়ে নির্বিচারে এবং ছেদবিহীন ভাবে ইট-পাটকেল, টিয়ার গ্যাস ও ছররাগুলি আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলের নেতাদের দিকে ছুড়ছিল, তখন কর্মীরা তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও সাহসিকতার সাথে তাদের ঘিরে রেখেছিলেন, নিজেরা ক্ষতবিক্ষত হয়েও নেতাদের অনুকূলে গড়ে তোলা মানব বেস্টনী ছেড়ে যাননি। এতে তাদের দল ও আদর্শের প্রতি অবিচল আনুগত্য প্রতিফলিত হয়েছে। এই ধরণের দৃঢ় সংকল্প ভিত্তিক আদর্শিক আনুগত্যের বিপরীতে পেটোয়া পুলিশ ও ভাড়াটে গুণ্ডাদের তৎপরতা কখনও জয়ী হওয়ার নয়। এ সত্য ভাড়াটে গুণ্ডা ও পেটোয়া পুলিশের নিয়ন্ত্রকরা এখনও অনুধাবন করেনি এবং করেনি বলেই তারা দেশকে ক্রমান্বয়ে প্রশাসনিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, দেশকে অপশাসন ও নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ছয়, দুঃশাসনে জর্জরিত প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী জনতার রোষে পুলিশ ও অন্যসব নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা কতিপয় স্থানে ভয় পেয়েছে, পালিয়ে গেছে। কাঁচপুরে ও মগবাজারে জনতার পাল্টা আক্রমণে পুলিশ পর্যুদস্থ হয়েছে। কাঁচপুরে মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ্ ও আমাকে আঘাত ও আহত করার পর প্রতিবাদী লাখো জনতা যখন দু'দিক থেকে পুলিশ ও বিডিআরকে ঘেরাও করেছিল তখন পুলিশকে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে। পালিয়ে যাওয়ার পথ ও সময় চেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে আমাদেরকে ফোনে ও ঘটনাস্থলে কাতর অনুনয় করতে হয়েছে। জনগণের

আশা-আকাঙ্খা ও স্বার্থের প্রতিকূলে দখলদার বাহিনীর মতো পুলিশ ও অন্যসব নিরাপত্তা কর্মীরা যে শক্তির মদমত্ততায় কখনি সফলতা অর্জন করতে পারে না, কাঁচপুরে সেদিন তাই প্রমাণিত হয়েছে। সারা দেশের লোক ঐদিনই ইলেক্ট্রনিক সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন পুলিশ রণে ভংগ দিয়ে কাঁচপুর থেকে পাশ্ববর্তী পাটকলের দেয়ালকে আশ্রয় করে কেমন করে জনতার রোষ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরস্ত্র অথচ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ জনতা পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলে অস্ত্র-হাত থাকা সত্ত্বেও পুলিশ যে কত নিরুপায় হয় কাঁচপুরে সেদিন তাই প্রমাণিত হয়েছে।

সাত, জোট সরকারের পুলিশ ও প্রশাসন সেদিন বিশ্বাস-যোগ্যতা হারিয়েছে, বিশ্বাস ঘাতকের ভূমিকায় নেমেছে। কাঁচপুরে পুলিশ ও বিডিআরকে নিরাপদে পালিয়ে যাওয়ার পথ ও সময় নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে দেয়া হলে তারা এর আগে নিরীহ জনগণের উপর গুলি, টিয়ার গ্যাস ও ইট-পাটকেল ছোড়া সত্ত্বেও নিরাপদে পালিয়ে যেতে পেরেছে। নিরাপদে পলায়ন শেষ হওয়ার ৪০ মিনিট পরে জনতার সংখ্যা কমে এলে পুলিশের আর্মড ব্যাটালিয়ন এর ২টি প্লাটুন কাঁচপুর ব্রিজের পশ্চিম দিক থেকে এসে অতর্কিতে নিরীহ জনগণের উপর হামলিয়ে পড়ে, গুলি ও টিয়ার গ্যাসে শতাধিক লোককে আহত করে অস্ত্রের বলে বীরদর্পে চলে যায়। সাভারেও সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে অনুরোধ করে কুয়েতের আমীরের জন্য জাতীয় স্মৃতি সৌধে যাওয়ার ও দর্শনের সুযোগ নেয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ। মোহাম্মদ নাসিম কুয়েতের আমীরের আসা, দর্শন ও যাওয়ার সময়ে সমবেত প্রতিবাদী জনতাকে স্মৃতি সৌধের সড়ক ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন। নির্বিঘ্নে কুয়েতের আমীরের স্মৃতিসৌধ দর্শন শেষ হওয়ার পর সেই পুলিশ বাহিনীই পেছন থেকে জনতার উপর হামলিয়ে পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে অসফল অপচেষ্টা চালায়। সেদিনের কাঁচপুর ও সাভারের এ দু'টি ঘটনা পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাস ঘাতক হিসাবে পরিচিতি প্রমাণ করে। এর পরে জনতার রোষ প্রশমিত, কিংবা আইনশৃংখলা রক্ষাকরণে এই সরকারের পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে কেউ বিশ্বাস করবে বা করতে চাইবে বলে মনে হয় না।

জুন ১১ এর ঢাকা অবরোধে কার্যক্রমে প্রতিফলিত জনতা, পুলিশ ও অন্যসব নিরাপত্তাবাহিনীর এই ৭ বৈশিষ্ট বাংলাদেশের সমকালীন দুঃশাসকরা সম্ভবত এখনও মনে রাখছে না। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের উত্তাপ যখন দুঃশাসকের বর্ম গলিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার দরোজায় পৌছে যাবে তখন

দুঃশাসকরা পালাবার পথ ধরবেন। ঢাকায় ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির সেই গণ অভ্যুত্থানের সময় তারা যেমনটি করেছিল তেমনটি করে জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাদেরকে পালাবার পথ ও সময় দিতে অনুনয় করবে। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয়, সকল নরাধম এই পথ ধরে নিজেদেরকে সবসময় রক্ষা করতে পারে না।

ঢাকার চার ধারে জুন ১১ এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের শেষে এক বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম আমি। ঐদিন ক'জন অসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীসহ মারেক মহাদেশ থেকে আগত এক সংবাদসেবী জানতে চেয়েছিলেন, ঢাকার সাথে দেশের সংযোগ বিছিন্ন করে কি প্রমাণ করতে চেয়েছেন প্রতিবাদীরা? বলেছি, প্রমাণের প্রতিপাদ্য ছিল দু'টি। এক, এই সময়ে দুঃশাসনের পীঠস্থান, রাজধানী ঢাকা। সারাদেশে দুঃশাসনের হাতিয়ার গুলো প্রযুক্ত হচ্ছে ঢাকা থেকে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুযায়ী। দেশ থেকে ঢাকাকে বিছিন্ন করে এ প্রমাণিত হয়েছে যে দুঃশাসনের হাতিয়ার প্রয়োগ বন্ধ করার সক্ষমতা দেশবাসীর আছে। গত শতাব্দীর ৩০ এর দশকে চৌড়িচরায় সুরক্ষিত থানায় অত্যাচারী শাসকদের পেটোয়া পুলিশকে যেমন মুক্তিকামী জনগণের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের রোষে প্রাণ হারাতে হয়েছিল তেমনি, এখুনি সংশোধিত না হলে জনতার রোষের আগুনে পুড়ে মরবে এরা। দুঃশাসনের ইতি এখুনি না ঘটলে, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধিত্ব সম্বলিত সরকার ও শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে দুঃশাসনের হোতারা দেশের সকল অঞ্চল থেকে বিছিন্ন ও নির্বাসিত হয়ে ইতিহাসের অমোঘ প্রক্রিয়ায় ঘৃণার আঁধারে নিমজ্জিত হবে সহসাই। দুই, দেশবাসী ঢাকা কেন্দ্রিক এই দুঃশাসনের অবসানে একযোগে ঐক্যবদ্ধ। কোনো অশুভ শক্তির চক্রান্ত কিংবা পেটোয়া বা ভাড়াটে বাহিনী প্রয়োগ গণতন্ত্র ও অধিকার প্রতিষ্ঠাকরণের লক্ষ্যে জনগণের জয়যাত্রাকে রুখতে সক্ষম হবে না। স্বাধীনতার চেতনাবোধকে দুঃশাসনের লাগেজবাহী নরাধমরা কোনো দিনই পেছনে ফেলতে কিংবা দাবিয়ে রাখতে পারবে না। বললাম, এ দু'টি সত্য এদেশের প্রেক্ষিতে প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল। কাঁচপুরে, ঢাকায় জুন ১১ এর ঘটনা তাই প্রমাণ করেছে। জিগগেস করেছি, তোমাদের ইতিহাসে বিপ্লবের সময়ে প্যারিস অবরুদ্ধ হয়েছিল কেন? নিজেই উত্তরে বলেছিলাম, তোমাদের মহাদেশে গত শতাব্দীর সেই মহাযুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ে জয়ী হয়েছিল সশস্ত্র-জাতীয়বাদ নয়, মানবতার দর্শন, তাকি তুমি জান না? মানবতা বিরোধী নাজি জাতীয়বাদের তাণ্ডব রুখতে এগিয়ে এসেছিল মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ

সেনানী, তারুণ্য, নতুন পৃথিবী গড়ায় উজ্জীবিত মানবিক শক্তি।

গত মে মাসের ১৯'এ সুইজারল্যান্ডের লুসার্ন লেকের পূর্ব দিকে সভ্যতার ইতিহাস উৎসারিত প্রশান্তিময় এক গ্রামে ছিলাম আমরা ক'জন। গত শতাব্দীর ৩০ এর দশকে এখানে ছিলেন জওহরলাল নেহেরু ও তার কন্যা ইন্দিরা। সেই শতাব্দীর ৩০ ও ৪০ দশকে নারকীয় নাজি শক্তির উত্থান ও পতন দেখেছিলেন সুইজারল্যান্ডের শান্তিবাদী মানবিক অধিকারে সমুজ্জল জনগণ। স্বর্গের ছবির মতো লুসার্ন লেকের তটরেখায় বসে শান্তি, সৌহার্দ, অধিকারের সৌম্য-সুস্থির পটে পৃথিবীব্যাপি দানবীয় শক্তির উত্থান-পতনের ইতিহাসের উপকরণ গুলো তুলে ধরে উপসংহার হিসাবে বলেছিলেন সেই ইতিহাসের উত্তরাধিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ এক শিক্ষকঃ এ কালের নিরাপত্তার দর্শন মানবাধিকার সম্বলিত সমাজ, শাসন ও দেশ। এই দর্শনের বাইরে কেবলমাত্র বেতন কিংবা মালে গাণিমতের লোভে সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে দুঃশাসন রক্ষায় নিরাপত্তা বাহিনীকে কোনো রাষ্ট্রই পেটোয়া বাহিনী হিসাবে ব্যবহার করতে পারে না। যে পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী আজ বাংলাদেশে দুঃশাসনের রক্ষক হয়ে জনরোষের সামনে দাঁড়িয়েছে, কাল সেকি দুঃশাসন স্থায়ী করার লক্ষ্যে, লুটেরা শাসকের লুটকৃত সম্পদ-রক্ষায় এগিয়ে আসবে, তার পরবর্তী প্রজন্মকে বাসের অযোগ্য সমাজ উত্তরাধিকার হিসাবে উপহার দিতে, সুশাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের দাবীদারদিগকে দমন করতে টিয়ার গ্যাস ও গুলি নিয়ে এগিয়ে যাবে? এই ৫ বছরে বাংলাদেশে যারা ব্যাঙ্ক কিনেছে, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মালিক হয়েছে, হাজার হাজার কোটি টাকা তছরুপ আর লুট করেছে, আইনের ফাঁকে কোটি কোটি কালো টাকাকে 'সাদা' করেছে, বেশরম মাত্রায় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি দখল করেছে তাদেরকে চিরায়ত ভাবে রক্ষা করবে কি এদেশের পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, নিরাপত্তাবাহিনী? বলেছিলেন তেমনি শেখ হাসিনা গত জুন ৭ এ ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ারর্স ইনষ্টিটিউটে বাংলার মানুষের অধিকার অর্জনের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৯৬ এ ঘোষিত সেই ৬ দফার স্মরণ-পটেঃ এখন সময় এসেছে প্রজাতন্ত্রে কর্মরত সকলের, প্রশাসন, পুলিশ, নিরাপত্তাবাহিনী, পেশাজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের উচ্চকন্ঠে বলার---তারা সন্ত্রাস, নির্যাতন, দুঃশাসন আর অব্যাহত লুটের পক্ষে থাকবেন না জনগণের কন্ঠ, স্বার্থ, সম্মান ও অধিকার রক্ষায় মানুষের ভূমিকায় অগ্রণী হবেন? জননেত্রীর এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার এই-ত-সময়। এই-ত-প্রতিফলিত করেছে ঢাকার জুন ১১ এর ঘটনাবলী।

দৈনিক জনকন্ঠ, জুন ১৮, ২০০৬

‘রেখো মা দাসেরে মনে.............’

সেদিন প্রথম আলোতে প্রকাশিত ছোট এক প্রতিবেদন দেখে চমকে উঠেছি। জুন ২৭, ২০০৬ এ শাসক রাজনৈতিক দল বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্মসচিব তারেক রহমানকে মেহেরপুর জেলা সীমান্তে জেলা প্রশাসক তালুকদার শামসুর রহমান ও পুলিশ সুপার এম এস রোকন উদ্দীন ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত করেছেন। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বা সম্মতিতে সেদিন জিয়া-পুত্র তারেকের সম্মানে ও তার সফর সফল করার লক্ষ্যে গাংনী উপজেলার স্কুল গুলোতে ক্লাস হয়নি (দ্রষ্টব্য, প্রথম আলো, জুন ২৮, ২০০৬)। তার পরদিন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিষ্টার আমীরুল ইসলামকে বলেছিলাম এই ঘটনার কথা। বলেছিলাম, সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে বিধৃত প্রজাতন্ত্রে কর্মরত কর্মচারী হিসাবে এদের অনুকূলে প্রদত্ত মর্যাদা ও গুরুত্বের যোগ্য দাবীদার কিংবা উত্তরাধিকারী কি এই ধরণের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আশ্চর্য হচ্ছেন? তারেকের সফর আরামদায়ক, নির্বিঘ্ন ও প্রোটকল সম্মত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সংবাদপত্রে বিদিত ফুলেল অভ্যর্থনার ২ দিন আগে বিভাগীয় কমিশনার ও ডিআইজি সরেজমিনে কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর ঘুরে গেছেন, প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের আজিজ মেহমানের জানপেহ্‌সান খেদমত করার ওয়াছিয়াত দিয়ে গেছেন। মনে এল, এরও মাস খানেক আগে বগুড়া জেলা পরিষদ থেকে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের আয়োজনে জেলার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি বিতরণ করে এসেছিলেন জিয়া-পুত্র তারেক। একই জেলায় বছর দুয়েক আগে জিয়া-পুত্রের সম্মানে এক কৃতবিদ্য পুলিশ সুপার জেলা প্রশাসককে সংশ্লিষ্ট করে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের থেকে জোর করে চাঁদা তুলে পুলিশ লাইনে এক বাহারি ইফতারের আয়োজন

করেছিলেন (দ্রষ্টব্য, এক ইফতারের কথা, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, দৈনিক জনকণ্ঠ, নভেম্বর ১১, ২০০৪)। ব্যারিষ্টার আমীরের সাথে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মরত এসব কর্মকর্তার আচরণ আলোচনার শেষে ৩০ জুন গিয়েছিলাম চাঁদপুরে, প্রয়াত বর্ষীয়ান নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর স্মরণসভায়। শুনলাম চাঁদপুর সার্কিট হাউসের সদর দরোজা বন্ধ। জিয়া-পুত্র তারেক জুলাই ৩-এ সেখানে তশরিফ আনবেন বলে বৃষ্টির মৌসুমেও সার্কিট হাউসে নতুন করে রং করা হচ্ছে, নতুন সাজে সাজানোর বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। সাধারণ নাগরিকের জন্য তাই বন্ধ করে রাখা হয়েছে সার্কিট হাউসের চৌহদ্দি। এমনকি আমার সাথে আসা সাংসদ ড. আব্দুর রাজ্জাকের জন্যও খোলা হয়নি সার্কিট হাউসের প্রশাসনিক হুকুম তাড়িত বেড়ী বন্ধন। পরে শুনেছি, জিয়া-পুত্রের জুলাই ৬-এ কচুয়া থানা সফরের সময়ে সকল স্কুল-মাদ্রাসা বন্ধ করে আগমনী পথসভায় যেতে মৌখিক ফরমান জারী হয়েছিল ছাত্র ও শিক্ষকদের উপর। গাংনীর পূর্ব দৃষ্টান্ত পদ্মা-যমুনার তীর ছাড়িয়ে অনুসরণীয় রীতি হিসাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল মেঘনার ওপারের কচুয়াতক।

জিয়া-পুত্র তারেক কোনো সরকারি পদে অধিষ্টিত নন। এখনও তিনি সাংসদ হননি। সরকারি পদে অধিষ্ঠিত কিংবা সাংসদ নন এমন কোনো রাজনীতিবিদকে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার যদি সংশ্লিষ্ট জেলার সীমান্তে ফুলেল অভ্যর্থনা জানান, তাহলে তারা নিজেদেরকে সেই রাজনৈতিক দলের তল্পীবাহক কিংবা সেবা দাস হিসাবে জনসাধারণের কাছে প্রতিভাত করেন। সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার রাজনৈতিক ভাবে নিরপেক্ষ থাকেন, দল, মত ও ধর্ম নির্বিশেষে পূর্ণাঙ্গ নিরপেক্ষতার সাথে প্রশাসন পরিচালনা করে থাকেন। এই প্রেক্ষিতে বৃটিশ আমল থেকে এই দেশের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এমনকি অন্যান্য রাষ্ট্রীয় বা সরকারি কর্মকর্তাগণ রাজনৈতিক দলের নেতা যদি প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী কিংবা স্পিকার বা এই জাতীয় পদে পদাসিন হন তাহলে তাদেরকে তারা রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে নয়, সংশ্লিষ্ট সরকারি বা রাষ্ট্রীয় পদে সমাসীন ব্যক্তি হিসাবেই অভ্যর্থনা দিয়ে এসেছেন। এমনকি প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রী যদি সংশ্লিষ্ট এলাকায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, উদাহরণত কর্মী-সভা বা জনসভায় অংশ নেন, তাহলে সেসব কর্মকাণ্ড বা সভা থেকে জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা নিজেদেরকে যত্ন সহকারে দূরে রেখে এসেছেন। সরকারি কর্মচারীদের আচরণ (আপীল ও শৃংখলা) বিধিতে তাই বলা রয়েছে। বঙ্গীয় পুলিশ প্রবিধিতে (নং-১০৬) সকল

পুলিশ অফিসারদের প্রতি একই অনুশাসন দেয়া হয়েছে। এই পটভূমিকায় নিঃসন্দেহে তারেককে মেহেরপুর সীমান্তে ফুলেল অভ্যর্থনা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এসব বিধি ও যুগ যুগ ধরে অনুসৃত নিরপেক্ষ প্রশাসনের রীতি লংঘন করেছেন।

এসব বিধি লংঘন করার ঘটনা বিবৃত করার সময় এও বলা প্রয়োজন, এই ফুলেল অভ্যর্থনা দেয়ার প্রক্রিয়ায় মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার যে সময় ব্যয় করেছেন, সরকার প্রদত্ত গাড়ি, গাড়ি-চালক, তেল-মবিল, দেহরক্ষী, প্রযুক্ত করেছেন তা জনস্বার্থে ব্যয় বা প্রযুক্ত করার তাদের কোনো বিধি সম্মত এমনকি নৈতিক অধিকার নেই। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার যে দু'টি ফুলের স্তবক (কথিত মূল্যঃ টাকা ৪৯০ + ৪৫০) জিয়া-পুত্র তারেককে দিয়েছিলেন ঐদিন, তা যথাক্রমে জেলা প্রশাসকের স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে সংগৃহীত তহবিল ও পুলিশ সুপারের অফিসের নৈমিত্তিক ব্যয়ের বরাদ্দ থেকে সংকুলান করা হয়েছিল। জেলা প্রশাসক তালুকদার শামসুর রহমান বা পুলিশ সুপার এম এস রোকন উদ্দীন এই দু'টি ফুলের স্তবক তাদের নিজের টাকায় কেনেননি। জনসাধারণ থেকে চাঁদা হিসাবে সংগৃহীত অর্থ (দৃশ্যত বেআইনী) এবং সরকারি বা বিভাগীয় নৈমিত্তিক কাজের বরাদ্দ থেকে এই ধরণের ব্যয় নির্বাহ করা নিঃসন্দেহে দুর্নীতি মূলক। যেমনি দুর্নীতি মূলক তারেক তুষ্টির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সকল স্কুল বন্ধ রেখে শিক্ষক-ছাত্রদের ব্যক্তি বিশেষের বন্দনায় জড়ো করা। গাংনী উপজেলায় ৩৬টি স্কুল (৩৬০ জন শিক্ষক, ১৪৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রী) এবং ৮৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (৩৩২ জন শিক্ষক + ২৪৯০০ জন ছাত্র-ছাত্রী)। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একদিনের শিক্ষকদের বেতন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় (টাকা ৬২০০০ + ৪৬০০০ = ১০৮০০০) যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জনগণের সম্পদে সংকুলান হয়, প্রশাসনিক ফরমান দিয়ে তা শিক্ষার বাইরে প্রযুক্ত করা নিশ্চিত ভাবে দুর্নীতির পরিচায়ক। দুর্নীতি ভিত্তিক অর্থে আজিজ মেহমানকে ফুলেল অভ্যর্থনা দেয়া যে প্রকৃত পক্ষে এরূপ মেহমানকে অপমান করা তা তারা হয়ত ভুলে গেছেন। কিংবা, যেমনটি ওয়াকেবহাল মহলের কেউ কেউ ভিন্নতর মত পোষণ করে বলেছেন, দুর্নীতির কৃতবিদ্যতার মইয়ের উপরে যার বা যাদের অবস্থান তার বা তাদের তুষ্টির নৈবেদ্যতো তার বা তাদের মন-কাড়া ও পথচলার দুর্নীতিজাত উপকরণ দিয়েই দাসানুদাসরা সাজাবেন। চৌর্যতন্ত্র কিংবা বদমাসতন্ত্রের (এই সরকারের শেষোক্ত বৈশিষ্টকরণের জন্য আমি কলামিষ্ট এ

জেড এম আবদুল আলীর কাছে কৃতজ্ঞ) এই জীর্ণ-ক্লিষ্ট সময়ের মহাজনরা যে পথে গেছেন বা যাচ্ছেন সেই পথ ধরে একই ধ্বজা ধরে না এগুলে দাসদেরকে কেনই বা মনে রাখা যাবে?

হাল-আমলে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার অপরাধ দমনে ও আইন-শৃংখলা রক্ষা করণের মোড়কে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করে আসছেন বলে সাধারণ ভাবে অভিযোগ উঠেছে। এর সম্মান জনক ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। তবে ওয়াকেবহাল মহলের ধারণা, এসব সম্মানীয় ব্যতিক্রমী রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এই সরকার নিযুক্তি, পদায়ন, পদোন্নয়ন, বদলী ও অপসারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা বিশেষত ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের মধ্যে সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার গুণাবলীকে তাদের জন্য বিষবৎ পরিত্যজ্য সূত্র হিসাবে সকল সন্দেহের উর্ধে সফলতার সাথে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পুলিশকে দিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের ও স্বীয়দলের নেতাকর্মীদের অপরাধ অবজ্ঞাকরণ কিংবা আমলে না নেয়া রাজনৈতিক গুডফাদার বা বাপেশ্বরদের তৎপরতার প্রধান বৈশিষ্টে পর্যবসিত হয়েছে (গডফাদারের এই বাংলা প্রতিরূপ শ্রদ্ধেয় নাট্যকার অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন এক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে শুনিয়েছিলেন আমায়)। গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু, তামিল ও প্রত্যাহার করা, অপরাধীদের জামিন দেয়া বা না দেয়া, সম্পত্তির দখল নেয়া বা দেয়া, সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও চাঁদাবাজিকে পোষণ করা ও প্রশ্রয় দেয়া, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের অনুগত আমলা গোষ্ঠী হিসাবে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসিকে কালিমা যুক্ত করেছে। গত সাড়ে ৪ বছরে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসির সহযোগিতা ও নিষ্ক্রিয়তাকে ভর করে এদেশে ৪০ হাজার ৬৫৮ জন নাগরিকের হত্যা, ৭৭ হাজার ৯৫০ জন নারী ও শিশুকন্যার ধর্ষণ, নির্যাতন ও অপহরণ, ১ লাখ ১০ হাজার সাজা প্রাপ্ত অপরাধী ও সন্ত্রাসী আসামীকে ছেড়ে দেয়া পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসিকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে জিয়া-পুত্র তারেককে জেলা সীমান্তে ফুল দিয়ে বরণ করে সকল জেলাবাসীর কাছে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার সার্বিক ভাবে জেলা প্রশাসন ও জেলাস্থিত পুলিশি তৎপরতাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের অনুপূরক প্রশাসন ও কর্মকাণ্ডে আবারও পর্যবসিত করেছেন, সকল নাগরিকের আইন অনুযায়ী প্রতিরক্ষণ ও অধিকার লাভ করার সাংবিধানিক নিশ্চয়তাকে জনগণের সামনে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে ধুলিস্মাৎ করেছেন। প্রজাতন্ত্রে কর্মরত কর্মচারীদের সার্বিক ভাবে জনগণ-মনে গ্রহণ

যোগ্যতার মর্যাদা থেকে তারা নিজেদেরকে রাজনৈতিক প্রভুর দাসের স্তরে নামিয়ে এনেছেন। শুধু নিজেদের নয়, সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এমনকি, তাদের স্ব স্ব সার্ভিসের সকল সদস্যদিগকে নিশ্চিত ভাবে তারা অপমান করেছেন। জনস্বার্থে তেজোদীপ্ত ভাবে কর্মতৎপর সর্বদা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মরত থাকার আদর্শ এবং প্রাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে এনে ভয়ংকরী অল্প বিদ্যার তেলেসমাতি এবং অপরিপক্ক অহংবোধে রোগাক্রান্ত রাজনৈতিক প্রভুত্বের কাছে নতজানু হয়ে 'রেখো মা দাসেরে মনে'র ভজন বা আকুতি সহ একান্ত পার্থিব প্রাপ্তির সিঁড়িতে পৌঁছে অধোবধিত হয়েছেন তারা। এইসব দাস ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থের সেবাদাস, জনসেবকের সেবার গৌরব থেকে পতিত ব্যক্তি-লালসার বিষ্ঠা সম প্রশাসনিক আবর্জনা ছাড়া অন্যকিছু নয়। সে জন্যই এই সময়ে খালেদা-নিজামীর দুর্বিনীত সরকার কর্তৃক এই সব সেবা দাসকে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে পদায়িত করে এই দেশে নির্বাচনের মোড়কে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা চিরায়ত করার পাঁয়তারা চলছে।

মেহেরপুরের এই ঘটনা ও বিষয়টি আলোচনা করেছি কয়েক'জন জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সাথে। মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের এরূপ দাস সুলভ আচরণে লজ্জাবোধ করেছেন তারা। তথাপি প্রকারান্তরে বলতে চেয়েছেন তারা, দেশের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার এই সার্বিক বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে তাদের অনেকেই নাচার। রাজনৈতিক প্রভু ও বাপেশ্বররা পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে এই চৌর্য ও বদমাশতন্ত্রে এই নাকি আশা করে আসছেন। এই ক্ষেত্রে আশাহত হলে তারা ক্ষ্যাপা ষাড়ের মতো যত্রতত্র শিং উচিয়ে তেড়ে আসেন। মনে এল, আজ-কালকার, এসব খ্যাপা ষাঁড়দের তুলনায় পাকিস্তান আমলের বহু নিন্দিত প্রাদেশিক লাট মোনেম খাঁর আচরণের কথা। ১৯৬৮ সালে বৃহত্তর রাজশাহীতে জেলা প্রশাসক ছিলেন খন্দকার আসাদুজ্জামান। আমি ছিলাম তখনকার নওগাঁ মহাকুমার প্রশাসক। তখনকার গভর্ণর মোনেম নওগাঁর মান্দাতে দলীয় জনসভা করতে এসেছিলেন এক বিকেলে। জেলা প্রশাসক আসাদুজ্জামান ও আমি মোনেমকে সভার ভেতরে পৌঁছে দিয়ে চৌহদ্দির বাইরে বসেছিলাম। হাব-ভাবে বুঝেছিলাম আমরা সভাস্থলে গেলে বা তার সাথে সভা মঞ্চে বসলে মোনেম খুশি হতেন, কিন্তু তাকে খুশি করার পথ ধরে আমরা প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার সূত্র দূরে সরিয়ে দেইনি। দৃঢ় অথচ ভদ্র ভাবে বলেছিলাম তাকে, নিরপেক্ষ প্রশাসনিক সূত্রের

বাইরে আমরা যেতে পারি না। মোনেম বুঝেছিলেন। বোঝাতে পেরেছিলাম। এখনকার মোনেম অনুসারীরা কি এ বুঝেন, কিংবা তাদেরকে এসব সূত্র বোঝানোর চেষ্টা এই আমলের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপাররা কি করে থাকেন? এখনকার মোনেমরা কি বহু নিন্দিত তখনকার মোনেমদের চেয়েও নিকৃষ্টতর হয়ে গেছেন?

প্রতিবেশী ভারতে প্রায় ১৩০০০ হাজার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার বিদ্যমান। উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ ও ভারতে মৌলিক ফৌজদারি কর্মপদ্ধতি সংহিতা ও পুলিশ প্রবিধি মূলত এক। গত নির্বাচনের প্রাক্কালে উত্তর প্রদেশের কোনো এক জেলায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপাই এক নির্বাচনী সভায় এক রাতে ভাষণ দিচ্ছিলেন। রাত ১০টা বাজার সাথে সাথে সভা থেকে দূরে বসে থাকা জেলা শাসক পুলিশ সুপারকে নিয়ে বাজপাইর পেছনে এসে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, স্যর এখন রাত ১০টা, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচনী সভা বন্ধ করতে হবে। প্রধান মন্ত্রী বাজপাই সাথে সাথে বক্তব্য অসমাপ্ত রেখে নির্বাচনী সভা ছেড়ে চলে এসেছিলেন। জনসেবক হিসাবে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার তাদের ভূমিকাকে নিরপেক্ষতার সফলতার গৌরব এমনি ভাবেই দিয়েছিলেন সেদেশে। ভারতের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের প্রতিভূরা জেলা শাসকের এরূপ আচরণকে প্রশংসা করেছিলেন। একথা কি এদেশের মেহেরপুরের এখনকার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার শুনেছেন? সারা বাংলাদেশ ব্যাপি পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসির সক্রিয় সহযোগিতায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কর্মপদ্ধতি সংহিতার ১৪৪ ধারার অপপ্রয়োগ, মিথ্যা মামলা সাজানো ও দায়ের করা আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের সন্ত্রাস-ধর্ষণ-চাঁদাবাজি অবজ্ঞা করার যে মচ্ছব চলছে তার কালিমা কলংকিত পটে মনে রেখেছেন কি তারা যে ভারতের দিল্লীতে ১৯৭৭ সালের ৪ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধীকে যখন তৎকালীন প্রতিহিংসা পরায়ণ জনতা সরকার এক তেল কোম্পানির অনুকূলে প্রদত্ত তথাকথিত অপেক্ষাকৃত উচু দরের ঠিকাকে ঘিরে সাজানো মামলায় দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করেছিল তখন ঐ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের তেজোদীপ্ত নিরপেক্ষতার সূত্র সমুজ্জল রেখে অভিযোগটিকে সারবত্তাবিহীন ঘোষণা করে তাকে নিঃশর্তে মুক্তি দিয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য, Katherine Frank, Indira, The Life of Indira Nehru Gandhi, হার্পার কলিন্স, ২০০১, ১৮ পরিচ্ছেদ)। ভারতের তৎকালীন

প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ভারতের অসংখ্য মাজিষ্ট্রেটের মাঝে একজন দিল্লীর ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুক্ত শ্রদ্ধায় রাজনৈতিক প্রভূত্বের সেবাদাস নয়, জনগণের সেবক হিসাবেই পরোক্ষ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, জনগণ জনসেবক হিসাবেই তাকে মনে রেখেছিলেন।

দেশের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব প্রাপ্ত ও কর্মরত সকল জনসেবককে এই প্রেক্ষিতে মনে রাখতে হবে, তারা জনগণের সেবক, ব্যক্তি-বিশেষের দাস কিংবা বাসা বাড়ির নওকর নয়। জনসেবার মাধ্যমেই জনগণের দাস হিসাবে দেশ তাদেরকে মনে রাখবে, মাতৃসম দেশ থেকে ভিন্নতর কোনো মানবরূপী বা তার উত্তরাধিকারী কিংবা অনুসরনকারী তাদের মা সম্বোধন শুনেও মনে গেঁথে নেবে না। যে কবির কথা অনুরণন করে এই কথাগুলো লিখেছি তিনিও দেশকেই মা বলে মনে করে দেশের প্রতি মমতা ও প্রেমের অর্ঘে নিজকে জন্মভূমির সেবকের স্মৃতিতে অম্লান করতে জীবনভর আকুতি জানিয়ে গেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, জুলাই ১৩, ২০০৬

প্রাথমিক শিক্ষার কথা : জোট সরকারের নীতি ভ্রষ্টতা

১৯৭২ সালের কথা। বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছেন স্বাধীন বাংলায়। পুর্নবাসন ও পুর্নগঠনের কাজ চারদিকে। সম্পদের অপ্রতুলতা দাবিয়ে দেয়নি আমাদের চেষ্টার নিরবধিতা। আমি তখন অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (উন্নয়ন)। সেই সুবাদে আর্থিক সংশ্লেষ সম্বলিত সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রায় সকল সভায় উপস্থিত থাকি। আজকের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণাগার সুগন্ধা তখন গণভবন, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কার্যালয়। বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসাবে উন্নীত ও বিস্তৃত করতে শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভা ডেকেছেন। শুরুতেই বললেন, সারা দেশে বিনা বেতনে সকল শিশুকে একই মানের শিক্ষা দিতে হবে, সমাজে সকলের বেড়ে উঠার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রায় ১৯০০০ তখনকার দিনে, জাতীয়করণ করতে হবে। কি ভাবে, কত ব্যয়ে? বল তোমরা। শিক্ষা মন্ত্রী ইউসুফ চমকে উঠলেন, এতটা আশা তিনিও করেননি। পারবেন কিনা ভাবলেন হয়ত। বললেন, জেলা বোর্ড থেকে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের রেকর্ডপত্তর এনে এখন থেকে এগুলোকে সরকার থেকে প্রশাসিত করা কঠিন কাজ, সময় লাগবে, তিন বছরে পর্যায়ক্রমে করলে সুষ্ঠুতর হবে। অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন থমকে গেলেন যেন। বললেন, চারদিকে অর্থের টানাটানি, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের বিশাল চাপ রয়েছে। কল কারখানা সব চালু হয়নি। কৃষি পুনর্বাসনে বিরাট উদ্যোগ প্রয়োজন। কর আদায় কম। বিদেশী সহায়তার প্রতিশ্রুতি তেমন নেই। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বারে ১০ গুণ অর্থের সমাহার, প্রায় ৪০ কোটি টাকা, এক বছরের বাজেটে সংকুলান করা কঠিন। বললেন এদিক ওদিক চেয়ে, হয়ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের রক্ষণশীলতার ঐতিহ্য অনুসরণ করে, পাঁচ বছরে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়কৃত হলে আর্থিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ

থেকে ভালো হবে, পাঁচশালা পরিকল্পনার আওতায় কার্যক্রম সুবিন্যস্ত করা সুবিধাজনক হবে। বঙ্গবন্ধু তার বেতের গদীবিহীন চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, পাইপটি হাতে নিয়ে তার টেবিলের পেছনে পায়চারী করলেন মিনিট তিনেক। তারপর বললেন, দেশের সকল মানুষের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সমান সুযোগ না দিলে সম-সমাজ গড়া যাবে না, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়া যাবে না, জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠবে না। স্বাধীন দেশে এ যদি আমরা না বুঝি, না করি তাহলে কি জন্য এই স্বাধীনতা? তাজউদ্দীন, ইউসুফ, আর তোমরা সরকারি অফিসাররা, শোন, কাল থেকে এই দেশে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়কৃত হবে, সকল শিক্ষকদের বেতন সরকার দেবে, ছাত্রদের বেতন লাগবে না, সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকার বানাবে। শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষাকে, সাক্ষরতাকে, নাগরিক অধিকার হিসাবে বিবেচনা করতে হবে, ছড়িয়ে দিতে হবে সবখানে। এ আমাদের, আওয়ামী লীগের, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের দায়িত্ব তোমাদের। আর দেরী না করে তাই করো। কাল যেন জাতীয়করণের প্রজ্ঞাপন ইস্যু হয়। সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করায় তার দৃঢ়তা ও সামাজিক সমতার প্রতি আনুগত্যবোধ এবং সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ বঙ্গবন্ধুর এই কথার অনুরণন করে পুরো গণভবনময় ছড়িয়ে গেল। প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়কৃত হলো, তার প্রতীতি অনুযায়ী সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মৌল নীতি হিসাবে সারাদেশে একই মানের সর্বজনীন ও বেতন বিহীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তৃতকরণের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রন্থিত হলো। বঙ্গবন্ধু ছাড়া ঐ সময়ে এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই ধরণের সাহসিক সিদ্ধান্ত অন্য কেউ দিতে পারতেন না। দেশের সকল শিশুর সমভাবে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনার স্বপ্নে অনাবিল হাসির দ্যোতক হিসাবে তাই ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস, হাজার ফুল ফোটানোর ব্রতে সকলের শপথ নেয়ার মহালগ্ন।

বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে নাগরিক অধিকার ও সামাজিক সমতা স্থাপনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার এবং জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ স্থাপনের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার স্রোতের উৎস হলো প্রাথমিক শিক্ষা। হাল আমলে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ কোটি ৮৪ লক্ষ। এর মধ্যে ৪০% প্রাথমিক শিক্ষাচক্র পার হয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হয়। আর্থিক অসংগতি ও যথার্থ মেধা প্রদর্শন না করতে পেরে বাকী ৬০% প্রাথমিক পর্যায়েই তাদের শিক্ষা শেষ করে। এরা চাষ কাজে,

শিল্প ও কৃত্যক ক্ষেত্রে শ্রমিক হিসাবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে। প্রযুক্তি-উম্মুখ চাষি, সহজে প্রশিক্ষণীয় শ্রমিক ও ছোট ব্যবসায়ী হিসাবে সফলতার মই বেয়ে উঠার পথে এবং এমনকি নিপুণতর ঘরকান্নার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে প্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা তাদেরকে তুলনামূলক ভাবে অধিকতর উৎপাদনশীল নাগরিকের ভূমিকা দেয়। সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণে প্রাথমিক শিক্ষা মৌল হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন ও প্রগতির অনুকূলে সাংস্কৃতিক বাতাবরণ প্রসারিত করে। সমাজ উদ্যম অনুকূল হয়, ঝুঁকি গ্রহণ করে সার্বিক বিনিয়োগ বাড়াতে সাধারণ লোকজন এগিয়ে আসে। অর্থনীতিবিদরা হিসাব করে দেখিয়েছেন, অন্যান্য পর্যায়ের শিক্ষার তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিনিয়োগ ২ থেকে ৩ গুণ বেশি ফিরতি দেয়। সেজন্যই আজকের সকল উন্নত দেশে সাক্ষরতা তথা প্রাথমিক শিক্ষা ৯৮% এরও বেশি, প্রায় সর্বজনীন। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিংগাপুর ও মালয়েশিয়ায় অর্থনৈতিক বিকাশের বিশ্লেষনে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি ও অবদান জ্বলজ্বলে তথ্য হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সংবিধানে গৃহীত 'স্বাধীন সত্বায় সমৃদ্ধি' (দ্রষ্টব্য, সংবিধানের প্রস্তাবনা) অর্জনের নিরবধি সংগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়ন মৌলতম উপকরণ হিসাবে বিবেচ্য।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৭২ সালে বিদ্যমান সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোগে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭২-'৭৩) গৃহীত সূত্র অনুযায়ী স্থানীয় প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ইমারতের লাগসইত্ব ও ছাত্র-সংখ্যার বিবেচনায় এসব ক্রমান্বয়ে জাতীয়করণের পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯৭৫ এর ১৫ অগাষ্ট বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর এসব বিদ্যালয়ের জাতীয়করণের প্রক্রিয়া স্তিমিত হয়ে যায়। স্বৈরশাসক কর্তৃক স্বৈরশাসনের মেয়াদ বাড়ানোর অপচেষ্টায় সকল উন্নয়ন মূলক উদ্যোগের সাথে প্রাথমিক শিক্ষাসহ দৃশ্যনীয় ও তাৎপর্য মূলক সার্বিক উন্নয়নের চেষ্টা ঝিমিয়ে পড়ে। ১৯৯০ এ দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭২৪১টি। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৭৬৫৫ বা প্রায় ৮০%। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২১ লক্ষ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলোর প্রায় ৮০% ছিল কাঁচা ও অপর্যাপ্ত। বেসরকারি

প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনগুলোর অবস্থা ছিল আরও খারাপ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ছিল সরকারি ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর চেয়ে নিম্নতর। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোনো বেতন স্কেল কিংবা নির্ধারিত স্কেলে সরকার থেকে সহায়কী দেয়ার ব্যবস্থা ছিল অনুপস্থিত। শাসক দল এক্ষেত্রে তাদের অপারগতা ঢাকতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা না বাড়িয়ে অসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিওদের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দেয়, শিক্ষকদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বেতনক্রমে তথাকথিত কমিউনিটি ও সেটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলে। এসব বিদ্যালয়ের বিভিন্নতা সংবিধানে বিধৃত একই মানের প্রাথমিক শিক্ষার সূত্র অনুসরণে ব্যত্যয় সৃষ্টি করে।

এই পটে ১৯৯০-এ এরশাদের শাসনামলে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতা মূলক) আইন ১৯৯০ প্রণীত হয়। এই আইন সত্ত্বেও (১) সকল গ্রামে (৮৮০০০) ও মহল্লায় (৫৮০) প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ না থাকায়, (২) পার্বত্য এলাকা ও উপকূলীয় অঞ্চলে যোগাযোগের অপ্রতুলতা হেতু, (৩) সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের মধ্যে বেতন ও পারিতোষকাদির ব্যবধান থাকায় এবং (৪) সাধারণ ভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ সমূহের অপূর্ণাঙ্গতা বা অসম্পূর্ণতার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা ইপ্সিত হারে বিস্তৃত ও উন্নত হতে পারেনি। বিশেষত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে কর্মরত শিক্ষকদের যথা প্রয়োজন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করায় এবং সরকার কর্তৃক বেতনাদি না দেয়ার কারণে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি ও গুণগত উৎকর্ষের উন্নয়ন ব্যহত হয়। সংবিধান ও আইন অনুযায়ী ৬-১০ বয়োবর্গের সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যতা, শিক্ষার মানের সাংবিধানিক অভিন্নতা ও অবৈতনিকতার মুখে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এক বিব্রতকর ও স্ববিরোধী পরিস্থিতির শিকার হয়ে দাঁড়ান। (১) পড়তে হবে, পড়াতে হবে অথচ সকল স্থানে বিদ্যালয় নেই, (২) বেসরকারি বিদ্যালয়ে সরকার শিক্ষকদের বেতন দেবে না, অথচ শিক্ষা অবৈতনিক হবে, (৩) শিক্ষকদের বেতন হবে না, প্রশিক্ষণ হবে না, অথচ একই মানের শিক্ষা দিতে হবে এই ৩টি পরস্পর বিরোধী অনুসরণীয় সূত্র বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে এই সময়ে অনেকাংশে হাস্যকর, অবহেলিত ও অকার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে পরিচিতি দেয়।

১৯৯৫-এ দেশে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৭৭১০ এবং ২২১৮৪ (দ্রষ্টব্য, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা,

পরিচ্ছেদ ২০)। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বিএনপি সরকারের শাসনামলে মাত্র ৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়কৃত হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনগুলোর উন্নয়ন, সকল শিক্ষকদের বেতনাদিতে অসংগতি দূরকরণ, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বাড়ানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে তখনকার সরকার কোনো সমন্বিত কার্যক্রম অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়নে এত বিস্তৃত অনীহা এই উপমহাদেশে অন্যকোনো সময়ে অন্যকোন দেশে দৃষ্ট হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে যথা প্রয়োজন অবকাঠামো বিস্তৃতকরণে এই সময় সরকার দৃশ্যনীয় কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

১৯৯১ সালে এরশাদের পতনের পর তখনকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতায় নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের বেতন বাবদ সরকার থেকে শিক্ষক প্রতি মাসিক ৫০০ টাকা সহায়কী দেয়ার জন্য বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। তখনকার শিক্ষা উপদেষ্টা জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসাবে ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম আমি। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের অনুকূলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কথা উপস্থিত সবাইকে স্মরণ করিয়ে বলেছিলাম বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ক্রমান্বয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমপর্যায়ে তুলে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আমাদেরকে সংবিধানে বিধৃত শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার মৌলনীতি হিসাবে অবৈতনিক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং এই লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থের সংস্থান করতে হবে। বলেছিলাম সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত পেলে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অর্থ মন্ত্রণালয় এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান করবে। তখনকার অর্থ উপদেষ্টা কফিল উদ্দীন মাহমুদ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসাবে আমার এই অবস্থান সমর্থন ও অনুমোদন করেছিলেন। এই অনুমোদনের মোড়কে অবশ্য অসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, কম্যুনিটি ও স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ স্থান পায়নি। ১৯৯১ থেকে '৯৫ পর্যন্ত এই অনুমোদনের সূত্র অনুযায়ী নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন শুধুমাত্র প্রান্তিক মাত্রায় বাড়ানো হয়।

শেখ হাসিনার শাসনামলে, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বহমান অসংগতি সমূহ দূর করার সমন্বিত কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় প্রতিটি গ্রামে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়

স্থাপন, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উৎসাহিত করা, দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পাকা ইমারতে উন্নীত করণ, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ও কিন্ডার গার্টেন সহ অন্যান্য সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই মানের পাঠ্যসূচি প্রবর্তন, প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বিস্তৃত ও দ্রুততর করা, দরিদ্র শিশুদের জন্য উপবৃত্তি ও খাদ্য সহায়কী বিস্তারণ এবং ধাপে ধাপে যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের বেতনাদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমপর্যায়ে তুলে আনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কম্যুনিটি ও স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের অবকাঠামো মূলক সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর কাজও হাতে নেয়া হয়। ২০০২ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির গ্রস হার ১১০% এ উন্নীত করণ এবং শিক্ষাচক্র থেকে ঝরে পড়ার হার কমিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার হার নুন্যপক্ষে ৭৫% উন্নীত করণের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়। মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের নিযুক্তি হবে এবং নিযুক্তদের মধ্যে ৭০% মহিলা হবেন বলে স্থিরীকৃত হয় (দ্রষ্টব্য, পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭-২০০২, পরিচ্ছেদ ২০)। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহকে ক্রমান্বয়ে জাতীয়কণের লক্ষ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পাকা করা, শিক্ষকদের যথার্থ প্রশিক্ষণ বিস্তৃত করণের সাথে পর্যায়ক্রমে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনাদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সম পর্যায়ে আনার সমন্বিত কার্যক্রম শেখ হাসিনার সরকার গ্রহণ করে। তখনকার শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার স্তর নীতিগত ভাবে নির্ধারণ করে অন্তবর্তীকালীন সময়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতা ও ঐ শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মানে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফলত (১) ধাপে ধাপে সংশোধন করে ২০০১ সালের মে মাসে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনাদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনাদির প্রায় ৯০% এ উন্নীত হয়, (২) দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (৩৭৬৭১) সাথে সকল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের (১৯৭৩০) পাকা করণ সম্পন্ন হয়, (৩) সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথার্থ মানের শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা হয়, (৪) ৫৪ টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণালয়ে সর্বমোট ১০৯৭১০ জন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, (৫) সকল শিশু কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করার লক্ষ্যে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তি প্রসারিত হয়, এবং (৬) সকল সরকারি ও বেসরকারি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর জন্য উন্নততর পাঠক্রম অনুযায়ী রচিত ও মুদ্রিত পাঠ্য বই বিনামূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়নে এই সময় সরকার মোট ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন করে। এর মধ্যে (১) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার (ব্যয় ৭৭৬ কোটি টাকা), (২) রেজিষ্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (ব্যয় ৯৫৮ কোটি টাকা), (৩) ঢাকা-রাজশাহী-খুলনা বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন (ব্যয় ৮৭১ কোটি টাকা), এবং (৪) চট্রগ্রাম-সিলেট-বরিশাল বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন (ব্যয় ৮৭০ কোটি টাকা) শীর্ষক ৪টি প্রকল্প সরকারের নিজস্ব সম্পদে সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অবকাঠামোর অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও প্রসারণ সমাপ্ত করে (দ্রষ্টব্য, পরিকল্পনা কমিশন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০০০-২০০১, পৃষ্ঠা-২৬৩)। ফলত প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ভর্তির গ্রস হার ১৯৯০ এর ৭২% থেকে ২০০১ এর শুরুতে ৯৬% এ উন্নীত হয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসরণ করে দেশের সাক্ষরতার হার ১৯৯৫ এর ৫৮% থেকে ৬৫% এ উঠিয়ে শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকগুষ্ঠিকে প্রযুক্তি ও প্রবৃদ্ধি উন্মুখ সমাজের মাঝের কাতারে পরিচিতি দেয়।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার শাসনামলের ক্রমান্নতি পরের জোট সরকার ধরে রাখতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য জোট সরকার প্রায় ৫৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক, ১৩৯৭ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ২১৬ জন প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। ওয়াকেবহাল মহলের মতে প্রতিটি নিযুক্তির ক্ষেত্রে এই সরকারের কুশীলবরা পদ প্রতি ১ লক্ষ টাকা উপরি নিয়ে মেধাকে অবজ্ঞা করে গোষ্ঠীস্বার্থে আগামী ২৫ থেকে ৩০ বছরের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলুষিত করে রাখার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছে। তথাকথিত শিশু কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১ম থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত মাসিক ৫০ টাকা এবং ৪র্থ থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের মাসিক ৬০ টাকা এবং পোষাকাদির জন্য ফি বছর ২০০ থেকে ২৫০ টাকা হারে প্রাপ্তব্য সহায়কীর সিংহভাগ লোপাট করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর বাইরে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক ১০০ থেকে ১২৫ টাকা উপবৃত্তি দেয়ার কার্যক্রমে এই সরকারের দুর্নীতির তাণ্ডব প্রাথমিক শিক্ষাচক্র থেকে শিশুদের ঝরে পড়ার হার কমাতে সক্ষম হয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন মেরামত ও প্রসারণে (সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বাবদ ১৮১

কোটি এবং রেজিষ্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বাবদ ৩৫৬ কোটি টাকা) তেমনি ব্যাপক দুর্নীতি অবকাঠামো মূলক উন্নয়নকে স্তিমিত করে ফেলেছে। ২০০৪ সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসন ও পুননির্মাণ প্রকল্পের (ব্যয় ২৫৪৮ কোটি টাকা) আওতায় প্রায় ৫০% বরাদ্দ লোপাট করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদানীয় সহায়কী বেসরকারি বৃত্তে তথা ২৪৭০৬ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৫৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর অনুকূলে প্রসারিত করা হয়নি। এর বাইরে দুঃখজনক ভাবে পাঠ্য পুস্তকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্যাদির বিকৃতি ঘটিয়ে শাসক দল কোমলমতি শিশুদের বেপথগামী করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। একই সাথে পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণে দুর্নীতি ঢুকিয়ে প্রান্তজনদের জন্য পাঠ্য পুস্তক দুস্প্রাপ্য কিংবা মূল্যের বিপরীতে প্রাপ্য পণ্যে রুপান্তরিত করেছে। ২০০১ সালে নির্বাচনের আগে আজকের শাসকদলের ম্যানিফেস্টোতে জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও ২০০১ থেকে এখন পর্যন্ত খালেদার সরকার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও পারিতোষকাদি কেবলমাত্র প্রান্তিক মাত্রায় বাড়িয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনাদি অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় গ্রহণীয় হারে ও পর্যায়ে বাড়ানো হয়নি। দেশব্যাপি দুর্নীতি ও লুটতরাজ সৃষ্ট মুল্যস্ফীতির পটে এই প্রান্তিক মাত্রার বৃদ্ধি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের যথা প্রয়োজনীয় বেতনাদি আদায়ের জন্য আন্দোলন ও ধর্মঘটে যেতে বাধ্য করেছে। এই প্রক্রিয়ায় সরকারের পুলিশ ও পেটোয়া বাহিনী শিক্ষকদের নিগৃহীত করতেও দ্বিধা বোধ করেনি। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার সরকারের আমলে প্রবর্তিত ও অনুসৃত নীতি এবং কার্যক্রম ২০০১ এর অক্টোবর থেকে অব্যবস্থা ও দুর্নীতির তাণ্ডব দিয়ে এ সরকার সার্বিক ভাবে শিক্ষাকে অকার্যকর করে মানব সম্পদ উন্নয়নে কেবলমাত্র সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যম হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের উন্নয়নের সহায়কী ভূমিকা থেকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে।

সমকালে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭৬৭১ টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৪৩৫৮টি। দৃশ্যত ২০০১ এর পরে এ পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়েনি। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে ১৯৮৫৩টি নিবন্ধনকৃত, বাকী ৪৫০৫ টি অনিবন্ধনকৃত বা অস্বীকৃত। এর বাইরে রয়েছে কম্যুউনিটি ও স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতত্ত্বাবধায়িত প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম। রয়েছে বিভিন্ন অসরকারি প্রতিষ্ঠান

পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন মানের শিক্ষাক্রম। এখনও এসব বিদ্যালয়ের বাইরে এবতেদায়ী মাদ্রাসার আওতায় ভিন্নতর পাঠক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া প্রায় ১৭ লক্ষ ছেলে-মেয়েরা মাধ্যমিক পর্যায়ের ৫৬২৬টি দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষাস্রোতে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। হাল আমলে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ১ কোটি ৫৮ লক্ষ, যার প্রায় ৪৯% বালিকা। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ১ লক্ষ ৬২ হাজার, যার মধ্যে প্রায় ৩৮% মহিলা। গড়ে ৫২ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এই সময়ে প্রাথমিক পর্যায়ে ১ জন শিক্ষক নিযুক্ত। ২০০৫-'০৬ অর্থৎসরে প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়েছিল প্রায় ৩৮১৯ (উন্নয়ন ২১২৪ + অনুন্নয়ন ১৬৯৫) কোটি টাকা। ২০০৬-'০৭ এর বাজেটে প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৪৭২৩ (অনুন্নয়ন ২৪৬০ + উন্নয়ন ২২৬৩) কোটি টাকা। চলছে উন্নয়নের মোড়কে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটের কার্যক্রম। অব্যাহত রয়েছে নিয়োগ বাণিজ্য, বদলী করে বদলী ঠেকিয়ে সন্তোষের সন্দেশ আদায়ের অব্যাহত কুটিল প্রক্রিয়া।

হাল আমলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে কতিপয় মারাত্মক অসংগতি বিদ্যমান। এক, প্রয়োজনের নিরিখে পার্বত্য ও উপকূলীয় এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় অপ্রতুল। তেমনি অপ্রতুল সুনামগঞ্জ (সাক্ষরতার হার ৩৩.৮%), নেত্রকোনা (সাক্ষরতার হার ৩২.২%), শেরপুর (সাক্ষরতার হার ৩১.২%), জামালপুর (সাক্ষরতার হার ৩১%) ও বান্দরবনে (সাক্ষরতার হার ২৮%)। সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে অবস্থান নির্ণয় বা অনুমোদনে এদিকে নজর দেয়া হচ্ছে না। দুই, প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সমন্বিত ও বিন্যস্ত করে একই মানের প্রাথমিক শিক্ষার সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি পালন করার কোনো কার্যক্ষম পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। এর বাইরে গোষ্ঠীগত স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্যাদি বিকৃত ও বিভ্রান্ত করে পাঠ্য পুস্তক রচনা করে কোমলমতি শিশুদের বিপথগামী করার অপচেষ্টা চালান হচ্ছে। তিন, সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসাবে নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ জাতীয় করণ করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে যে পদক্ষেপ গুলো শেখ হাসিনার শাসনামলে নেয়া হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ করা এই সরকারের কর্তব্য। গত নির্বাচনের প্রাক্কালে জোট ভুক্ত বিএনপি প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই প্রতিশ্রুতি পালন থেকে তারা এখনও দূরে সরে রয়েছে। তদুপরি শিক্ষকদের দাবী ও আন্দোলনের মুখে তারা চরম দমন নীতি গ্রহণ করেছে। ২০০৬-'০৭ বছরের বাজেটে এসব শিক্ষকদের

বেতনাদি বাড়ানোর লক্ষে ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রয়োজনের নিরিখে এ অতি সামান্য। যে সরকারের প্রধানমন্ত্রী দু'টি সরকারি বাড়ি বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও তাকে সরকার কর্তৃক দানকৃত বাড়িতে বসবাস বাবদ বিরাট অঙ্কের বাসা ভাড়া ও সাজ সজ্জার খরচ ভোগ করেন, যে সরকার সংসদ ভবনের মাঠের ঘাস কাটা বাবদ কোটি টাকা ব্যয়ে কার্পণ্য করে না, যে সময়ে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের আর্থিক নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অমান্য করে নতুন করে ভোটার তালিকা তৈরীর মোড়কে ৭০ কোটি টাকা অপব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, সে সরকার সংবিধানের মৌল নীতি অনুযায়ী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যায় সংগত দাবী না মেনে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে আসছে। তেমনি অসংবেদনশীলতার মনোবৃত্তি প্রতিফলিত হয়েছে কম্যুনিটি ও স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় বেতনাদি দিতে অস্বীকৃতির মধ্যে। চার, প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক নিযুক্তিতে, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে যে দুর্নীতি এই পাঁচ বছরে ঢোকান হয়েছে তা দৃঢ় হাতে দমন করা প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক নিযুক্তিতে এই সরকারের কুশীলবরা এককালীন কমসেকম ৬০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে হিসাব করা হয়েছে। এর বাইরে উপবৃত্তি সহায়কী ও উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে দুর্নীতির তাণ্ডবে বাৎসরিক ৫০০ কোটি টাকা লোপাটের হিসাব ত রয়েছেই। এবং পাঁচ, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণকরণের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে যে সব প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোও একই সাথে দুর্নীতি মুক্ত করা প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রস ও নিট ভর্তি বাড়ানোর লক্ষে সমন্বিত ভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন। এসব কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে (১) অবকাঠামো বিশেষত সড়ক যোগাযোগ বাড়ানো, (২) বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার প্রসার, (৩) খাদ্য-পুষ্টি ও অর্থ সহায়কী কার্যক্রমের বিস্তৃতি (দ্রষ্টব্য, অনিল দিওলালিকার, Human Development Strategy to Achieve MDGs in Sadiq Ahmed (ed.), Transforming Bangladesh into a Middle Income Economy, Macmillan, 2005)। এসব ক্ষেত্রে সমন্বিত কার্যক্রম জোট সরকারের কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় এমনকি, দারিদ্র বিমোচনীয় মৌল কৌশল পত্রে প্রতিফলিত হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জোট সরকারের সমন্বয় বিহীন তেলেসমাতি নীতি ভ্রষ্টতা এবং অব্যাহত মাত্রায় ব্যাপক দুর্নীতি জাতি গড়ার উপকরণ হিসাবে শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং অনুকূল সাংস্কৃতিক বাতাবরণ হিসাবে শিক্ষায় প্রোজ্জ্বল

জনগোষ্ঠীর বিস্তৃতিকে ব্যাহত ও সীমিত করে ফেলেছে। ১৯৭২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্মুখ, জ্ঞান ভিত্তিক, সম-বিকাশের সুযোগ সম্বলিত সমাজ গড়ার স্বপ্নের ক্যানভাস জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন, জোট সরকারের অকর্মণ্যতা, কুপমণ্ডুকতা, দুর্নীতি ও নীতি ভ্রষ্টতা তা বিবর্ণ স্তিমিতায় ও বিষণ্ন অর্থবতায় ঢেকে দিয়েছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে শেখ হাসিনার শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষার যথার্থ উন্নয়নের মাধ্যমে যে অমিত সম্ভাবনার দরোজা খুলতে এগিয়ে এসেছিলাম আমরা, তা এখনকার জোট সরকারের দলীয় স্বার্থ ও লালসা প্রায় বন্ধ করে ফেলেছে। আন্দোলন ও অনশনরত প্রাথমিক শিক্ষক, শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত অমিত সম্ভাবনার শিশু এবং স্বাধীন সত্ত্বায় সমৃদ্ধি অর্জন অভিলাষী জাতির কাছে এই বিশাল সর্বনাশের জন্য এর হোতাদের একদিন না একদিন জবাব দিতে হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, জুলাই ২৯, ৩০ ও ৩১, ২০০৬

বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার : জাতির বিক্ষত বিবেক

সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যা সংঘটিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাষ্ট ভোর ৪টা থেকে ৫টার দিকে। এই হত্যাকাণ্ডের উপর এজাহার ঢাকা নগরীর ধানমণ্ডি থানায় ২ অক্টোবর '৯৬ সালে দায়ের করেন বঙ্গবন্ধুর বাসস্থানে '৭৫ সালের ১৪ ও ১৫ অগাষ্ট তারিখে কর্মরত তার ব্যক্তিগত সহকারী আ ফ ম মুহিতুল ইসলাম। এর আগে '৯৬ এর ২৩ জুন দেশে ঐ সালের ১২ জুনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ভিত্তিতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজ জীবনের নিরাপত্তার বিষয়ে শঙ্কা ও নানাবিধ 'প্রতিকূল অবস্থার' কারণে এই এজাহার দিতে বিলম্ব হয় বলে মুহিতুল ইসলাম এজাহারের শেষাংশে উল্লেখ করেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রধান ছিল '৭৫ সালের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ। বঙ্গবন্ধুর হত্যার ৪১ দিন পর '৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বেআইনী ভাবে দেশের প্রেসিডেন্টের পদ দখলকার খন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক জারীকৃত এই অধ্যাদেশে একই সালের ১৫ অগাষ্টে 'সরকার পরিবর্তন' করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ও কৃত 'সকল কর্ম ও পদক্ষেপকে' যে কোনো অপরাধ থেকে দায়মুক্ত রাখা হয়েছিল। '৯৬ সালের দায়মুক্তি (প্রত্যাহার) আইন (আইন নং ২১) দিয়ে সংসদ '৭৫ সালের সেই কালো দায়মুক্তি অধ্যাদেশ রহিত করে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের দায় নির্ধারণ, বিচার করণ ও শাস্তি প্রদানের দৃশ্যত আইনী প্রতিবন্ধকতা দূর করে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর যে বৈরী জান্তা ও গোষ্ঠী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ছিল তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তার হত্যার বিষয়ে কোনো এজাহার সংশ্লিষ্ট থানায় আইনানুগ ভাবে গ্রন্থিত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আসছিল। বঙ্গবন্ধুর ৪ প্রধান সহযোগীকে জেলে অন্তরীণাবস্থায় খুন করিয়ে, হন্তক সেনাবাহিনীর সদস্যদের বাংলাদেশের বিদেশী মিশনে কূটনৈতিক নিরাপত্তা ও মর্যাদার মোড়কে নিযুক্ত করে, বঙ্গবন্ধুকে যে

ভবনে খুন করা হয়েছিল তা সরকারি দখলে রেখে, তার সহকর্মী ও সহযোগীদের জেলে ঢুকিয়ে কিংবা তাদের প্রতিকূলে রাজনৈতিক ও আর্থিক ভাবে নির্যাতন মূলক পদক্ষেপ নিয়ে অবৈধ ভাবে ক্ষমতা দখলকারী স্বৈরতান্ত্রিক জান্তা ঐ সময়ে তার হত্যার বিষয়ে এজাহার দেয়া ও বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করা অসম্ভব করে রেখেছিল। স্বৈরশাসক এরশাদের সময়ে এই হত্যার অন্যতম নায়ক কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও নেমেছিল। ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে একই কর্নেল ফারুক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনাকে ইচ্ছা করলে ৫ মিনিটে খুন করার সক্ষমতা তার আছে বলে জনসম্মুখে ঘোষণাও করেছিল। হত্যার ক্ষেত্রে খুনীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বাদী হয়ে মামলা চালনার বিধান ও দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও '৯০-এ স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের পতনের পর খালেদার নেতৃত্বে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিএনপি সরকার এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত বা বিচারকরণ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে এজাহার দেয়ার আগে '৯৬ এর ১৩ অগাষ্ট রাতে হত্যাকাণ্ডের অন্যতম মূল আসামী লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমানকে তার ঢাকা ক্যান্টনমেন্টস্থ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। আরেক মূল আসামী কর্নেল খন্দকার রশীদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশের গাফিলতির কারণে অগাষ্টের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা বিমান বন্দর দিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। কর্নেল রশীদকে '৭৫ পরবর্তী সামরিক জান্তা লিবিয়ায় বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক রপ্তানীর ব্যবসা ও নির্মাণ ঠিকাদারীতে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে। বঙ্গবন্ধুর খুনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিদেশে বাংলাদেশের মিশন সমূহ নিযুক্ত ১২ জন সেনা অফিসার তাদের নিযুক্ত পদ ও স্থান থেকে '৯৬ এর জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে জুলাইর দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে আত্মগোপণ করে। লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান ছাড়া দেশে অবস্থিত লেঃ কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খানকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিষয়ে এজাহার দায়েরের আগে '৯৬ এর অগাষ্ট ১৩-এ গ্রেফতার করা হয়। এজাহার দায়েরের পর লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিন (আর্টিলারি) ২ নভেম্বর ('৯৬) ও আনারারি ক্যাপ্টেন আব্দুল ওহাব জোয়ারদার (আর্টিলারি) ২০ অক্টোবর ('৯৬) পুলিশের জালে ধরা পরে। সাবেক মন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুরকে গ্রেফতার করা হয় '৯৬ এর অক্টোবর ৩-এ। বঙ্গবন্ধুকে খুন করার রাত পর্যন্ত সেনাবাহিনীর এসব অফিসারগণ এক পদবী নিচে নিযুক্ত ছিল। বঙ্গবন্ধুকে খুন করার পর প্রাথমিক পুরস্কার হিসাবে

তাদের এক ধাপের উচুতর পদবীতে উন্নীত করা হয়। পদোন্নয়নের স্বাভাবিক সময়ের আগেই ক্যাপ্টেন হয় মেজর, মেজরকে করা হয় লেঃ কর্নেল।

এজাহারে বিবৃত অপরাধ সমূহের ঘটনাদির বিস্তারিত তদন্ত সম্পূর্ণ করে সিআইডি পুলিশের সহকারী সুপার আব্দুল কাহার আকন্দ '৯৭ এর ১৫ জানুয়ারি অভিযোগ পত্র বা চার্জশিট আদালতে দাখিল করেন। অনধিক ৩ মাসের মধ্যে বিস্তারিত তদন্ত শেষ করে সহকারী পুলিশ সুপার আব্দুল কাহার আখন্দ প্রশংসনীয় মাত্রায় নিষ্ঠা, সততা ও নির্ভিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। অভিযোগ পত্রে আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০খ (রাষ্ট্রদ্রোহ), ৩০২ (হত্যা), ১৪৯ (বেআইনী সমাবেশ), ৩৪ (সাধারণ অপরাধ মূলক লক্ষ্য অর্জনে সামষ্টিক তৎপরতা), ২০৯ (আদালতে মিথ্যা দাবী করা), ৩৮০ (বাসগৃহে চুরি) এবং ১০৯ (অপরাধে সহযোগিতা) ধারায় বর্ণিত অপরাধের জন্য দায় বিধৃত করা হয়। তদন্তের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাক্ষ্য প্রমাণাদি না পাওয়ায় অভিযোগ পত্রে ৩ জন আসামী, নামত নায়েক মোঃ ইউনুস আলী, ক্যাপ্টেন নুরুল হুদা ও মোঃ আবু মুসা মজুমদারকে অপরাধের দায় হতে অব্যাহতি দেয়া হয়। ইতোমধ্যে মৃত হওয়ার কারণে ৩ জন, নামত খন্দকার মোশতাক আহমদ, মাহবুব আলম চাষি ও রিসালদার সৈয়দ সারোয়ার হোসেনকে কৃত হত্যার সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও বিচারে সোপর্দ করা যায়নি। তদন্তে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে মূল রাজনৈতিক সন্দীপক ও পোষক হিসাবে খন্দকার মোশতাক আহমদ ও তার সাতিশয় ইচ্ছুক সহায়তাকারী হিসাবে মাহবুব আলম চাষি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রিসালদার সরোয়ার হোসেনের ভূমিকা ছিল সংঘটিত হত্যার সাথে প্রান্তিক সংশ্লিষ্টতার। অভিযোগ পত্রে এদের বাইরে ২০ জনকে সুনির্দিষ্ট অপরাধের জন্য বিচারে সোপর্দ করা হয়। এরা হলো (১) লেঃ কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশীদ, (২) মেজর মোঃ বজলুল হুদা, (৩) লেঃ কর্নেল নুর চৌধুরী, (৪) লেঃ কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, (৫) লেঃ কর্নেল মোঃ আজিজ পাশা, (৬) লেঃ কর্নেল রাশেদ চৌধুরী, (৭) মেজর এ কে এম মহিউদ্দিন আহমদ, (৮) রিসালদার মোসলেহ উদ্দিন, (৯) মেজর আহম্মদ শরফুল হোসেন, (১০) ক্যাপ্টেন কিসমত হাশেম, (১১) ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার, (১২) ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ, (১৩) দফাদার মারফত আলী শাহ্, (১৪) মোঃ আব্দুল হাসেম, (১৫) লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, (১৬) লেঃ কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, (১৭) লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিন আহমদ (আর্টিলারি), (১৮) অনারারী ক্যাপ্টেন

আব্দুল ওহাব জোয়ারদার, (১৯) জোবায়দা রশীদ এবং (২০) প্রাক্তন তথ্য মন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর। এদের মধ্যে পরে সুপ্রিম কোর্ট (হাই কোর্ট ডিভিশন) জোবায়দা রশীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নাকচ করে দিলে মোট ১৯ জনের বিচার চলে। এই ১৯ জনের মধ্যে প্রথম ১৪ জন পলাতক থাকায় তাদের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের পক্ষে নিযুক্ত আইনবিদদের উপস্থিতি ও সহায়তায় তাদের বিচার অনুষ্ঠিত হয়। বিচারের রায় প্রদানের দিন অর্থাৎ '৯৮ এর ৮ নভেম্বর পলাতক আসামী মেজর বজলুল হুদাকে ব্যাঙ্কক থেকে গ্রেফতার করে এনে আদালতে হাজির ও রায় ঘোষণার পর ঢাকা জেলে অন্তরীণ করা হয়।

অভিযোগ পত্রে সর্বমোট ৭৪ জন সাক্ষী এবং ৪৬টি দলিল ও জিনিসপত্র অপরাধের আলামত হিসাবে উল্লেখিত হয়। বাদী মুহিতুল ইসলাম ছাড়া সাক্ষীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, পুলিশ সুপার (অবঃ) নুরুল ইসলাম, মেজর জেনারেল (অবঃ) মোঃ আব্দুর রব, মেজর জেনারেল (অবঃ) কে এম সফিউল্লাহ্, এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, এডমিরাল (অবঃ) মোশারফ হোসেন খান, মেজর জেনারেল (অবঃ) খলিলুর রহমান, লেঃ জেনারেল (অবঃ) নুরউদ্দীন খান, সৈয়দ সিদ্দিকুর রহমান, বিগ্রেডিয়ার (অবঃ) এ কে এম শাহজাহান, মেজর (অবঃ) এ এইচ জিয়াউদ্দিন আহমদ, কমোডর (অবঃ) গোলাম রব্বানী, মোঃ সেলিম (ওরফে আব্দুল), মহাপরিচালক (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) আব্দুল্লাহ্ আল হাসান, অধ্যাপক খোরশেদ আলম ও আব্দুর রহমান শেখ ওরফে রমা প্রমুখ। আলামত হিসাবে উপস্থাপিত জিনিসপত্রের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের পাঠাগারের ৫টি বুলেট বিদ্ধ বই, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধুর গুলিবিদ্ধ যুগল ছবি, বঙ্গবন্ধুর পরিহিত ৫টি গুলির ছিদ্র সহ রক্তমাখা ১টি লুংগি, ১টি রক্তমাখা ও ১২টি গুলির ছিদ্র সহ কুর্তা, ১টি কালোফ্রেমের চশমা, বেগম মুজিবের পরিহিত রক্তমাখা লালপেড়ে সাদা শাড়ি ও ১৩টি গুলির ছিদ্র সহ ১টি ব্লাউজ ও শেখ রাসেলের ব্যবহৃত রক্তমাখা আকাশী রং এর ১টি সার্ট ছিল। বুলেট বিদ্ধ বই গুলোর মধ্যে ছিল ভবেশ চন্দ্র সেনের 'উড়ো জাহাজের কয়েদী' এবং হুমায়ুন আহমেদের 'তোমাদের জন্য ভালবাসা'।

অভিযোগ পত্র অনুযায়ী '৯৭ এর ৩ মার্চ ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল আসামীদের বিরুদ্ধে মামলাটির বিচার কার্য গ্রহণ করেন। সংবিধানে বিধৃত আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমতা ও সকলের জন্য আইনের সমান প্রয়োগ ও আইনী আচরণের অধিকারের আলোকে সরকার

বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে হত্যার বিচারের জন্য কোনো বিশেষ আদালত বা ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠিত করেনি। দেশের প্রচলিত সাধারণ আদালতে এই হত্যার বিচার সম্পাদন করার অনুকূলে অন্যদের মধ্যে মত দিয়েছিলেন তখনকার আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, এটর্নী জেনারেল কে এস নবী, কৃতবিদ্য আইনবিদ ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম ও এডভোকেট সবিতা রঞ্জন পাল। কতিপয় দেশের কুটনৈতিক প্রতিনিধিরাও দেশের সাধারণ আদালতে এই হত্যার বিচার হলে তা আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হবে বলে মত দিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন যে দেশের সাধারণ আদালতে বিচার সম্পন্ন হলে বিদেশে পলাতক আসামীদের দেশে প্রত্যার্পণ সম্ভব ও সহজতর হবে। প্রায় বিরতিহীন ভাবে ১৬৩ দিন ধরে সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ ও বিবেচনা এবং আসামীপক্ষের আর্জি ও আপত্তি সমূহ নিষ্পত্তি করে '৯৮ এর ৮ নভেম্বর জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল এই হত্যা মামলার রায় দেন। এই প্রক্রিয়ায় বিচারক গোলাম রসুল ৬১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেন, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার আওতায় ৭ জনের বিবৃতি, ৭ জনের দোষ স্বীকারোক্তি, ১৯ জন আসামীর (মৌখিক) পরীক্ষা, ৬৩টি প্রদর্শনী বা এক্সিভিট, ২টি প্রদর্শনীর আওতায় ৯টি জব্দকৃত দলিলপত্র ও ভিডিও ক্যাসেট এবং সংশ্লিষ্ট কাগজাদির বীক্ষণ সমাপণ করেন।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে ২১ মে '৯১ সালে চেন্নাইর শ্রীপেরুমবুডুরে হত্যা করা হয়। সে হত্যাকাণ্ডের এজাহার দাতা ছিলেন সংশ্লিষ্ট পুলিশ পরিদর্শক। হত্যা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে এই দুই দেশেই আইনানুগ ভাবে গণ্য। সেজন্য হত্যার মামলায় রাষ্ট্র বাদী হওয়ার বিধান থাকায় সেদেশে হত্যার বিষয়ে কোনো বেসরকারি ব্যক্তিকে এজাহার দেয়া পর্য্যন্ত পুলিশকে বসে থাকতে হয়নি। একই আইনী বিধান এদেশে থাকা সত্ত্বেও পুলিশ বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিষয়ে পুলিশ নয় এমন ব্যক্তি হতে এজাহার পাওয়া পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশ অফিসার, নামত, নুরুল ইসলাম কোনো এজাহার ঘটনার পর দেয়নি; হত্যার ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানার (তখন লালবাগ থানা) সাধারণ ডায়েরিতে ভুক্ত হয়নি। এই প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কর্তব্য পালনে অবহেলা কিংবা বিচার বাঁধাগ্রস্থ করার দায়ে কোনো অভিযোগ কিংবা মামলা হয়নি। রাজীব গান্ধী হত্যা মামলায় এক বছরের মধ্যে বিস্তারিত তদন্ত সম্পূর্ণ করে পুলিশ আদালতে চার্জশিট বা অভিযোগপত্র ২৬ জন আসামীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করে। প্রাথমিক শুনানীর পর '৯৩ এর ২৪ নভেম্বর ২৬ জন আসামীর বিরুদ্ধে

অভিযোগ গঠন করা হয়। সাক্ষ্য প্রমাণাদির বিবেচনা শেষ করে '৯৭ এর ৫ নভেম্বর চূড়ান্ত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। বিচারক থীরু নবনীথাম উপস্থাপিত সকল সাক্ষ্য, প্রমাণ ও শুনানী বিবেচনা করে '৯৮ এর ২৮ জানুয়ারি রায় প্রদান করে ২৬ জন আসামীকে শাস্তি প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় রাজীব গান্ধীর হত্যার তদন্ত ও বিচারের তুলনায় কম সময় নেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রক্রিয়ায় বিচারক কাজী গোলাম রসুল রাজীব গান্ধী হত্যার বিচারক (চেন্নাইর অতিরিক্ত বেসামরিক ও দায়রা বিচারক) থীরু নবনীথামের মতোই প্রশংসনীয় ধৈর্য, আইনী জ্ঞান, অন্তদৃষ্টি ও নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করেন। বিচারের মূল সূত্র হিসাবে বিচারক গোলাম রসুল তার রায়ের প্রথমেই উল্লেখ করেন যে ন্যায় বিচার সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিষয়ে ব্যক্তিগত নৈতিক বিশ্বাস সরিয়ে কেবলমাত্র বিদ্যমান আইন অনুযায়ী সম্পাদনীয়।

বিচার প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপক্ষের তরফ হতে মামলা পরিচালনা করেন সর্বএডভোকেট মোঃ সিরাজুল হক, মোঃ রমজান আলী খান, সৈয়দ রেজাউর রহমান, মোশারফ হোসেন কাজল, সাহারা খাতুন, কামরুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম খান ও আনিসুল হক। আসামী পক্ষে ছিলেন সর্বএডভোকেট খান সাইফুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক খান, এ বি এম শরীফ উদ্দিন খান মুকুল ও টি এম আকবর এবং পলাতক আসামীদের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত আরও ১৪ জন আইনজীবী। ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর জোট সরকার ক্ষমতায় এসে আসামী পক্ষের আব্দুর রাজ্জাক খানকে অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল ও আইনজীবী খান সাইফুর রহমানকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ সেলের আইন উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত করে। একই সময়ে জোট সরকার এই নৃশংস হত্যা মামলার সফল তদন্তকারী পুলিশ অফিসার, সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার আব্দুল কাহার আখন্দকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে। আব্দুল কাহার আখন্দের তদন্তে তত্ত্বাবধায়ক অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী পুলিশ অফিসার আব্দুল হান্নান খান ২০০১ পরবর্তী বৈরী পরিবেশে চাকুরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর সচিব ও পরবর্তীকালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে মামলাটির প্রস্তুতি ও বিচার-পূর্ব প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সমন্বয়ের দায়িত্ব আমি পালন করি। সম্ভবত এই কারণেই ২০০২ সালের ১৫ মার্চ জোট সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইনের মোড়কে আমায় অন্তরীণ করে রাখে। ৬ মাস পরে সুপ্রিম কোর্ট আমার অন্তরীণাদেশ বেআইনী ঘোষণা করলে আমি মুক্তি পাই।

বিচার প্রক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার পরিজন ও অন্যদের নির্মম

হত্যাকাণ্ডের বিবরণ, বাদী পক্ষের তরফ হতে উপস্থাপিত সাক্ষ্য ও প্রমাণাদির ভিত্তিতে আদালত কর্তৃক রেকর্ড কৃত হয়। এসব থেকে জানা যায় যে '৭৫ সালের ১৪ অগাষ্ট রাত ৮.৩০ মিনিটের দিকে বঙ্গবন্ধু তার দিনকার কাজ শেষে ধানমণ্ডি (তখনকার) ৩২নং সড়কস্থিত রাষ্ট্রপতি ভবনে (প্লট নং ৬৬৭) ফিরে আসেন। রাত ৮টা থেকে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী মুহিতুল ইসলাম (সাক্ষী ১) ধানমণ্ডিস্থ রাষ্ট্রপতির ভবনে কর্তব্যরত ছিলেন। ভবনের নিচতলায় তার সাথে ছিলেন টেলিফোন মেকানিক আব্দুল মতিন ও রাখাল ছেলে আব্দুল আজিজ। দোতালায় ছিলেন বঙ্গবন্ধু, বেগম মুজিব, ২ ছেলে জামাল ও রাসেল, জামালের সদ্য পরিণীতা স্ত্রী রোজী ও বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসের। তিন তলায় ছিলেন বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে শেখ কামাল ও তার সদ্য পরিণীতা স্ত্রী সুলতানা। দুই তলায় বঙ্গবন্ধুর শোবার ঘরের বাইরে বারান্দায় শুয়ে আরও ছিলেন পরিচারক আব্দুর রহমান ওরফে রমা (সাক্ষী ২) ও সেলিম ওরফে আব্দুল (সাক্ষী ৩)। ভবনের পাহারায় সামরিক বাহিনীর সদস্য ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে সে সময় প্রযুক্ত ছিলেন ডেপুটি পুলিশ সুপার নুরুল ইসলাম খান (সাক্ষী ৫০)। রাত ১টার সময় (১৫ অগাষ্ট) মুহিতুল ইসলাম ঘুমিয়ে পড়েন। রাত ৪.৩০ এর দিকে টেলিফোন মেকানিক মতিনকে দিয়ে বঙ্গবন্ধু মুহিতুলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে মন্ত্রী সেরনিয়াবাতের বাসভবনে হামলা হয়েছে বলে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে ফোনে জানাতে বলেন। বঙ্গবন্ধু সেরনিয়াবাতের বাসভবনে হামলার সংবাদ লালফোনে পেয়ে থাকবেন। মুহিতুল গণভবন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে সংযোগ পেতে ব্যর্থ হন। বঙ্গবন্ধু তখন দোতালা থেকে নেমে এসে মুহিতুলের হাত থেকে নিজে হাতে ফোন নেন। এমন সময় ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি মুহিতুলের অফিসের দক্ষিণ দেয়ালের কাচ ভেঙ্গে উত্তরের দেয়ালে লাগতে থাকে। এই সময় বঙ্গবন্ধু তার ব্যক্তিগত সহকারী মুহিতুল সহ ঘরের নিরাপদ স্থানে অবস্থান নেন। এসব গুলি আসার সময় রাষ্ট্রপতি ভবনে সেনাদল থেকে নিরাপত্তার দায়িত্বে প্রযুক্ত কর্তব্যরত হাবিলদার মোঃ কুদ্দুস শিকদার (সাক্ষী ৪) যথারীতি বিউগল বাজানোর সাথে সাথে অন্যসব সহকর্মী সহ রাষ্ট্রপতির বাসভবনে জাতীয় পতাকা তুলছিলেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের পূর্ব দিকের বাড়িতে হাবিলদার কুদ্দুস ও রাষ্ট্রপতি ভবনের নিরাপত্তায় প্রযুক্ত অন্যসব সেনা সদস্যরা থাকত। তারা বিভাজিত কর্তব্য অনুযায়ী পালাক্রমে ভবনটি পাহারা দিত। ঐ বাড়িতে অবস্থানরত সেনা প্রহরীদের কাছ থেকে তাদের কাছে দেয়া গোলাবারুদ এর আগে সুবেদার মেজর আব্দুল ওহাব জোয়ারদার ওগুলোর

পরিবর্তে নতুন গোলাবারুদ দেবে বলে নিয়ে নেয়। ফলত গোলাবারুদ বিহীন নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত সেনা প্রহরীরা হামলাকারীদের প্রতিকূলে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়। খানিক পরে গুলি থেমে গেলে বঙ্গবন্ধু সিঁড়ি ধরে দোতালায় উঠে যান। গুলি থামার পর পরই কালো ও খাকী পোষাকধারী সেনাবাহিনীর লোকজন ভবনের গেট দিয়ে 'হ্যান্ডস আপ' বলতে বলতে ভবন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। পাহারায় প্রযুক্ত গোলাবারুদ বিহীন সেনা সদস্য ও হালকা অস্ত্রের পুলিশ তাদেরকে তেমন কোনো বাঁধা দেয়নি বা দিতে পারেনি। এই সময় ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা, মেজর নুর এবং মেজর মহিউদ্দিনকে (লান্সার) ভবনের গেটে দেখা যায় (এই সময় এই অফিসারদের এসব পদবী ছিল। বঙ্গন্ধুর হত্যার পর তাদের পদবীর উন্নয়ন হয়)। এদের মধ্যে ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও মেজর নুর ভবনের নিচতলার বারন্দায় উঠে এসে শেখ কামালকে মুহিতুলের অফিস ঘরে দেখতে পায়। শেখ কামাল বঙ্গবন্ধু দোতালায় উঠে যাওয়ার পর পরই নিচতলায় নেমে এসেছিলেন। ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা শেখ কামালকে স্টেনগান দিয়ে পর পর দু'বার গুলি করে হত্যা করে। এরপর ক্যাপ্টেন হুদা ও মেজর মহিউদ্দিন (লান্সার) ভবনে উপস্থিত পুলিশ ও বেসামরিক ব্যক্তিদিগকে গেটের সামনে লাইন করে দাঁড় করায়। লাইন করানো এসব ব্যক্তিদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ভবনে নিরাপত্তার দায়িত্বে প্রযুক্ত পুলিশবাহিনী প্রধান ডেপুটি পুলিশ সুপার নুরুল ইসলাম খানও ছিলেন। তার সাথে দাঁড়ানো এসবি পুলিশের এস আই সিদ্দিকুর রহমান গুলিবদ্ধ হয়ে মারা যান। লাইনে দাঁড়ানো কিংবা লাইনের বাইরে এ সময়ের আগে বা পরে হামলাকারী সেনাদের গুলিতে পুলিশের ডেপুটি সুপার নুরুল ইসলাম, ব্যক্তিগত সহকারী মুহিতুল ইসলাম ও পরিচারক সেলিম গুলিবদ্ধ হয়ে আহত হন। এরপর মেজর মহিউদ্দিন (লান্সার) তার সাথের সিপাহীদের সহ গুলি ছুড়তে ছুড়তে ভবনের দোতালায় উঠে যায়। একই সময়ে ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও মেজর নুর কতিপয় সিপাহী সহ হাবিলদার কুদ্দুস শিকদারকে (সাক্ষী ৪) জোর করে পেছনে নিয়ে দোতালায় উঠে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মেজর মহিউদ্দিন (লান্সার) নিচে নামার জন্য এগিয়ে আসলে বঙ্গবন্ধু চিৎকার করে বলেন 'তোরা কি চাস'? বঙ্গবন্ধুর এই প্রশ্ন করার সাথে সাথে ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও মেজর নুর স্টেনগান দিয়ে তাকে গুলি করে। গুলি খেয়ে বঙ্গবন্ধু সিঁড়িতে পড়ে যান এবং প্রাণ ত্যাগ করেন।

বঙ্গবন্ধুকে এভাবে খুন করার পর মেজর মহিউদ্দিন, মেজর নুর, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও অন্যরা নিচে নেমে এসে গেট দিয়ে ভবনের দক্ষিণে (৩২নং)

সড়কে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর মেজর আজিজ পাশা, রিসালদার মোসলেম উদ্দিন এবং ১ম বেঙ্গল লান্সার ইউনিট ও ২ ফিল্ড আর্টিলারির সিপাহীরা গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। এরপর মেজর আজিজ পাশা তার সিপাহীদের নিয়ে ভবনের দোতালায় উঠে। হাবিলদার কুদ্দুস শিকদার (সাক্ষী ৪) তাদের নির্দেশ অনুযায়ী পেছনে পেছনে যান। সেখানে তিনি সুবেদার মেজর আব্দুল ওহাব জোয়ারদারকে (আসামী) দেখতে পান। সুবেদার মেজর জোয়ারদার ঐদিন ভোর পৌনে ৫টায় সেনাবাহিনীর জিপ নিয়ে তখনকার রাষ্ট্রপতি ভবনে কর্মরত সৈনিকদের বেতনাদি দিতে এসেছিল। মেজর আজিজ পাশা বঙ্গবন্ধুর শোবার ঘরের বন্ধ দরোজায় গুলি করে ভেতরের লোকজনকে তা খুলতে বলে। তখন বেগম মুজিব দরোজা খুলে ঘরের ভেতরের লোকজনকে গুলি না করতে অনুরোধ ও অনুনয় করেন। সেনা সদস্যরা শোবার ঘরে থেকে বেগম মুজিব, শেখ রাসেল, শেখ নাসের ও পরিচারক রমাকে (সাক্ষী ২) বের করে আনে। বেগম মুজিব সিঁড়ির কাছে যেয়ে বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এর পর বেগম মুজিবকে তারা শোবার ঘরে নিয়ে তাকে সামনে রেখে শেখ নাসের, শেখ রাসেল ও রমাকে নিচের তলায় নিয়ে যায়। এই সময় হাবিলদার মোসলেম উদ্দিনের হাত থেকে স্টেনগান নিয়ে মেজর আজিজ পাশা বঙ্গবন্ধুর শোবার ঘরে বেগম মুজিব, শেখ জামাল, সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে গুলি করে হত্যা করে। হত্যাকারীরা এরপর নিচের তলায় নেমে আসে। কুদ্দুস শিকদার (সাক্ষী ৪) তাদের পেছনে নিচে নেমে এসে শেখ নাসেরকে অভ্যর্থনা ঘরের সাথে লাগোয়া গোসল খানায় মৃত দেখতে পান। একজন অস্ত্রধারী সেনা এর আগে তাকে গোসল খানায় নিয়ে গুলি করে। এরপর মেজর আজিজ পাশা গেটের বাইরে যেয়ে ওয়ারল্যাসে কথা বলে ভেতরে এসে শেখ রাসেলকে দেখতে পায়। শিশু শেখ রাসেল তখন কাঁদতে কাঁদতে মার কাছে যাওয়ার কথা বলেন। তখন মেজর আজিজ পাশা ১ম বেঙ্গল লান্সার ইউনিটের একজন হাবিলদারকে দিয়ে শেখ রাসেলকে দোতালায় পাঠিয়ে দেয়। এর পর হাবিলদার কুদ্দুস দোতালা থেকে গুলির ও কান্নার শব্দ শোনেন। যে হাবিলদার শেখ রাসেলকে নিয়ে উপর তলায় গিয়েছিল সে এরপর নেমে এসে গেটের সামনে মেজর আজিজ পাশার কাছে সব শেষ হয়েছে বলেই রিপোর্ট করে (সাক্ষী ৪ হাবিলদার কুদ্দুস শিকদার ও সাক্ষী ৫০ নুরুল ইসলাম খানের সাক্ষ্য)। এর পর একটি ট্যাঙ্কে চড়ে ভবনের গেটের সামনে মেজর ফারুক আসে। মেজর ফারুকের সাথে মেজর আজিজ পাশা, মেজর নুর ও মেজর

মহিউদ্দিন কথা বলে। কথা বলে মেজর ফারুক তার ট্যাঙ্ক নিয়ে চলে যায়।

এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার নক্সায় মেজর ফারুকের দায়িত্ব ছিল ট্যাঙ্ক সহযোগে সাভারে অবস্থানরত রক্ষী বাহিনীকে রাষ্ট্রপতি ভবনে হামলার সময়ে বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে এগিয়ে না আসতে দেয়া। রক্ষীবাহিনীকে খুনীরা বঙ্গবন্ধুর প্রতি অনুগত বাহিনী বলে ধরে নিয়েছিল। সকাল ৮টার দিকে সেনারা ১টি লাল গাড়িতে করে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব কর্নেল জামিলের মৃতদেহ নিয়ে ভবনের ভেতরে আসে। কর্নেল জামিল রাষ্ট্রপতির ভবনে হামলা ঠেকাতে এসে হামলাকারী সেনাদের হাতে সোবহানবাগ মসজিদ ও রাষ্ট্রপতি ভবনের মাঝখানে সড়কের কোনো স্থানে নিহত হয়েছিলেন। সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর হামলাকারী সেনারা ভবনের মূল্যবান জিনিস পত্তর তছ্নছ্ করে এবং তাদের কাঁধ-ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয়। এই প্রক্রিয়ায় সুবেদার মেজর আব্দুল ওহাব জোয়ারদারকে স্বর্ণালঙ্কার সহ মূল্যবান জিনিস পত্তর নিতে দেখা যায়। সুবেদার মেজর আব্দুল ওহাব জোয়ারদার এর আগে রাষ্ট্রপতি ভবনের নিরাপত্তায় প্রযুক্ত সেনা সদস্যদের কাছ থেকে তাদের অস্ত্রে ব্যবহার্য গুলিগুলো নতুন গুলি দেয়ার কথা বলে নিয়ে যায়। ওহাব জোয়ার্দার পুরানো গুলির বদলে নতুন গুলি পরে আর দেয়নি (সাক্ষী ৫ নায়েব সুবেদার গণির সাক্ষ্য)। হত্যাকাণ্ডের পর ভবনের গেটে মেজর ফারুক মেজর শরিফুল হক ডালিম সহ ফিরে আসে। মেজর ফারুক ক্যাপ্টেন হুদাকে তখন মেজর পদের পদোন্নয়ন মূলক শাপলা ফুলের এবং সুবেদার মেজর আব্দুল ওহাব জোয়ারদারকে লেফটেনান্ট পদের পদোন্নয়ন মূলক তারকা পরিয়ে দেয়। '৭৫ এর ১৬ অগাষ্ট ভোরে ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা, বেগম মুজিব, শেখ নাসের, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা, শেখ জামালের স্ত্রী রোজী ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাবইন্সপেক্টর সিদ্দিকুর রহমান সহ মোট ৯টি মৃত দেহ একটি গাড়িতে করে নিয়ে যায়। শেখ হাসিনা, তার স্বামী ড. ওয়াজেদ, ছেলে জয় ও মেয়ে পুতুল এবং বোন শেখ রেহানা সহ এই সময় দেশের বাইরে ছিলেন বলে এই নারকীয় হত্যার শিকার হননি। এস আই সিদ্দিকুর রহমানের লাশ বাদে বাকী লাশগুলো বনানী কবরস্থানে জানাযা ছাড়া দোয়া-দরুদ পরে কবরস্থ করা হয় (সাক্ষী ৪ হাবিলদার কুদ্দুস শিকদার, সাক্ষী ১০ মেজর জেনারেল আব্দুর রব ও সাক্ষী ৩১ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের সাক্ষ্য)। এস আই সিদ্দিকুর রহমানের লাশ রাজারবাগ পুলিশ লাইনে জানাযার পর মীরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়। একই দিনে সকাল ১০টার দিকে

ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ একটি পিক আপে করে বিমান বন্দরে নিয়ে যায়। বেলা দু'টার সময় টুংগীপাড়া থানার সামনে হেলিকপ্টারে বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ নামানো হয়। গোপালগঞ্জের তখনকার মহাকুমা পুলিশ অফিসার নুরুল আলম, আইনবিদ-ম্যাজিষ্ট্রেট আব্দুল কাদের ও সার্কেল ইন্সপেক্টার (পুলিশ) শেখ আব্দুর রহমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হেলিকপ্টারে বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহের সাথে আসা সেনারা তখনই বঙ্গবন্ধুকে দাফন করতে চেয়েছিল। স্থানীয় জনগণ গোসল, কাফন ও জানাযা ছাড়া তার মৃতদেহ দাফন করতে রাজী হননি। তখন স্থানীয় জনগণের মধ্যে আব্দুল মনাফ, ইমানুদ্দিন, নুরুল হক শেখ ও কেরামত হাজী বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহকে গোসল করান। আব্দুল হাই শেখ ও মৌলভী আব্দুল হালিম কাফন বানিয়ে অন্যদের সহযোগিতায় তা দিয়ে বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ আবৃত করেন। কাফনের জন্য স্থানীয় রেডক্রসের অফিস থেকে ৩টি সাদা শাড়ি ও গোসলের জন্য ওখানকার দোকান থেকে ২টি তিব্বত ৫৭০ বল সাবান এনে ব্যবহার করা হয়। কাফনের কাপড় ও গোসলের সাবান আনেন আব্দুল হাই শেখ, রজ্জব আলী ও শেখ আব্দুর রহমান (সার্কেল ইন্সপেক্টার)। সেনাদের বাঁধার মুখে ঐ সময়ে হাজার হাজার লোক থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর জানাযায় ২০/২৫ জনের বেশি লোক অংশগ্রহণ করতে পারেন নাই। জানাযায় ইমামতি করেন মৌলভী আব্দুল হালিম শেখ। বঙ্গবন্ধুর পরনের কাপড় চোপড় আব্দুল মান্নান শেখের কাছে রাখা হয়। তাকে তার মা-বাবার কবরের পশ্চিমে পাশে কবরস্থ করা হয় (সাক্ষী ২৮ আব্দুল হাই শেখের সাক্ষ্য)।

এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য '৭৫ সালের ১৪ অগাষ্ট ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর ফারুক ঢাকা বিমান বন্দরের পাশে বালুর ঘাটে, প্রশিক্ষণের মোড়কে সেনাবাহিনীর বিক্ষুব্ধ ও ক্ষমতা অভিলাষী কতিপয় অফিসারদের একত্রিত করে। এদের মধ্যে ছিল মেজর ফারুকের রেজিমেন্টের মেজর মহিউদ্দিন, মেজর আহমদ শরফুল হোসেন, ক্যাপ্টেন নুরল হক, ক্যাপ্টেন নকীব ও লেঃ কিসমত। বিমান বন্দর এলাকায় প্রশিক্ষণের জন্য একই সময়ে মোতায়েন মেজর রশীদ ও তার অধীনস্থ ২নং ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের সাথে পূর্ব পরিকল্পনা মতো মেজর ফারুক যোগাযোগ করে। ১৫ অগাষ্ট রাত ১টার দিকে মেজর রশীদ, মেজর শরিফুল হক ডালিম, মেজর নুর, মেজর আজিজ পাশা, মেজর রাশেদ চৌধুরী, মেজর শাহরিয়ার ও মেজর বজলুল হুদা, ১ম বেঙ্গল লান্সার রেজিমেন্টের প্রশিক্ষণকালীন সদরে মিলিত হওয়ার পর ঐ রেজিমেন্টের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর ফারুক বিদ্যমান

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে অভিযান চালিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করার পরিকল্পনা খুলে বলে (দ্রষ্টব্য, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত মেজর ফারুকের স্বীকারোক্তি)। মেজর ফারুক এই প্রসঙ্গে বলে যে বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতাচ্যুত না করলে বাংলাদেশে সেনাবাহিনী উঠিয়ে দেয়া হবে। জাতি আবার অন্য দেশের দাসত্বেও বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে। এই পরিণতি পরিহার করে বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করার জন্য খোন্দকার মুশতাককে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মেজর মহিউদ্দিন, মেজর বজলুল হুদা, মেজর আজিজ পাশা ও মেজর নুরকে ধানমণ্ডিস্থিত রাষ্ট্রপতির ভবন (তখনকার ৩২নং সড়কের ৬৬৭নং ভবন) হামলার দায়িত্ব দেয়া হয়। এই হামলার জন্য ৬ টি ৩ টন গাড়ি, গোলাবারুদ সহ ১০০ ল্যান্সার সৈনিক ও ৫০ জন আর্টিলারির সৈনিক নিয়োগ করা হয়। তখনকার সময়ে রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবশালী তরুণ নেতা ও বঙ্গবন্ধুর ভাগিনা শেখ ফজলুল হক মনির ধানমণ্ডিস্থ বাসায় হামলা (তখনকার ১৩/২ সড়কস্থিত) করে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয় রিসালদার মোসলেম উদ্দিনকে (ল্যান্সার)। এই নির্দেশ অনুযায়ী রিসালদার মোসলেম উদ্দিন ল্যান্সার গ্রুপের কতিপয় সদস্য সহ শেখ মনি ও তার অন্তঃসত্বা স্ত্রী আরজুকে তাদের ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে গুলি করে হত্যা করে। লেঃ কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, মেজর রাশেদ চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন মোস্তফা ও ক্যাপ্টেন মাজেদকে মিন্টো রোডস্থ মন্ত্রী সেরনিয়াবাতের বাড়িতে হামলা ও তাকে হত্যার জন্য নিয়োজিত করা হয়। মেজর শরিফুল হক ডালিমকে বাংলাদেশ বেতারের শাহবাগস্থ সদর দখল ও নিয়ন্ত্রণের ভার দেয়া হয় (দ্রষ্টব্য, লেঃ কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান ও লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিন আহমদ প্রদত্ত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার প্রদত্ত স্বীকারোক্তি)। এই ভাবে নিয়োজিত হয়ে ১৫ অগাষ্টের শেষ রাতে হামলা চালিয়ে তারা মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, বেবী সেরনিয়াবাত, আরিফ সেরনিয়াবাত, বাবু সেরনিয়াবাত ও শহীদ সেরনিয়াবাত ও অন্যদেরকে হত্যা করে। বেগম সেরনিয়াবাত গুলিবিদ্ধ হয়ে শরীরে গুলি ও মনে দুঃসহ স্মৃতির ধারক হয়ে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

মেজর রশীদ, মেজর ফারুক ও উল্লেখিত সামরিক বাহিনীর অফিসাররা বঙ্গবন্ধুর নীতি ও সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। মেজর রশীদ বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমদের আত্মীয় আর মেজর ফারুক, মেজর রশীদের ভায়রা ছিল। মেজর রশীদ বঙ্গবন্ধু সরকারের কার্যকলাপকে ইসলাম

পরিপন্থি ও সামরিক বাহিনীর গোষ্ঠীয় স্বার্থের প্রতিকূল মনে করত। মেজর ফারুক '৭৩ সালে পাকিস্তান থেকে ফেরত আসা জেষ্ঠতর মেজর মমিনের কাছে ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার রেজিমেন্টের অধিনায়কের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তার অধীনস্থ একই রেজিমেন্টের দ্বিতীয় অধিনায়ক হতে বাধ্য হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে মেজর ফারুক ২ বছরের জেষ্ঠতা পায়নি। মেজর ডালিম ও মেজর নুর শৃংখলা ভঙ্গের জন্য সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত হয়। অন্য আসামী সেনা অফিসাররা মেজর রশীদ ও মেজর ফারুকের অধীনস্থ কিংবা অনুগত ছিল। মন্ত্রী মোশতাক ছিল অতি ডানপন্থী রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনে বিশ্বাসী উচ্চ অভিলাষী ব্যক্তি। বঙ্গবন্ধু তাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিলে সে ক্ষুব্ধ হয়। বঙ্গবন্ধু তাকে মন্ত্রী সভা থেকে সরিয়ে দেবেন বলে তার আশংকা ছিল। '৭৫ সালের মার্চ মাস থেকে মন্ত্রী মোশতাকের সাথে কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, দাউদকান্দি মাদ্রাসা, গাজীপুরে সালনায় স্কুল ও ঢাকার বাসায় এরা ষড়যন্ত্র মূলক সভায় মিলিত হয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিদিত অপরাধ ঘটানোর জন্য এগিয়ে আসে। এসব ষড়যন্ত্র মূলক সভায় অন্যতম অংশগ্রহণকারী ছিল মাহবুবুল আলম চাষি ও তাহেরউদ্দীন ঠাকুর। বঙ্গবন্ধুর সরকার তাকে পররাষ্ট্র সচিব হিসাবে পদস্থ না রাখায় চাষি বিক্ষুব্ধ ছিল। তাহেরউদ্দীন ঠাকুর ছিল মোশতাকের অনুগত ব্যক্তি।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর এসব সেনা অফিসাররা রেডিওর মাধ্যমে তা প্রচার করে খন্দকার মোশতাককে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে। দেশের প্রধান বিচারপতি সায়েম বঙ্গবন্ধুর হত্যাকে অবজ্ঞা ও সংবিধান লংঘন করে এবং সংবিধান রক্ষা করার জন্য তার নেয়া শপথ ভঙ্গ করে মোশতাককে রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করায়। জোর করে তিন বাহিনীর প্রধানকে দিয়ে মোশতাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়ে একটি অঘোষিত কমান্ড কাউন্সিলের মাধ্যমে বঙ্গভবনে অবস্থান করে এসব বিপথগামী ও উচ্চাভিলাষী অফিসাররা মোশতাকের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করার অপপ্রয়াস চালায়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে কমান্ড কাউন্সিলের এসব অফিসার উপসেনা প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান, মন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও মোশতাকের সাথে মিলে নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যদের তালিকা তৈরী করে (দ্রষ্টব্য, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারা অনুযায়ী, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর প্রদত্ত জবানবন্দি)। '৭৫ সালের ২৪ অগাষ্ট জেনারেল জিয়াকে সেনাপ্রধান এবং বিগ্রেডিয়ার হোসেন মোঃ এরশাদকে মেজর

জেনারেল হিসাবে পদোন্নতি দিয়ে উপ সেনাপ্রধান করা হয়। মোশতাক ও পরে জেনারেল জিয়া '৭৫ সালের ৭ নভেম্বর এর পরে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে এসব অফিসারদিগকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা সত্ত্বেও পদোন্নতি দেয় এবং বিদেশে নিরাপদ ও সুখী অবস্থানে পদস্থ করে। এদের মধ্যে মেজর রশীদ ও মেজর ফারুক বিদেশে পদ নেয়নি। সেনাবাহিনীতে সুনির্দিষ্ট পদ বা দায়িত্ব না দিয়েও এই দু'জনকে লেঃ কর্নেল পদবীতে উন্নীত করা হয়। '৭৫ সালের তথাকথিত সিপাহী বিপ্লবের পর তাদেরকে বিদেশে যেতে দেয়া কিংবা পাঠান হয়। '৭৬ সালে তারা উভয়েই দেশে ফিরে এসে সাভার ও বগুড়াতে সেনা বিদ্রোহ ঘটাবার অপপ্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হয়। জেনারেল জিয়া এবারও এদের বিরুদ্ধে কোনো আইনী ও শাস্তি মূলক ব্যবস্থা না নিয়ে এদেরকে আবার বিদেশে পাঠিয়ে দেয়। '৮০ সালের শেষের দিকে সেনাবাহিনীর এই সব অফিসাররা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে আর একটি অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করে আবারও ব্যর্থ হয়। ফলত আবার তারা সকলে চাকুরীচ্যুত হয় এবং বিদেশে ফেরারী জীবন যাপন করতে থাকে। হোসেন মোঃ এরশাদ ক্ষমতা দখল করে তাদেরকে দ্বিতীয়বার পুনর্বাসন করে এবং তাদের সকল বকেয়া বেতন পরিশোধ করে (দ্রষ্টব্য, সাক্ষী ৪৪ কর্নেল সাফায়েত জামিলের সাক্ষ্য)। '৮৬ সালে এরশাদের আমলে লেঃ কর্নেল ফারুককে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হয়। এরশাদের পতনের পর '৯০ থেকে '৯৬ পর্যন্ত লেঃ কর্নেল রশীদকে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য খালেদা জিয়ার সরকারের অপচেষ্টা প্রযুক্ত থাকে। '৯৬ এর ১২ ফেব্রুয়ারি সেই প্রহসন মূলক নির্বাচনে তখনকার বিএনপি জান্তার তরফ থেকে লেঃ কর্নেল রশীদকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত ঘোষণা করে বিরোধী দলীয় নেতার পদে পদাসীনও করা হয়। '৯৬ এর ১২ ফেব্রুয়ারির সেই প্রহসন মূলক নির্বাচনে বিএনপি'র প্রভাবাধীন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ক্যাপ্টেন বজলুল হুদাকে কুষ্টিয়ার গাংনী থেকে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বলে প্রকাশ করা হয়।

এই নৃশংস হত্যার বিচার প্রক্রিয়ায় লন্ডনে ১৯৭৬ এর ৩০ মে প্রকাশিত সানডে টাইমসে মেজর ফারুক রহমানের ছবি সহ তার একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে ফারুক দম্ভোক্তি করে বলে, আমি মুজিবকে খুন করায় সহায়তা করেছি, সাহস থাকলে আমাকে বিচারে সোপর্দ কর'। এর সাথে সাংবাদিক এন্থনী মাসকারানাসের কাছে দেয়া 'এক ভিডিও' সাক্ষাৎকারে মেজর ফারুক ও মেজর রশীদ (তখনও লেঃ কর্নেল পদে তাদের পদোন্নয়ন দেয়া

হয়নি) সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী হিসাবে নিজেদেরকে বিবৃত করে। এই লক্ষ্যে তারা তাদের পরিকল্পনা ও সহযোগীদের কথা ভিডিও সাক্ষাৎকারে প্রকাশ করে। এই পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় তখনকার উপ সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাথে যোগাযোগ রাখার কথাও তারা প্রকাশ করে। বিচারে উপস্থাপিত প্রমাণ হিসাবে যুক্তরাজ্যের নোটারি পাবলিক কির্থ রবাট হপকিনস কর্তৃক এই ভিডিও সত্যায়িত হয়েছিল (বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার এক্সিভিট, ৩২ দ্রষ্টব্য)।

বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্ত আসামীদের পক্ষ হতে সাফাই হিসাবে দাবী করা হয় যে ঐ হত্যাকাণ্ডের সাথে তারা কেউ জড়িত ছিল না। কোনো তৃতীয়পক্ষ ঐ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আরো বলা হয় যে সামরিক আইনের আওতায় ঐ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এবং সেজন্য আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই হত্যার জন্য দেশের সাধারণ আইনে অর্থাৎ দণ্ডবিধির আওতায় তাদের বিচার হতে পারে না। আসামীগণ তাদের প্রতিরক্ষণে কোনো সাক্ষী হাজির করেনি বা করতে পারেনি। সাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ডের সাথে আসামীগণের সংশ্লিষ্টতা সকল সন্দেহের উপর প্রমাণিত হওয়ায় তৃতীয় কোনো শক্তি কর্তৃক হত্যাকাণ্ডটি ঘটানোর সম্ভাবনা স্বীকার করা যায় না। সাক্ষ্য প্রমাণে তৃতীয় কোনো শক্তির সংশ্লিষ্টতা কখনও উপস্থাপিত হয়নি। ফৌজদারি কার্যবিধির (মিলিটারি অফেনর্ডাস) ২নং ধারা অনুযায়ী দেশের সেনাপ্রধান '৯৭ এর ২ এপ্রিল বেসামরিক আদালতে সংশ্লিষ্ট সেনা সদস্যদের বিচারের ক্ষেত্রে সেনা আইনের বিধানে কোনো বাধা নাই বলে জানিয়েছিলেন।

মামলায় প্রাপ্ত মৌখিক, দালিলিক, তথ্যগত ও অবস্থানগত সাক্ষ্য ও আলামত এবং আসামীদের পরীক্ষা, পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করে বিচারক কাজী গোলাম রসুল (১) লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, (২) লেঃ কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, (৩) লেঃ কর্নেল মুহিউদ্দিন আহমদ (আর্টিলারি), (৪) পলাতক লেঃ কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশীদ, (৫) পলাতক মেজর বজলুল হুদা, (৬) পলাতক লেঃ কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, (৭) পলাতক মেজর আহমদ শরফুল হোসেন ওরফে শরিফুল ইসলাম, (৮) পলাতক লেঃ কর্নেল এ এম রাশেদ চৌধুরী, (৯) পলাতক লেঃ কর্নেল এ কে এম মুহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার), (১০) পলাতক লেঃ কর্নেল এস এইচ এম টি নুর চৌধুরী, (১১) পলাতক লেঃ কর্নেল আব্দুল আজিজ পাশা, (১২) পলাতক ক্যাপ্টেন মোঃ কিসমত হাশেম, (১৩) পলাতক ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার, (১৪) পলাতক ক্যাপ্টেন

আব্দুল মাজেদ, (১৫) পলাতক রিসালদার মোসলেম উদ্দিনকে দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় তাদের বিরুদ্ধে সকল সন্দেহের উর্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিচারকের মতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ পরিণতির বিষয়ে স্বজ্ঞানে জ্ঞাত থেকে পরস্পরের সাথে ষড়যন্ত্র করে ও পরিকল্পিত ভাবে তারা এ ঘটিয়েছে। বিচারকের মতে সেজন্য তাদের প্রতি কোনো সহানুভূতি ও অনুকম্পা প্রদর্শনের যুক্তি নেই। এদের বাইরে, আসামী (১) তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, (২) অনারারী ক্যাপ্টেন আব্দুল ওহাব জোয়ারদার, (৩) দফাদার মারফত আলী ও (৪) এল ডি আব্দুল হাশেম মৃধার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়নি বিধায় বিচারক তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহ থেকে অব্যাহতি দেন। বিচারক বঙ্গবন্ধু, তার পরিবার পরিজন ও অন্যদের হত্যার প্রক্রিয়ায় তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের কোনো স্পষ্ট প্রমাণ বা সংশ্লিষ্টতার সাক্ষ্য প্রমাণ পাননি। হত্যার ঘটনার পর রেডিও ষ্টেশনে গমন সহ ক্ষমতাসীনদের সাথে সে জড়িত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ও অন্যদের হত্যার ঘটনাত্তোর পর্যায়ে ক্ষমতাসীনদের সাথে বিচরনের ভিত্তিতে তাকে হত্যা কিংবা হত্যার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী করা যায় না বলে বিচারক সিদ্ধান্তে পৌছেন। আনারারি ক্যাপ্টেন আব্দুল ওহাব জোয়ারদার, দফাদার মারফত আলী ও এল ডি আব্দুল হাশেম মৃধার বিরুদ্ধে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণগুলি পরস্পরকে সমর্থন করে না বলে বিচারক তাদেরকে সন্দেহের উপযোগ বা সুবিধা দিয়েছেন। উল্লেখ্য, আব্দুল ওহাব জোয়ারদারের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের পর বঙ্গবন্ধুর বাসভবন থেকে মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী তসরুপ বা লুট করার সাক্ষ্য হাবিলদার মোঃ কুদ্দুস (সাক্ষী ৪) দিয়েছিলেন। এছাড়া আব্দুল ওহাব জোয়ারদার কর্তৃক রাষ্ট্রপতি ভবনের নিরাপত্তায় প্রযুক্ত সেনাদের কাছ থেকে গোলাবারুদ মিথ্যাকথা বলে সরিয়ে নিয়ে '৭৫ সালের ১৫ অগাষ্ট ভোররাতে ঐ ভবনে বিপথগামী ষড়যন্ত্রকারী সেনাদের আক্রমণের প্রতিকূলে নিষ্ক্রিয়তা আনয়নের সাক্ষ্য (সাক্ষী ৫ নায়েব সুবেদার গণির সাক্ষ্য) বিচারক এই সিদ্ধান্তে পৌছার প্রক্রিয়ায় দৃশ্যত বিবেচনায় আনেননি। প্রসংগত উল্লেখ্য যে '৭৭ এর ২৭ এপ্রিল সেনাবাহিনীর তখনকার এডজুটান্ট জেনারেল বিগ্রেডিয়ার নুরুল ইসলাম সেনাবাহিনী থেকে ওহাব জোয়াদারের অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে তার কর্তব্য পরায়ণতা, একনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের প্রশংসা করে আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়েছিলেন (সেনাসদর, আধা-সরকারি নং ৩০১৯/১৪ এজি এপ্রিল ২৭, ১৯৭৭)।

এই বিচারের প্রক্রিয়ায় কতিপয় তাৎপর্যমূলক ও কৌতুহলউদ্দীপক তথ্য

উদঘাটিত হয়েছে। এক, বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে হত্যার ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট আর ৪টি ঘটনা বা অপরাধের যথার্থ বিচার এখনও হয়নি। '৭৫ এর ১৫ অগাষ্টের সেই রাত্রে মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাতকে সপরিবারে বিপথগামী সেনাদের দিয়ে হত্যার বিষয়ে দেয়া এজাহারের ভিত্তিতে ও পরবর্তীকালে এই বিষয়ে সমাপ্ত তদন্তের আলোকে এখনও তাদের হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়নি। একই সময়ে শেখ ফজলুল হক মনি ও আরজু মনির হত্যার-বিষয়ে এজাহার দেয়া কিংবা নেয়া এবং তার ভিত্তিতে তদন্ত হয়েছিল কিনা এখনও জানা যায়নি। '৭৫ সালের সেই কালো রাত্রে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার প্রক্রিয়ায় ট্যাঙ্ক থেকে ছোড়া কামানের গুলিতে মোহাম্মদপুরে জনৈক রিক্সা চালক ও বিয়ের গায়ে হলুদ নেয়া এক যুবকের নিহত হওয়ার এবং বাংলাদেশ টিভির সদর অফিসে সেনাবাহিনীর সদস্যদের দিয়ে খুন বা গুম হওয়া দু'জন কর্মকর্তার নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে কোনো তদন্ত হাতে নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। চার জাতীয় নেতাকে '৭৫ এর ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে হত্যাকরণের বিচার ২০০১ এর অক্টোবরে সরকার পরিবর্তনের পর সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল কিনা কিংবা আসামীদের যথার্থ শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের তরফ হতে ইপ্সিত প্রচেষ্টা প্রযুক্ত হয়েছে কিনা তা বলা মুশকিল। তেমনি '৭৫ এর নভেম্বরের তথাকথিত সিপাহী বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ ও ১ জন মহিলা ডাক্তার সহ ১৩ জন অফিসার খুন করার কোনো তদন্ত ও বিচার হয়নি। হত্যার বিচার সমাজে শক্তির মদমত্ততায় অস্বীকার করার এরূপ ঘটনা সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের হানি করে।

দুই, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচারে প্রদত্ত সাক্ষ্য ও উত্থাপিত কাগজপত্রে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নাম বার বার এসেছে। '৯৬ সালের ১২ নভেম্বর ঢাকার মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট আফজালুর রহমানের কাছে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় লেঃ কর্নেল রশীদের স্ত্রী জোবায়দা রশীদ কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করা হয় যে বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রকারী ও নায়ক মেজর রশীদ, মেজর ফারুক ও অন্যদের সাথে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান যোগাযোগ রাখত। তার কথা অনুযায়ী ঐ সময়ে ষড়যন্ত্র করার একরাতে মেজর ফারুক মেজর জেনারেল জিয়ার বাসা থেকে ফিরে মেজর রশীদকে জানায় যে সরকার পরির্বতন হলে জিয়া প্রেসিডেন্ট হতে চায়। জেনারেল জিয়া নাকি এই প্রসঙ্গে তাদের বলেছিল যদি এ (ষড়যন্ত্র) সফল হয় আমার কাছে এসো, না হলে আমাকে সংশ্লিষ্ট করো না। এর ক'দিন পর মেজর ফারুক জেনারেল

জিয়ার বরাত দিয়ে মেজর রশীদকে বলে যে জিয়া ষড়যন্ত্র অনুযায়ী কাজ করার লক্ষ্যে এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খুঁজতে বলেছে যে দায়িত্ব নিতে পারবে। এরপর মেজর রশীদ তার আত্মীয় খোন্দকার মোশতাককে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে এই ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট করে। জোবায়দা রশীদ আরও বলে যে (১৯৭৫ সালের) ১৫ অগাষ্ট বিকালেই বঙ্গভবনে জেনারেল জিয়াউর রহমান মেজর রশীদের কাছে সেনা প্রধান হওয়ার জন্য ঘুর ঘুর করছিল। পরে ১৬ বা ১৭ অগাষ্ট 'প্রাক্তন মন্ত্রী' সাইফুর রহমানের গুলশানের বাসায় সাইফুর রহমান, রশীদ ও জিয়ার উপস্থিতিতে জিয়াকে সেনাপ্রধান করার বিষয় ঠিক হয়। পরিবর্তিত পটে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হবে, সাইফুর রহমান ও রশীদ মন্ত্রী হবে---এই উদ্দেশ্যে জিয়াকে সেনাপ্রধান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে কর্নেল ফারুক তার স্বীকারোক্তিতে বলেছে। মামলায় উপস্থাপিত এক্সিবিট (এক্সিবিট নং ১০(৫)এ) এ দেখা যায় যে '৭৬ এর ১৬ অগাষ্ট সেনাপ্রধান (জেনারেল জিয়াউর রহমান) এই মামলার আসামী-খুনী ১২ জন সেনা অফিসারকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন বিদেশী মিশনে ৩য় থেকে ১ম সচিব হিসাবে নিযুক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক অথচ গোপণীয় নির্দেশ পত্র জারী করে (সেনাসদর নং ৫৩০৪/৪৯/ এমএস ৫ তারিখ- ১৬/৮/১৯৭৬)। জোবায়দা রশীদের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় যে মেজর রশীদ ও মেজর ফারুক বিদেশী মিশনে জেনারেল জিয়া থেকে দেয়া চাকুরির প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। '৭৫ এর ১৭ নভেম্বরে অতিরিক্ত মুখ্যনগর হাকিম মোঃ হাবিবুর রহমানের কাছে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় দেয়া স্বীকারোক্তিতে আসামী-খুনী লেঃ কর্নেল মুহিউদ্দিন আহমদ বলে যে জিয়াউর রহমানের প্রস্তাব অনুযায়ী মেজর রশীদ ও মেজর ফারুক বিদেশী মিশনে চাকুরি না নিয়ে '৭৬ সালে গোপনে বাংলাদেশে ফিরে এসে সেনা অভ্যুত্থানের অপচেস্টা করে ব্যর্থ হয়। এতদ্বসত্ত্বেও জেনারেল জিয়া তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে তাদেরকে বিদেশে ফেরত পাঠায়। লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিন আহমদ বলে যে এতে তার মনে হয়েছিল যে ১৫ অগাষ্টের ঘটনায় জিয়াউর রহমানের সংশ্লিষ্টতা ছিল বলেই এদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। উল্লেখ্য, '৯২ সালে তখনকার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া উত্তরবঙ্গের ঘোড়াঘাট এলাকায় সেনাবাহিনীর শীতকালীন মহড়া উপলক্ষে যেয়ে খুনের আসামী লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদের সাথে একান্তে দেখা করেন। খুনের আসামী লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিনকে তখন আবক্ষলম্বিত দাড়ি সমৃদ্ধ ছদ্মবেশে দেখা যায়।

তিন, বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে রক্ষা করতে সেনাবাহিনী ব্যর্থ হয়েছে। বিচারক গোলাম রসুল তার রায়ে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন যে এক্ষেত্রে মামলায় প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয়েছে যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ, বিশেষ করে যারা ঢাকায় পদস্থ ছিলেন, তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেননি, এমনকি পালনের কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ করেননি। তার মতে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সেনাবাহিনীর জন্য এটি 'চিরস্থায়ী কলঙ্ক' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধু ও অন্যদের হত্যার বিচারে বিচারক গোলাম রসুলের এরূপ অবস্থানের প্রেক্ষিতে এও বলা প্রয়োজন যে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর তার মুখ্য নিরাপত্তা অফিসার মহিউদ্দিন আহমেদ, তার বাসায় কর্মরত হত্যার চাক্ষুষ দর্শক পুলিশ অফিসার নুরুল ইসলাম খান (সাক্ষী ৫০) কিংবা তার ব্যক্তিগত অফিসার বৃন্দ খুনের পর এজাহার দিতে এগিয়ে আসেনি। আইন অনুযায়ী খুন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন ঢাকা নগরের পুলিশ সুপার, ঢাকা জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের মহাপরিদর্শক বা স্বরাষ্ট্র সচিব বঙ্গবন্ধুর বিদিত হত্যার বিষয়ে কোনো প্রতিকার বা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়নি। ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার মাহবুবউদ্দীন আহমেদকে (বীরবীক্রম) বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর পরই সামরিক জান্তা গ্রেফতার ও চাকুরীচ্যুত করে। বেশ সময় থেকে হয়ে আসা হত্যার ষড়যন্ত্র বিষয়ে কোনো প্রাকভাষ বা তথ্য দিতে তেমনি ব্যর্থ হয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশের বিশেষ বিভাগ ও সামরিক বাহিনী সম্পর্কিত গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানগণ। ফলত হত্যাকাণ্ডের ২৩ বছর পর এদের চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিগত সহকারী মুহিতুল ইসলামকেই এগিয়ে এসে এজাহার দিতে হয়েছিল। দৃশ্যত একমাত্র মাহবুবউদ্দীন (বীরবীক্রম) ছাড়া উর্ধতন অফিসার সুলভ সাহসের অনুপস্থিতি এসব অফিসারদের ক্ষেত্রেও চিরস্থায়ী কলঙ্কের তিলক হয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সকল অফিসারদের স্মর্তব্য থাকবে।

চার, রাষ্ট্রপক্ষের তরফ হতে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন এডভোকেট সিরাজুল হক। তাকে সহায়তা করেন তার পুত্র এডভোকেট আনিসুল হক। শেখ হাসিনার শাসনামলের পরের দিকে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে এডভোকেট সিরাজুল হক ও আনিসুল হক জেল হত্যা মামলা পরিচালনার দায়িত্ব পান। ২০০২-এ এডভোকেট সিরাজুল হক মারা যান এবং ২০০৩-এ আনিসুল হক বৈরী পরিবেশের কারণে জেল হত্যা মামলার সরকারি আইনবিদ হিসাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বঙ্গবন্ধু ও অন্যদের হত্যা মামলায় আসামী

পক্ষে প্রধান আইনবিদের ভূমিকা নেন এডভোকেট খান সাইফুর রহমান। তার সাথে ছিলেন সর্বএডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক, টি এম আকবর, নজরুল ইসলাম ও শরফউদ্দিন মুকুল। জোট সরকারের শাসনামলে আব্দুর রাজ্জাক খান অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেলের এবং খান সাইফুর রহমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ মামলা সমুহ পরিবীক্ষণ করার সেলের আইনী উপদেষ্টার পদ লাভ করেন। এসব তাৎপর্যপূর্ণ ও কৌতুহল উদ্দীপক উদঘাটিত তথ্য অনুগমন করে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের ফলে যারা লাভবান হয়েছিল এবং এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় যারা ইচ্ছা করে বাঁধা বিঘ্ন সৃষ্টি বা অহেতুক প্রলম্বন কিংবা হত্যাকারীদের সুরক্ষা ও প্রতিপালনে সক্রিয় ছিল তাদের মুখোশ উন্মোচন করা প্রয়োজন। দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারী করতে যে বা যারা ভূমিকা রেখেছিল, বিশেষত এই লক্ষ্যে আইন মন্ত্রণালয়ের আইনী খসড়া তৈরীর দায়িত্ব বা কর্মকর্তার ভূমিকায় থেকে এই অধ্যাদেশটির খসড়া যে বা যারা তৈরী করেছিল এবং তা সংসদ কর্তৃক পাশ করানোর মন্ত্রণা দিয়েছিল এবং ফলত এই সব হত্যার বিচার বন্ধ রাখার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল. তাদের স্বরুপ ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ স্থাপনের স্বার্থে বের করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে ও লক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার আদল অনুযায়ী একটি সত্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে এগিয়ে যাওয়া সমীচিন হবে। এই ক্ষেত্রে শাস্তি আরোপণ নয়, স্বরূপ উদঘাটনের মাধ্যমে সামাজিক আত্মশুদ্ধির অবকাশ এই ধরণের পদক্ষেপ জাতিকে দেবে বলে আশা করা যায়।

'৯৮ এর ৮ নভেম্বর বিচারক কাজী গোলাম রসুল বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করেন। তিনি অপরাধীদের কৃত হত্যার নৃশংসতার আলোকে একটি ফায়ারিং স্কোয়াড দিয়ে প্রকাশ্যে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ মোতাবেক ফায়ারিং স্কোয়াড দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে কোনো অসুবিধার কারণ থাকলে প্রচলিত নিয়মানুসারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাদের প্রত্যেকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে বলে তিনি সিদ্ধান্ত দেন।

বিচারক গোলাম রসুল '৯৮ এর ১১ নভেম্বরে এই রায় মোতাবেক ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৭৬ ধারা অনুযায়ী বিচারে আরোপিত মৃতুদণ্ড অনুমোদনের জন্য রায়ের অনুলিপি সহ নথিটি সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট ডিভিসনে ডেথ রেফারেন্স হিসাবে অবিলম্বে পাঠানোর আদেশ দেন। অবিলম্বে পাঠানোর নির্দেশ সত্ত্বেও নথিটি হাই কোর্ট ডিভিশনে পাঠাতে ও যথা অবয়বে উপস্থাপন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ১ বছরের চেয়ে বেশি সময় লাগে। হাই

কোর্ট ডিভিশনে বিচারপতি মোঃ রুহুল আমীন ও বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের বেঞ্চে '৯৮ সালের ৩০. নং ডেথ রেফারেন্স হিসাবে জেলা ও দায়রা আদালতের রায়ে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড অনুমোদনের মামলা উত্থাপিত হয়। এই দুই বিচারপতি ৬৩ কর্মদিবসে মামলাটির শুনানী গ্রহণ করে ২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর তাদের সিদ্ধান্ত দেন। সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে অন্যকোন ডেথ রেফারেন্স নিষ্পত্তি কারণে এত সময় লাগেনি। দীর্ঘতম সময় প্রযুক্ত করা সত্ত্বেও এই বিষয়ে দু'জন বিচারপতির দু'রকম সিদ্ধান্ত হয়। বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক, (১) উত্থাপিত বিষয়টির বিভিন্ন দিকের আইনী অবস্থান বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনা, (২) ১৫ জন দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিবেচনা এবং (৩) ৩ জন আসামীর দোষ স্বীকৃতি মূলক বিবৃতি নিরীখ করে তাদের উপর জেলা ও দায়রা বিচারক কাজী গোলাম রসুল আরোপিত দণ্ড বহাল রাখেন। নিম্নতর আদালতে বিচার প্রক্রিয়ায় পদ্ধতি মূলক ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি কেন্দ্রিক কোনো অসংগতি বা অপূর্ণাগতা বা অগ্রহণীয় যুক্তি প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড পরিবর্তন করার কোনো কারণ হিসাবে তিনি খুঁজে পাননি বলে তার সিদ্ধান্তে উল্লেখিত হয় (দ্রষ্টব্য, State Vs Syed Faruque Rahman & Others, ABM Khairul Haque J, অনুচ্ছেদ ১১৩৫ BLD Special Isssue, ২০০২, অনুচ্ছেদ ১১৫০)। বিচারপতি মোঃ রুহুল আমীন একই তারিখের রায়ে বিচারক গোলাম রসুল কর্তৃক দণ্ডিত ৯ জন আসামী, নামত (১) লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, (২) লেঃ কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, (৩) লেঃ কর্নেল খোন্দকার আব্দুর রশীদ, (৪) মেজর মোঃ বজলুল হুদা, (৫) লেঃ কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, (৬) লেঃ কর্নেল এ এম রাশেদ চৌধুরী, (৭) লেঃ কর্নেল এ কে এম মহিউদ্দিন (ল্যান্সার), (৮) লেঃ কর্নেল এম এইচ বি এম নুর চৌধুরী এবং (৯) লেঃ কর্নেল মোঃ আব্দুল আজিজ পাশার উপর দণ্ডবিধির ১০২খ এবং ৩০২/৩৪ ধারা অনুযায়ী আরোপিত মৃত্যুদণ্ড দৃঢ়ীকৃত করেন। আসামী ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদের ক্ষেত্রে তিনি দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় আরোপিত দণ্ড থেকে তাকে রেহাই দেন, কিন্তু দণ্ডবিধির ১২০খ ধারায় আরোপিত মৃত্যুদণ্ড দৃঢ়ীকৃত করেন। তার রায়ে অপর্যাপ্ত প্রমাণের কারনে তিনি আসামী লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিন আহমদ (আর্টিলারি), মেজর আহমদ শরফুল হোসেন, ক্যাপ্টেন কিসমত হাশেম, ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার ও রিসালদার মোসলেম উদ্দিনকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দেন। এছাড়া সাক্ষ্য হিসবে কর্নেল রশীদ ও মেজর ফারুকের দম্ভোক্তি ও স্বীকারোক্তি

হিসাবে অডিও ক্যাসেট ও তাতে প্রদর্শিত ও বিবৃত তথ্যাদি বিচারীয় উপকরণ হিসাবে গ্রহণীয় নয় বলে তিনি সাব্যস্ত করেন (দ্রষ্টব্য, State Vs. Syed Faruque Rahman & Others, Md. Ruhul Amin J, BLD Special Issue ২০০২, অনুচ্ছেদ ৬০৫-৬০৭)। ফলতঃ শেষোক্ত ৫ জন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ছাড়া উপরোক্ত বাকী ৯ জন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মৃত্যুদণ্ড সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট ডিভিশন কর্তৃক দৃঢ়ীকৃত বলে গণ্য হয় (দ্রষ্টব্য, সম্পাদকের নোট, BLD Special Issue, ২০০২, পৃষ্ঠা-৩৩৫)। আসামী ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদের মৃত্যুদণ্ডের ধারা বিষয়ে বিচারপতি রুহুল আমীন ও বিচারপতি খায়রুল হকের মতানৈক্য সত্ত্বেও, দু'জনই দণ্ডবিধির দুই ভিন্ন ধারায় তার মৃত্যুদণ্ড দৃঢ়ীকৃত করার ফলে কর্মকরণ সূত্র অনুযায়ী তা চূড়ান্ত দণ্ড বলেই গণ্য করা যায়।

উপরোক্ত ২ বিচারপতির সিদ্ধান্ত ৫ জন আসামীর ক্ষেত্রে অভিন্ন না হওয়ার ফলে ২০০০ এর ১৪ ডিসেম্বর ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৭৮ ধারা অনুযায়ী এই ৫ জন আসামীর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ডেথ রেফারেন্সটি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হয়। প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান ২০০১ এর ১৫ জানুযারি এদের ডেথ রেফারেন্স নিস্পত্তি করার জন্য বিচারপতি ফজলুল করিমকে নিযুক্ত করেন। বিচারপতি করিম ২৫ কর্মদিবসে বিষয়টির উপর শুনানী নিয়ে ২০০১ এর ৩০ এপ্রিল ঐ ৫ জন আসামীর মধ্যে ৩ জন, নামতঃ মেজর আহমদ শরফুল হোসেন, ক্যাপ্টেন কিসমত হাশিম ও ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসারকে অপরাধ সংঘটন প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয়তার বা সংশ্লিষ্টতর বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণের অনুপস্থিতির কারণে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দেন। এই রেহাই দানের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তিনি এই বিষয়ে বিচরপতি মোঃ রুহুল আমীনের সাথে অংশত ঐকমত্য পোষণ করেন। আর বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের মতের সাথে অংশত একমত হয়ে তিনি লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি), ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ ও রিসালদার মোসলেম উদ্দিনের মৃত্যুদণ্ড দৃঢ়ীকৃত করেন। ফলত জেলা ও দায়রা বিচারক কাজী গোলাম রসুল কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ১৫ জন আসামীদের মধ্যে হাই কোর্ট ডিভিশন কর্তৃক ৩ জন, নামতঃ মেজর আহমদ শরফুল হোসেন, ক্যাপ্টেন কিসমত হাশেম ও ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার ছাড়া বাকী ১২ জন দেশের প্রচলিত আইনে দৃঢ়কৃত ভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বলে গণ্য। এদের মধ্যে এখন ৪ জন, নামতঃ লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, লেঃ কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ ও মেজর বজলুল হুদা

ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী হিসাবে অন্তরীণ আছে। বাকী ৮ জন বাংলাদেশের বাইরে, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, লিবিয়া, পাকিস্তান কিংবা সৌদি আরবে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে। এসব পলাতক আসামীর ক্ষেত্রে প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আইনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের আপিলাত বিভাগে কোনো আপীল করা হয়নি বিধায় তাদের উপর আরোপিত মৃত্যুদণ্ড ইতোমধ্যে দৃঢ়ীকৃত ও চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তাদেরকে গ্রেফতার করে দেশে প্রত্যার্পণ করিয়ে মৃত্যুদণ্ড এখনই কার্যকর করা যায়। ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জোট সরকার এসব পলাতক আসামীদের গ্রেফতার করে দেশে এনে তাদের উপর আরোপিত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

হাই কোর্ট ডিভিশন কর্তৃক চূড়ান্ত ভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত দেশে অন্তরীন উপরোক্ত ৪ জন আসামীরা সুপ্রিম কোর্টের আপিলাত বিভাগে তাদের উপর আরোপিত ও দৃঢ়ীকৃত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করেছে বলে জানা গেছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলা নিষ্পত্তি করনে আপিলাত বিভাগের ৩ জন বিচারক নামতঃ বিচারপতি আমীরুল কবির চৌধুরী, বিচারপতি এম এম রুহুল আমীন ও প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছের হোসেন ইতোমধ্যে বিব্রত বোধ করেছেন বলে প্রকাশ। আপিলাত ডিভিশনে পদোন্নত এখনকার বিচারপতি মোঃ রহুল আমীন ও বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ইতোমধ্যে এই হত্যাকাণ্ড উৎসারিত ডেথ রেফারেন্সের শুনানী হাই কোর্ট বিভাগের বিচারপতির ভূমিকায় সম্পাদন করেছেন। এই কারণে আপিলাত বিভাগের এই দু'জন বিচারপতি এদের আপীল নিস্পত্তি করতে পারবেন না। ফলত এই বিষয়ে বিব্রত বোধ-না-করা একজন বিচারপতি, নামত, বিচারপতি তফাজ্জল ইসলাম আপিলাত বিভাগে বর্তমান বিধি অনুযায়ী এই ডেথ রেফারেন্স বিষয়ক আপীল শুনতে পারেন। কিন্তু আপিলাত ঘিভাগে গঠিতব্য পূর্ণ বেঞ্চে এই সব আপীল নিষ্পত্তি করণে ৩ জন বিচারপতি প্রয়োজন। হাই কোর্ট ডিভিশন থেকে আপিলাত ডিভিশনে এড হক ভিত্তিতে ২ জন অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ করে এইসব আপীলের নিষ্পত্তি হতে পারে। সংবিধান (অনুচ্ছেদ ৯৮) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে এই নিয়োগ দিতে পারেন। এই নিয়োগ এখনও দেয়া হয়নি। জোট সরকারের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মওদুদ আহমদ বলেছেন, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মাত্র ১ জনকে এডহক ভিত্তিতে আপিলাত বিভাগে নিযুক্তি দিতে পারেন। তার মতে ১ জনকে এভাবে এডহক ভিত্তিতে আপিলাত

বিভাগের বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি নিয়োগ করলে এই মামলার নিস্পত্তির জন্য পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ গঠন করা যাবে না, ২ জনের প্রয়োজন হবে। মওদুদ আহমদের মতে এই কারণে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পদোন্নয়নের মাধ্যমে আপিলাত বিভাগে আরও দু'জন বিচারপতি নিযুক্ত না হলে এইসব আপীলের নিস্পত্তি করা যাবে না। মওদুদের সূত্র অনুযায়ী হাই কোর্ট বিভাগ থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিব্রত-না-হওয়া দু'জন বিচারপতির পদোন্নয়ন ঘটার আগে সম্ভবত বিচারপতি তফাজ্জল ইসলাম অবসরে চলে যাবেন। ফলত বঙ্গবন্ধুর হত্যার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত খুনীরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এড়িয়ে যেতে পারবে। আমাদের সযত্ন বিবেচনায় সংবিধান অনুযায়ী একাধিক বিচারপতি এডহক ভিত্তিতে আপিলাত বিভাগে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতির সুপারিস বিবেচনায় এনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে নিযুক্ত হতে পারেন। এবং দু'জন বিচারপতি এভাবে নিযুক্ত হলে, বিদ্যমান বিব্রত-না-হওয়া আর একজন বিচারপতি সহ এই মামলার জন্য পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ গঠন করা যায়। পদ্ধতি মূলক এই পারঙ্গমতার পেছনে সদিচ্ছা থাকলেই তা সম্পূর্ণ হতে বা ফলদায়ক হতে পারে। এই সদিচ্ছা এক্ষেত্রে এখনও উপস্থিত কিংবা দৃশ্যমান হয়নি। এক্ষেত্রে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে সজীব সদিচ্ছার অনুপস্থিতি ও নীরব অবহেলার ক্রন্দসী কথার কাঁটার মালা হয়ে জাতির সামষ্টিক বিবেককে কামড়িয়ে দুমড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত ও ক্লেদাক্ত করে যাচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, অগাষ্ট ১৫, ১৬-১৭, সংবাদ ১৫, আজকের কাগজ ১৫, ভোরের কাগজ ১৫, ১৬-১৭, ২০০৬

বিনা দোষে ফাঁসী : বর্বরতার এক কাহন

১৯৬৬ সালের শেষ ভাগে তখনকার সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তানের শিক্ষানবীশ অফিসার হিসাবে সারদা পুলিশ একাডেমীতে মাস খানেক প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল আমাদের। সারদা পুলিশ একাডেমী নামকরা পুলিশ-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত। তখনকার সর্বভারতীয় পুলিশ অফিসারদের নিযুক্তি-পরবর্তী প্রশিক্ষণ হতো এখানে। পাকিস্তান আমলে তেমনি হতো পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তানের সদ্য নিযুক্ত অফিসারদের। সারদা পুলিশ একাডেমীতে প্রশিক্ষণান্তে নাম-কুড়ানো অনেক পুলিশ অফিসারদের মধ্যে ছিলেন, কাজী আনোয়ারুল হক, মুসা আহমেদ, আহমদ ইব্রাহিম, মেসবাহউদ্দীন আহমেদ, নুরুল ইসলাম ও আব্দুল খালেক। আমরা সিভিল সার্ভিসের অফিসারগণ যখন ওখানে ছিলাম, সদ্য নিযুক্ত পুলিশ অফিসার হিসাবে প্রশিক্ষণ নিতে দেখছি অন্যদের মধ্যে এস এম শাহ্জাহান ও আজিযুল হককে। এই দু'জন, শাহ্জাহান ও আজিয পরবর্তীকালে বাংলাদেশে পুলিশের শীর্ষ পদ ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসাবে সুনামের সাথে কাজ করেছিলেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের মাঝখানে প্রবাহিত বিস্তৃত পদ্মার এপারে দাঁড়ানো যত্ন মণ্ডিত সবুজ ঘাসের বাগান ছড়ানো এই একাডেমীতে মাসখানেকের অবস্থান প্রশিক্ষণের দৃঢ় রুটিনে মোড়া দিন-রাত্রিতে সামনের দিনের সমৃদ্ধি ও স্বস্থিতে ঘেরা বাংলার স্বপ্ন মেলে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল সমাজের সমৃদ্ধি ও স্বস্থির ধারক, বাহক ও লক্ষ্য হবে দেশের সাধারণ মানুষ। পুলিশ ও সুশীল প্রশাসন হবে এর অর্জন, ধরে রাখা ও বিস্তৃতির কর্মরথ। সেই পটে সজ্জন ও বন্ধু ভাবাপন্ন এক পৌঢ় পুলিশ-প্রশিক্ষকের সাথে পুলিশী আইন-কানুন ও কর্মদর্শন আলোচনার ক্রমে মন-খোলা হয়েছিলাম। বলেছিলাম, সরকারের রাজস্ব বিভাগে যেমন তেমন পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব ও প্রকৃত কাজের মধ্যে

ফারাক বেশ বেশি। বেশ সময় ও ক্ষেত্রে পুলিশকে প্রভাবিত বা সন্তুষ্ট না করতে পারলে, অপরাধের এজাহার নেয়া হয় না, তদন্ত হয় না, চার্জশিট আদালতে যায় না। দুষ্টের দমনের মোড়কে শিষ্ট নাজেহাল হয়। সে সময়ের মোনেমখানী প্রশাসনে গোষ্ঠীয় ইচ্ছার বলে পুলিশ জনতার প্রতিকূলে পেটোয়া বাহিনী হিসাবে কাজ করে, সাধারণ মানুষের প্রতিরক্ষণের নয়, বরং নির্যাতনের হাতিয়ার হয়ে যায়। অভিজ্ঞানে স্থিতধী সেই পুলিশ-প্রশক্ষিক স্মিত হাসি নিয়ে বলেছিলেন, আপনার অভিযোগ অনেকাংশে সঠিক, তবে এসব অভিযোগ করার সময় আপনারা দু'টো কথা হয়ত মনে রাখেন না বা জানেন না। তিনি বললেন, স্বস্থির জীবন যাপনের জন্য পুলিশের---বিশেষত নিম্নতর পর্যায়ে অফিসার ও কর্মীর বেতনাদি কম। জানেন, থানায় কর্মরত বেশির ভাগ পুলিশ অফিসার ও কনস্টেবলদের বাসস্থান দেয়া হয় না, ইউনিফর্ম পাওয়া যায় না, ধোলাই ভাতা অপর্যাপ্ত, কনস্টেবলরা দেড় বছরে এক জোড়া ক্যাম্বিসের জুতো পায়, অফিসে ব্যবহার্য কালি-কলম, ফরম ও কাগজাদির সরবরাহ অপ্রতুল, থানা এলাকায় সফরের জন্য কোনো ভাতা মেলে না। সে পর্যায়ের পুলিশরা তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই সন্তোষের উপকরণ খুঁজে নেয় এবং নিয়ে যা আইনত করার, তা করার পথ ও ক্রম থেকে দূরে সরে যায়। বললেন তিনি,- এসব অনিয়মে সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও পুলিশের কর্মকাণ্ডে একটি সুস্পষ্ট নৈতিকতা অনুসরণ করা হয়। পুলিশ প্রভাবিত হয়ে সন্তোষের উপকরণ পেয়ে চোর-ডাকাত, বদমাশ ও খুনীদের ধরতে দেরী করে এবং তদন্তে এসব অপরাধীদিগকে ঘুরিয়ে ঘাটিয়ে শুষে নিয়ে অনেক সময় রেহাই দেয় কিন্তু কখনও অপরাধের দায় নির্দোষের উপর চাপায় না। যেমন, পুলিশের এই ধরণের সন্তোষ-সংক্রামিত কাজে চোর-বাটপার-খুনী শেষ পর্যন্ত হয়ত ছাড়া, কিংবা কম শাস্তি পায়। খুনীও হয়ত রেহাই পায়, কিন্তু নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জশিট বানিয়ে খুনের দায় বর্তানো হয় না। আর যারা সন্তোষের উপকরণ দিয়ে রেহাই পায় তারা আজীবন পুলিশের কাছে দেনাদার হয়ে থাকে, ফি অমাবশ্যার রাতে, পালাপার্বন ও উৎসবের মৌসুমে পুলিশকে সন্তুষ্ট করতে বাধ্য থাকে। একবার পুলিশের ক্রাইম নোটবুক কিংবা সার্ভিলিস রেজিষ্টারে নাম উঠলে সারা জীবন পুলিশের খেদমত করতে হয়। সেজন্যই দেখবেন; প্রথাগত চুরি-ডাকাতি করে এদেশে কেউ বড়লোক হয় না, হতে পারে না।

প্রশাসনে চাকুরি করার ক্রমে, ম্যাজিষ্ট্রেট, মহাকুমা প্রশাসক ও ডেপুটি কমিশনার হিসাবে কাজ করার সময় সারদার ঐ পুলিশ-প্রশিক্ষকের কাছে থেকে

শোনা পুলিশের কাজে এই নৈতিকতার প্রতিফলন দেখেছি। এর বাইরেও সন্তোষের উপকরণে সাধারণত সন্তুষ্ঠ পুলিশকে ক্ষেত্র ও সময় বিশেষে এতিম ছেলের ভরণ পোষণের ভার নিতে, সীমান্তে বিডিআর কর্তৃক ধৃত ও পুলিশের হেফাজতে দেয়া শিশু কিশোরকে ছেড়ে দেয়ার মানবিক তদবির করতে, বিধবার জমি রক্ষা করণে স্বপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে যেতে, এমনকি চোর-ডাকাত হিসাবে জেলে অন্তরীণ অপরাধীর অসহায় পরিবার পরিজনকে সহায়তা দিতে দেখেছি। ক'দিন আগে হরতাল করার সময় দেখেছি রাইফেলধারী এক পুলিশ একজন ছিন্নমূল বুড়ী মা'কে যত্নের সাথে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিচ্ছেন। বৃহত্তর যশোর জেলার জেলা প্রশাসক হিসাবে জিয়াউর রহমানের শাসনের সময়ে তখনকার বাম দর্শনের নেতা কমরেড আব্দুল হককে সেনা-পুলিশের চিরুনী অভিযানের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে সুযোগ দিতে প্রত্যক্ষ করেছি এক পুলিশ অফিসারকে। কেন করলেন একথা জিগগেস করায় বলেছিলেন তিনি, স্যর এত ভালো ও নিরাসক্ত লোককে ধরায় মন সায় দেয়নি। হক সাহেব চোর-ডাকাতকে দমন করেন, ভালো কাজে পুলিশকেও সহায়তা করেন। তিনি আমার বখে যাওয়া ছেলেকেও সংশোধন করে তার মা'র কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাকে ধরি কেমন করে?

পুলিশের কাজে এরূপ নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে চমকে-ব্যথিত হয়েছি যখন সংবাদ পত্রে দেখলাম ঢাকার হাজারিবাগ থানার দারোগা রেজাউল করিমের তদন্ত ও প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকার অতিরিক্ত জেলা বিচারক শামসুল আলম খান নগরের এক নিরপরাধ নাগরিক শাহ্ আলম বাবুকে ফাঁসীতে লটকানোর রায় দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলার বাদিনী রোকেয়া বেগম উন্মুক্ত আদালতে শাহ আলম বাবু তার স্বামী গাজী লিয়াকত হোসেনের খুনী নয় বলে বিবৃতি দেয়া ও তাকে নিরপরাধ হিসাবে সনাক্ত করার পরও শাহ আলম বাবুকে মৃত্যুর দণ্ডাদেশ দেয় এই বিচারক। সৌভাগ্যত বিষয়টি বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার নজরে আসায় ৩ বছর ২ মাস কারাভোগ ও ফাঁসীর প্রকোষ্ঠে মানবেতর জীবন যাপন করার পর শাহ্ আলম বাবু সুপ্রিম কোর্টের (হাই কোর্ট ডিভিশন) নির্দেশে ছাড়া পেয়েছেন। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী দারোগা রেজাউল করিম তার কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা না পেয়ে নামের প্রান্তিক বিভ্রান্তির মোড়কে তাকে খুনের দায়ে চার্জশিট ভুক্ত করেছে আর ঐ অর্বাচীন বিচারক বিচারের মোড়কে সব তথ্যাদি যথা প্রয়োজন বীক্ষণ না করে তাকে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্থ করে ফাঁসীতে লটকানোর নির্দেশ দিয়েছে (দ্রষ্টব্য, দৈনিক যুগান্তর, অগাষ্ট ৩১, ২০০৬)।

সমাজের স্বার্থে একজন নাগরিকের জীবন নিয়ে নেয়ার এই সর্বাত্মক পদক্ষেপ সব তথ্যাদি বিবেচনা না করে বিচারকের লেবাসে কেমনে দায়িত্বহীন, অসংবেদনশীল ও অবহেলায় দলিত পদক্ষেপ নেয়া হতে পারে তার পরিচয় সেই ঘৃণার্হ বিচারক এই সব সম্ভবের দেশে বেশরম বিক্রমে দিয়েছে। সৌভাগ্যত সুপ্রিম কোর্ট এরূপ ঘৃণার্হ বিচার প্রক্রিয়ায় মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত বাবুকে মুক্তি দেয়ার, বখে যাওয়া দারোগা রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে যথা প্রয়োজন শাস্তি মূলক পদক্ষেপ নেয়ার এবং সংশ্লিষ্ট বিচারকের বিচারকরণীয় ক্ষমতা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। শাহ আলম বাবু এই নির্দেশ বলে ক'দিন পরে মুক্তি পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বিচারের এই প্রহসনীয় প্রক্রিয়ায় তার ভিটে-বাড়ি বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছেন, তার অসহায় স্ত্রী জামিলা খাতুন, তার ছাপা কাপড়ের ছোট শিল্প লাটে উঠেছে তার ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া বন্ধ হয়েছে। মোটকথা, বিচারের এই প্রহসনে বাবুর পরিবার আর্থিক ও মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অপরাধী দারোগা ও বিচারকের বিরুদ্ধে কি চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি।

এই সময়কার পুলিশের কর্মকাণ্ড সারদা পুলিশ একাডেমীতে গত শতাব্দীর '৬০ এর দশকে পুলিশ-প্রশিক্ষকের কথিত নৈতিকতার দর্শন থেকেও দূরে সরে গেছে। পুলিশ এখন প্রায়শই কারণ অকারণে দেশের মানুষকে গ্রেফতার করে. মিথ্যা মামলা দায়ের করে, সাংবাদিক, রাজনীতিক, নারী সমাজকর্মী, শিশু-কিশোর, ছাত্র নির্যাতন করে, রাজনৈতিক প্রভুর আজ্ঞাবহ পেটোয়া বাহিনী হিসাবে কাজ করে। বিএনপি-জামাতের তল্পিবাহক হয়ে শাসক রাজনৈতিক শক্তির দলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থক ও কর্মীদিগকে যোগ দিতে চাপ সৃষ্টি করে, ক্রস-ফায়ারের মোড়কে বিনাবিচারে নাগরিকদের খুন করে, নির্বিচার চাঁদাবাজিতে স্ফীতোদর হয়। মানবিক মূল্যবোধ, সততা ও নৈতিকতা এদের অধিকাংশ কার্যক্রমে প্রতিভাত হয় না। প্রজাতন্ত্রে কর্মরত কর্মচারী হিসাবে এদের ভূমিকা জনগণের বিবেচনায় গুরুত্ব ও মর্যাদা বিহীন হয়ে গেছে। এদের সিনিয়র কর্মকর্তারা মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মানে জুনিয়র কর্মকর্তা ও সদস্যদের জন্য নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এককালের নাম কুড়ানো পুলিশ প্রধান কাজী আনোয়ারুল হক, মুসা আহমেদ ও আহমদ ইব্রাহিম প্রমুখ এদের অনৈতিক বেআইনী তৎপরতার কথা শুনলে লজ্জায় মাথা নত করে ফেলবে বলেই মনে হয়। আর বিচারক? ব্রিটিশ আমলে সেই ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার সুখ্যাত বিচারক পান্নালাল এমনকি জেলা বিচারক হিসাবে কয়েক বছর আগ

পর্যন্ত কৃতবিদ্যতায় সমুজ্জল গাজী শামসুর রহমান---যাদের দেয়া মামলার রায় ও অনুসৃত নীতি এখনও সদ্যনিযুক্ত বিচারকদের মডেল---তারা বেঁচে থাকলে একালের শামসুল আলম খান জাতীয় বিচারকের তৎপরতায় সকল সন্দেহের উর্ধে অধোবদন হতেন।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব-পুলিশদের মাঝে সততা, মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার আদর্শ উজ্জীবিত রাখতে সমর্থ হয়নি। যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধুর হত্যার অপরাধী ঘাতকদের বিদেশ থেকে আনার জন্য ইন্টারপোলের অপরাধীদের তালিকা থেকে তাদের প্রত্যাহার করে নেয়, ২০০৪-এর '২১ অগাষ্টের নির্মম রাজনৈতিক আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডকে প্রযোজিত করে বা প্রশ্রয় দেয় এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ গোষ্ঠীয় ক্যাডার নিরস্ত্র ও অসহায় জনতার প্রতিকূলে লেলিয়ে দেয়, তারা পুলিশ বাহিনীর কাছে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের নিরীখে অপরাধী বৈ অন্যকিছু নয়। এই অর্থবছরের বাজেটে পুলিশের জন্য প্রায় ১৮৭৭ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে। নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিবর্জিত পুলিশগণ সম্পদের এই মাত্রার প্রযুক্ত করণ বা ব্যয়ের যুক্তিসংগত দাবীদার হতে পারে কি? এই বিষয়ে আলাপচারিতায় নবীন, প্রবীণ ও অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারদের কথাঃ যদি পুলিশের রাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক চোরাচালানের আসামী হয়, রাজনৈতিক প্রভুত্ব পুলিশের গোলাবারুদ ও সাজসজ্জা কেনার প্রক্রিয়ায় চৌর্যবৃত্তিকে অনুসরণ করে, ঘুষ খেয়ে পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যদের চাকুরি পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণ করে, গোষ্ঠীগত স্বার্থে এই পাঁচ বছরে ৬ অতিরিক্ত আইজি, ১৯ ডিআইজি, ৫ অতিরিক্ত ডিআইজি, ৪০ এসপি, ২ এএসপি, ৪৫৮ এসআই এবং ৪৮৬ জন অন্যান্য পদবীর পুলিশ অফিসার ও সদস্যদিগকে চাকুরীচ্যুত করে, সন্তোষের উপকরণে ভেজা জেলা সমূহের এসপি'র পদ ও নিযুক্তি সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রয় করতে দ্বিধা না করে, থানার দারোগাদের কাছ থেকে মাসোহারা নিয়ে সন্তুষ্টি পায়, তাহলে পুলিশ জনগণের নিরাপত্তার সার্ভিস হিসাবে কাজ করতে পারে না। তাই অপরাধীদের কর্তৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনী জনসেবায় নিযুক্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে---এই আশা করা যায় না। এবং তাই পুলিশকে জনগণের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষণের সার্ভিস হিসাবে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এর উপরে প্রতিষ্ঠিত অশুভ ও অনৈতিক রাজনৈতিক প্রভূত্বের উৎখাত করতে হবে।

বিনাদোষে ফাঁসীর রায় প্রাপ্ত সেই শাহ আলম বাবুর কথায় আবার আসি।

আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার মোড়কে যে ঘৃণার্হ পুলিশ অফিসার ও বিচারক বিনাদোষে ফাঁসীর দণ্ডাদেশ দিয়ে দেশটিকে মগের মুল্লুকের পরিচিতি দিয়েছে (দ্রষ্টব্য, দৈনিক জনকণ্ঠ, সেপ্টেম্বর ২, ২০০৬), আইনের শাসন সংবলিত সভ্য সমাজের পরিচিতির সামান্যতম প্রতিফলক রক্ষা করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তীয় কঠোর শাস্তি মূলক পদক্ষেপ নেয়া অতীব জরুরি। দণ্ডবিধির ২১১ ধারায় বলা হয়েছে যে ব্যক্তি মিথ্যা অভিযোগে কারও বিরুদ্ধে তার ক্ষতি করার জন্য কোনো মিথ্যা মৃত্যুদণ্ড কিংবা আজীবন কারাদণ্ড সম্বলিত শাস্তির ফৌজাদারী মামলা দায়ের করে কিংবা অভিযোগ গঠন করে তার বিরুদ্ধে জরিমানা সহ ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে। এই অপরাধে দণ্ডনীয় সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার ও বিচারকের বিরুদ্ধে মামলা প্রযুক্ত করতে হলে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারা অনুযায়ী সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। প্রজাতন্ত্রের কর্মরত অফিসারদের উপর অশুভ ও অনৈতিক রাজনৈতিক প্রভুত্ব সংবলিত এই সরকার এই ধরণের অনুমোদন দেবে আশা করা যায় না। সুপ্রিম কোর্ট বিনাদোষে ফাঁসীর দণ্ডে দণ্ডিত করার প্রক্রিয়ায় যে পুলিশ অফিসার ও বিচারক সংশ্লিষ্ট ছিল তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২১১ ধারায় মামলা করার পদক্ষেপ নিতে সরকারকে নির্দেশ দিলে তাদের বিচারার্থে দণ্ডবিধির একই ধারা মোতাবেক মামলা রুজু করা যায়। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন উত্থাপন করলে তা তাদের ও সার্বিক ভাবে সমাজের লক্ষ্যানুগ এবং এই ৫ বছরের বর্বরতার আর এক কাহনের ক্লেদাক্ত দায় থেকে জাতির বিবেককে মুক্তি দিতে সহায়ক হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০০৬

দু'টি বিজ্ঞাপন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও টিএন্ডটি বোর্ড

১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির শিক্ষক ছিলাম। কোনো এক অদৃশ্য হাতের লীলায় তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়েছিলেন ঢাকা হাই কোর্টের তরুণ ও তখনও তেমন-না-জানা বিচারপতি হামুদুর রহমান। তখনকার পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াসের সম্মানার্থে শীতের এক সুন্দর বিকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দকে হাজির করেছিলেন উপাচার্য ভবনের সযত্নে রক্ষিত দেয়াল ঘেরা বিস্তৃত বাগানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকায় ভারী চা-কফির সমারোহে কর্নেলিয়াসকে বোঝান হয়েছিল হামুদুর রহমান আসলেই আঁতেল জ্ঞান সম্পন্ন প্রতিশ্রুতিবান বিচারপতি। এর কয়েকমাস পর ঢাকা হাই কোর্টের অপেক্ষাকৃত নবীণ বিচারপতি উর্দুভাষী হামুদুর রহমান লাহোরে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হলেন তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের লোক দেখানো প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। বিচারপতিত্বের কালের হিসাবে পরে হামুদুর রহমান পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। হামুদুর রহমানের যুক্তিমোড়া চমৎকার ইংরেজীতে লেখা কয়েকটি রায় পড়েছিলাম আমি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাক-সামরিক বাহিনীর ভূমিকা বিস্তৃত ও প্রায় পক্ষপাতবিহীন ভাবে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক সদস্যের কমিশন হিসাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন তিনি। এই পটে আইনে বুৎপত্তি সম্বলিত ভালো বিচারপতি হিসাবে হামুদুর রহমান দৃশ্যমান হলেও প্রায়শই তাকে ঘিরে মনে কাঁটা নিয়ে আসত এই ঘটনা। বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও শিক্ষকদের অনৈতিক ভাবে নিজের তরক্কীর জন্য ব্যবহার করেছিলেন হামুদুর রহমান। বিচার প্রক্রিয়ার বহুল স্বীকৃত সূত্রঃ উত্তম, নৈতিক ও আইনস্বীকৃত লক্ষ্য অধম, অনৈতিক ও বেআইনী পন্থায় অর্জন করা যায় না---বিচারপতি হামুদুর রহমান সকল সন্দেহের উর্ধে লংঘন

করেছিলেন। সাম্প্রতিক কালে তেমনি প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সংবিধান অনুযায়ী সরে যাওয়ার পর প্রায় ৫ বছর সরকারি বাড়ি বেআইনী ও অনৈতিক ভাবে ভোগ-দখলে রেখে এই সূত্র লংঘন করেছেন বিচারপতি লতিফুর রহমান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিচারপতি হামুদুর রহমান কর্তৃক এরূপ অনৈতিক ও বেআইনী ভাবে স্বীয় স্বার্থে ব্যবহারের কথা মনে এল যখন গত অগাষ্ট ১৭-এ দৈনিক যুগান্তরে দেখলাম একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনকার উপাচার্য ভবনের ২য় তলার খাবার ও বসবার কামরা এবং শিশুর শোবার ঘরে স্পিলিট এয়ার কুলার স্থাপন করার জন্য দরপত্র আহব্বান করা হয়েছে। এই দরপত্র দেখে ধারণা করা সংগত যে উপাচার্য ভবনের প্রধান শোবার ঘর সমূহে ইতোমধ্যে এয়ার কুলার স্থাপিত হয়েছে। দৃশ্যত এরূপ দরপত্র বিচার বিবেচনা করে এয়ার কুলার স্থাপন সংশ্লিষ্ট বিধি অনুগামী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যন্ত্রপাতি ও দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করণের প্রক্রিয়ায় বিধি অনুগমন ও নৈতিকতার প্রতিফলক। কিন্তু এই ধরণের সংগ্রহ করণের প্রক্রিযার পেছনে দু'টি প্রশ্ন সহজেই করা যায়। এক, উপাচার্য ভবনের ২য় তলার খাবার কামরা ও শিশুর শোবার ঘরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে স্পিলিট এয়ার কুলার স্থাপন করা নৈতিক ও বিধি সম্মত কি? দুই, উপাচার্যের নিয়ুক্তির শর্তাবলী কিংবা উপাচার্য হিসাবে তার প্রাধিকারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ও সংরক্ষিত বাসভবনের ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবহার্য কামরা গুলো (তার অফিস ও সংলগ্ন বসার কামরা ছাড়া) বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচায় শীতাতপ করার কথা উল্লেখিত কিনা? সংশ্লিষ্ট অফিসে খবর নিয়ে এই দুই প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক বলে জানা গেছে। উপাচার্য বা তার পর্যায়ের উপরের সরকারি কর্মকর্তাদের সরকার প্রদত্ত আবাসনে এই মাত্রার শীতাতপ দেয়ার প্রাধিকার নেই। আরও জানা গেছে যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনে কর্তৃপক্ষ ঘাটতি বাজেটের ভার নিয়ে চলছেন বছরের পর বছর, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ধার করে, এমনকি শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ভবিষ্যৎ তহবিল ও পেন্সন ফান্ড থেকে সময় বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্জ করে চলছে, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক স্থাপনা মুখ-থুবড়ে পড়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম মৌল কাজ, গবেষণার জন্য বরাদ্দ বাড়ানো যাচ্ছে না। শেখ হাসিনার শাসনামলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য ১৩০ কোটি টাকার যে ৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল সে সবের আওতায় উপাচার্য ভবনের এহেন শ্রী ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধির কোনো অবকাশ ছিল না (দ্রষ্টব্য, পরিকল্পনা কমিশন, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০০১-২০০২, পৃষ্ঠা-৩২৪-৩২৯)। পরবর্তী বছর

গুলোর উন্নয়ন কর্মসূচিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য নতুন কোনো প্রকল্প জোট সরকার গ্রহণ করেনি (দ্রষ্টব্য, পরিকল্পনা কমিশন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০০৪-২০০৫, পৃষ্ঠা-২৭৪-২৭৬)। একথা সুস্পষ্ট যে বিধি ও নৈতিকতার বেড়াজাল ডিংগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তথা জনগণের সম্পদের এই ধরণের ব্যবহার সর্বোচ্চ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার তমঘাধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান উপাচার্যের পর্যায় থেকে কিংবা তার মৌন সম্মতির ফলশ্রুতি হিসাবে এসেছে। যে ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রয়োজন অনুযায়ী বইপুস্তক সংগ্রহ করার অর্থাভাব রয়েছে, প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো যাচ্ছে না, সেখানে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় তথা জনগণের ব্যয়ে কি ভাবে এই ধরণের ব্যক্তিগত আয়াস ধর্মী পদক্ষেপ নেন? এক্ষেত্রে খালেদা-সাইফুরের এই আমলের দুর্নীতির বিস্তৃত ও অব্যাহত পটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও সুনীতিকে নিশ্চয়ই নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। উপাচার্যের দলীয় নিযুক্তি দলীয় আনুগত্যের প্রতিরক্ষণে তার সকল দুর্নীতিকে সরকারি তত্ত্বাবধানের দৃষ্টির বাইরে নিয়ে রেখেছে।

এবার আর এক বিজ্ঞাপনের কথায় আসি। সিটিসেল দেশের অন্যতম মোবাইল টেলিফোন কোম্পানি। এরশাদের আমলে শক্তির মদমত্ত নৈকট্যের বলে তারা একচ্ছত্র অনুমোদনের ভিত্তিতে এক্ষেত্রে প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা করেছে। শেখ হাসিনার শাসনামলে গ্রামীণ ফোন ও একটেলকে মোবাইল টেলিফোনের ক্ষেত্রে ব্যবসার অনুমোদন দেয়ার ফলে সিটি সেলের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং ফলত লাভের স্ফীতোদরতা কমে ছিল। একটেলের মুখ্য শেয়ার মালিক ও উদ্যোক্তা ছিলেন বিএনপি'র প্রয়াত নেতা জহির উদ্দীন খান। শেখ হাসিনার সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মত পার্থক্যের কারণে বৈষম্য মূলক সিদ্ধান্ত কখন নেয়নি। এ জন্য অনুমোদন পেয়ে একটেলের জহির উদ্দীন সম্ভবত খালেদা জিয়ার পহেলা মেয়াদের ওজারতির একপাক্ষিক বৈষম্যের বিপরীতে শেখ হাসিনার সরকারের অনুসৃত পক্ষপাতবিহীন অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতির আলোকে আমাকে বলেছিলেন, তিনি তাঁর দেশের ন্যায়নীতির উপর বিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। খালেদা-নিজামীর আমলে শক্তির মদমত্ত নৈকট্যে সিটি সেলের দপদপানি আবার বাড়তে শুরু করেছে। সিটি সেলের প্রায় অর্ধাংশের শেয়ার-মালিকানা এই আমলে সিংগাপুরের সিংটেলের কাছে বিক্রী করা হয়েছে। বিক্রয় লব্ধ ডলার দেশে এসেছে কিনা এবং বিক্রয়জনিত মূলধন লাভের উপর বাংলাদেশ সরকারকে আয়কর দেয়া হয়েছে কিনা তা এখনও

জানা যায়নি। এহেন সিটি সেল ডেইলি স্টার পত্রিকায় গত সেপ্টেম্বর ১০ তারিখে এক বিজ্ঞাপনে বলেছে যে তাদের ব্যবস্থাপনাধীনে টেলিযোগাযোগ চ্যানেল ০১২ এ ডায়াল করে সাশ্রয়ী মূল্যে বাংলাদেশের বাইরে ২৫টি দেশে সরাসরি ফোন করা যায়। এই সরকারের আমলের শুরুতে সরকারের টিএন্ডটি বোর্ড বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে ছিল যে তখন থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে টিএন্ডটির টেলিফোন লাইন থেকে ০১২ ডায়াল করে বিদেশে সংযোগ সাধন করা যাবে। এবং এই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাই হয়ে আসছিল। এই প্রেক্ষিতে ৩'টি প্রশ্ন জনস্বার্থের পটে উত্থাপনীয়। এক, টিএন্ডটি বোর্ডের এই চ্যানেল সিটি সেল কেমন করে আয়ত্ব করল? দুই, টিএন্ডটি বোর্ড কি গোপনে এই চ্যানেল সিটি সেলকে হস্তান্তর করেছে? করে থাকলে তাকি দরপত্রের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসাবে সিটি সেলকে দেয়া হয়েছে? এই দুর্ভাগা ও দুর্বৃত্তের জালে আবদ্ধ এই দেশে এই ৩'টি প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক বলে প্রতীয়মান। টিএন্ডটি বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে যে এক অদৃশ্য হাতের জোর ও কারসাজিতে বোর্ডের ০১২ চ্যানেলটি সিটি সেলের কাছে বিনা মূল্যে চলে গেছে। টেলি যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন টিএন্ডটি বোর্ডের এই চ্যানেলটি সিটি সেলকে হস্তান্তরের দুষ্কর্মটি সমাপন করেছে।

গত সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখে টিএন্ডটি বোর্ড থেকে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে এই বিষয়ে প্রতিবাদ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য, টিএন্ডটি বোর্ডের পত্র সংখ্যা এম(২)/১৭-১/২০০২ পার্ট-১/৫০ তারিখ ১২/৯/২০০৬)। এই পত্রে বলা হয়েছে যে সাশ্রয়ী রেটে ০১২ ডায়াল করে ২৫টি দেশে ফোন করার সুবিধা শুধুমাত্র টিএন্ডটি বোর্ডের গ্রাহকরাই পেয়ে এসেছিলেন। সিটি সেল মোবাইল ফোন থেকে ০১২ ডায়াল করে দেশের বাইরে ২৫টি দেশের কথা বলার সুবধিা টিএন্ডটি বোর্ড সিটি সেলকে কখনও দেয়নি। টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এই বিষয়ে এখনও কোনো জবাব দিতে পারেনি। এই সরকারের আমলের প্রথম দিকে সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরোবার সাথে সাথে সরকারের তখনকার সচিব ওমর ফারুক একুশে টিভির সম্প্রচার নিজ হাতে যন্ত্র খুলে বন্ধ করেছিলেন। সেই ধরণের ক্ষিপ্রতায় দীপ্তিমান এই ব্যক্তি এখন টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান। এক্ষেত্রে টিএন্ডটি বোর্ডের প্রতিবাদের বিপরীতে এখনও কোনো পদক্ষেপের অনুপস্থিতি তার তরফ হতে সিটি সেলের অনুকূলে সরব আনুকূল্যের আলো বহন করে চলছে। টিএন্ডটি বোর্ড তথা জনগণের প্রতিষ্ঠানকে লাটে তোলা গণসেবক হিসাবে তার

টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে মাসিক লক্ষাধিক টাকার মনসবদারীর দায়িত্ব কিংবা লক্ষ্য কি এই ধরণের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ তোষণ মূলক? ঢোলসহরত করে দুর্নীতি করার এই আরেক নজীর বিহীন নজীর।

শেখ হাসিনার শাসনামলে গৃহীত জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ১৯৯৮ অনুযায়ী সকল বিদেশী টেলিযোগাযোগ টিএন্ডটি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালনীয়। এই নীতি কেমন করে কাদের স্বার্থে লংঘন করা হলো? শেখ হাসিনার শাসনামলে টিএন্ডটি বোর্ড বিদেশে ফোন করার মাশুল হিসাবে বার্ষিক প্রায় ১৭০০ কোটি টাকা পেত। এর সবচেয়ে বড় অংশ টিএন্ডটি বোর্ডের লাভ হিসাবে রাষ্ট্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা হতো। এখন এই উৎস থেকে সরকারের প্রাপ্তি ৮০০ কোটি টাকার চেয়েও নিচে নেমে এসেছে। সাম্প্রতিক বছর গুলোতে বিদেশের সাথে টেলিযোগাযোগ বেড়ে চলেছে। এই বাড়া থেকে আসা বাড়তি আয় এখন কোথায় কাদের পকেটে যাচ্ছে?

টিএন্ডটি বোর্ডের বেশ কয়েকজন কর্মচারী এসেছিলেন কথা বলতে সেদিন। চাকুরীকালে একসময় আমি বোর্ডের খণ্ডকালীন পরিচালক হিসাবে কাজ করেছিলাম। তারা বললেন, হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ ও স্থাপনা সংবলিত এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কম লাভের দোহাই দিয়ে বেসরকারি করণের পাঁয়তারা করছে খালেদা-সাইফুরের এই দুর্নীতিবাজ সরকার। ২০০৬-২০০৭ অর্থবৎসরে টিএন্ডটি বোর্ডের অনুকূলে সরকার কর্তৃক প্রদানীয় উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ ৬৮৬ কোটি টাকা। ২০০৫-২০০৬ অর্থবৎসরের বোর্ডের এই বরাদ্দ হয়েছিল ৭০০ কোটি টাকারও বেশি (দ্রষ্টব্য, বাৎসরিক বাজেট ২০০৬-২০০৭ অর্থমন্ত্রণালয়, মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবীসমূহ, পৃষ্ঠা-২০৩)। গোপনে সিংগাপুরের সিংটেলের সাথে সিটি সেল বা দেশী এজেন্টের সাথে কথাবার্তা চলছে বলে শোনা যাচ্ছে। জানা গেছে সিটি সেল তাদের বিদেশী সহযোগী সিংটেল ও টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন লাভজনক রাষ্ট্রীয় সংস্থা টিএন্ডটি বোর্ডকে কোম্পানিতে রূপান্তর করে বেসরকারিকরণের এই অপচেষ্টার সারথী হয়ে কাজ করছে। ১৯৫০ এর দশকে তখনকার শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন তথা জনগণের বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত কর্ণফুলী কাগজের কল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এককালের রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক গোলাম ফারুক কর্তৃক গোপনে দাউদ গোষ্ঠীর মালিকানায় হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া নাকি এখন টিএন্ডটি বোর্ডের বেসরকারিকরণে অনুসরণ করা হবে। সেকালে দাউদ গোষ্ঠীকে কর্ণফুলী কাগজের কল গোপনে বাজার দরের চেয়ে অনেক কম মূল্যে তুলে দেয়ার পর

পরই রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক গোলাম ফারুককে তখনকার শোষক-শাসকরা চার মরতবার পদোন্নয়ন দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিল। এখনকার টিএন্ডটি বোর্ড ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরের দৃশ্যমান কুশলীকে কি তোহফা বা মুনাফা দেয়া হবে তা এখনও জানা যায়নি। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আমিনুল হক এক্ষেত্রে কোনো বাক ও বিবেকের স্বাধীনতার স্ফুরণ দেখাতে এখনও সমর্থ হননি। দেশবাসীকে সচেতন থাকতে হবে এই ধরণের দুর্নীতি মূলক বেসরকারিকরণের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে। বিজ্ঞাপন দিয়ে বা ঢোল সহরত করে দুর্নীতি করার এই অশুভ চক্রের মুখোশ উম্মোচন ও প্রতিরোধ করার এই হবে জনতার আরও এক সংগ্রাম।

দৈনিক জনকণ্ঠ, অক্টোবর ১০, ২০০৬

চোরের মা'র বড় গলা ঃ খালেদার দুর্নীতি সংক্রান্ত শ্বেতপত্র

খালেদা-নিজামীর জোট সরকার দুর্নীতি সংক্রান্ত এক শ্বেতপত্র (১ম খণ্ড) প্রকাশ করে ২০০২ এর জানুয়ারিতে। এই শ্বেতপত্রের প্রকাশক হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে দেখান হয়। শ্বেতপত্র প্রণয়নকারীদের প্রধান হিসাবে কাজ করেন সাবেক সচিব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। ইনি মুসলিম লীগ ঘরানার লোক, পাক আমলের পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য সচিব ও জিয়াউর রহমানের মন্ত্রী সভার সদস্য সফিউল আজমের ভায়রা ভাই। তার মামা প্রয়াত বদরে আলম যশোর জেলার তখনকার মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। এরশাদের আমলে মনিরুজ্জামান ক্রমান্বয়ে জ্বালানী ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। কথিত দুর্নীতি মূলক অনিয়মের কারণে এরশাদও তাকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিলেন। সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) এসোসিয়েশনের হস্তক্ষেপ ও মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছা প্রণোদিত অবসরে যেয়ে নিজকে সে সময়ে রক্ষা করেছিলেন। তখন এই এসোসিয়েশনের মহাসচিব হিসাবে আমি দায়িত্বাধীন ছিলাম এবং এরূপ মধ্যস্থতায় সহায়তা করেছিলাম। দুর্নীতির এই শ্বেতপত্র প্রণয়নে তার দোসর ছিলেন আরও দুই সাবেক আমলা, নামতঃ অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব আব্দুল কাদের ও নুরুজ্জামান। এদের মধ্যে কাদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় ছাত্র হিসাবে পেয়েছিলাম আমি। অর্থনীতিতে এম এ পাশ করে তিনি পরিকল্পনা কমিশনে গবেষণা অফিসার হিসাবে চাকুরিতে যোগ দেন ১৯৬০ এর দশকে। পরে পরিকল্পনা কমিশন থেকে খালেদা জিয়ার ১ম শাসনামলে উপসচিব হিসাবে পদোন্নয়ন পান। শেখ হাসিনার শাসনামলে তিনি যুগ্ম ও অতিরিক্ত সচিব হিসাবে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে অবসরে যান। বড় শখ ছিল তার সচিব

হওয়ার। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে তা আর হয়ে উঠেনি। তার ভায়রা ভাই ছিলেন খালেদার প্রথম শাসনামলের সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক। এ ভাবে মন্ত্রী হওয়ার আগে নুরুল হক নারায়ণগঞ্জে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কাদেরের পরিকল্পনা কমিশন থেকে উপসচিব হিসাবে ভাগ্য পরিবর্তনে নুরুল হুদার অবদান ছিল বেশ। বছর খানেক আগে মারা গেছেন কাদের। তৃতীয় দোসর নুরুজ্জামান এককালে যশোরে জেলা প্রশাসক ছিলেন, পরে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার হয়েছিলেন এবং সেই সুবাদে ১৯৯০-এর দশকের ১ম ভাগে সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) এসোসিয়েশনের যুগ্মসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যশোরে জেলা প্রশাসক পদে তার থাকাকালীন সময়ে তাকে এক সন্ধ্যায় মনিহার সিনেমা হলে পাকিস্তানের মেহেদী হাসানের গজল মাহফিলে দেরীতে আসা তখনকার যশোরস্থ সেনা কমান্ডার ও তার পরিবার পরিজনকে সাধারণ দর্শকদের নিজ হাতে ঠেলে সরিয়ে স্থান দিতে দেখে হতবাক হয়েছিলাম আমি। এরশাদের পতনের পর অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনে সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) এসোসিয়েশনের তরফ হতে সকল রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদিগকে নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালনের আহব্বান জানিয়েছিলাম যখন আমি তখন এই ব্যক্তি পাল্টা বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন ঐ আহব্বান সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) এসোসিয়েশনের আহব্বান নয়। গোষ্ঠীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মিথ্যা অভিযোগ সংকলন করার জন্য এদের চেয়ে খয়ের খা অফিসার হয়ত আর পাওয়া যেত না। জোট সরকারের সন্তুষ্টি ও স্বার্থ সাধনে শ্বেতপত্র লেখার জন্য পারিতোষিক হিসাবে মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামানকে শেষ বয়সে ফিলিপিন্সে রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, আর কাদেরকে অবসরে যাওয়া কালীন সময়ে প্রগতি ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে জোর করে সচিব হিসাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। শোনা যায় মোহাম্মদ নুরুজ্জামানও প্রভু সেবার জন্য সন্তোষের উপকরণ হিসাবে গুলশান বা বনানীতে প্লট কিংবা এসব এলাকায় গোপনে সরকারি বাড়ি নাম মাত্র দামে কেনার সুযোগ পেয়েছিলেন। এছাড়া রংপুরে একটি অসরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় সহায়তা দেয়া হয়েছে তাকে। এদের পাওয়া এহেন পারিতোষিক 'দুর্নীতির' উপকরণ কিংবা প্রতিফলন হিসাবে এদের কাছে নিশ্চয়ই প্রতিভাত হয়নি।

শ্বেতপত্রের ১ম খণ্ডে ২১টি খাত/উপখাত বা শিরোনামে ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ আমলে তথাকথিত ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। শ্বেতপত্রের ২য় খণ্ডে আরও কিছু কথিত অনিয়ম ও দুর্নীতির কল্প কথা বা কিসসা ছাপা হয়েছে। সে গুলোকে সুনির্দিষ্ট

অভিযোগ হিসাবে ধরা যায় না। শ্বেতপত্রের ১ম খণ্ডে উল্লেখিত কথিত অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা গুলো খালেদার সরকারের গোষ্ঠীয় প্রচারে গুরুত্ব পেয়েছে। সে জন্য শ্বেতপত্রের ১ম খণ্ডটিতে উল্লেখিত সব গুলো কেস এই নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। বলা প্রয়োজন এই শ্বেতপত্রে উল্লেখিত ২১টি খাত বা উপখাতে কোনো ভাবেই দুর্নীতির উপকরণ সন্দেহের উর্ধে প্রতিষ্ঠিত করতে উল্লেখিত ৩ শ্বেতপত্রীরা সক্ষম হননি। শ্বেতপত্রের ক্রম অনুযায়ী এই ২১টি খাত/উপখাত বা শিরোনামে উল্লেখিত অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ও সারবত্ত্বাহীনতার নির্যাস তাই জনসাধারণের অনুধাবন ও বিচারের জন্য উপস্থাপনীয়।

(১) 'বিভিন্ন জেলায় ২ লক্ষ ১৬ হাজার টেলিফোন লাইন স্থাপন', বিষয়ে শ্বেতপত্রের বক্তব্যঃ প্রকল্পটি আওয়ামী লীগ সরকার হার্ডটার্ম লোন কমিটিতে না পাঠিয়ে অর্থ ও অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীসভা কমিটি দিয়ে প্রকল্পটির জন্য চীনের সিএমইসি থেকে সরবরাহকারীর ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়াজাত করেন (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯)। এক্ষেত্রে সরকারের নগদ অর্থের স্বল্পতা সত্ত্বেও পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে ২১৩ মিলিয়ন ডলার পরিমাণ ১২ বৎসরে পরিশোধনীয় ঋণ ৩.২৫% বার্ষিক সুদে এনে বিভিন্ন জেলায় স্বল্পতম সময়ে টেলিফোন লাইন স্থাপনের সুফল শ্বেতপত্রে স্থান পায়নি। শ্বেতপত্রে একথাও উল্লেখিত হয়নি যে খালেদা জিয়ার আগের শাসনামলে ১৯৯৭ সালের ৩০শে মে চীনের সাথে সইকৃত সমঝোতা স্মারকের আলোকে আলোচনা ও দরকষাকষি করে শেখ হাসিনার শাসনামলে এই চুক্তিটি সম্পাদন করা হয়েছিল।

(২) 'বাংলাদেশ-সিংগাপুর সাবমেরিন প্রকল্প', বিষয়ে শ্বেতপত্রে বলা হয় যে ৮১২ কোটি টাকা পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা সহ ৯২১ কোটি টাকায় ২০০০ সালের ২৯ অগাষ্ট একনেকে অনুমোদিত এই প্রকল্পটি অযাচিত অর্থায়ন ও নির্মাণ প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে আর্থিক অনিয়ম সত্ত্বেও গ্রহণ করা হয় (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩-২৭)। শেখ হাসিনার সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে এই প্রকল্পে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ঘটেনি বলে শ্বেতপত্রীরা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে দুর্নীতির কোনো উপকরণ শ্বেতপত্রের ঐসব প্রণেতারাও খুঁজে পাননি। পরবর্তীকালে খালেদা-সাইফুর গংরা অবশ্য শেখ হাসিনার সময়ে অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের দেড় গুণ বেশি ব্যয়ে প্রকল্পটি অযাচিত দরপত্র ও আলোচনার সূত্র অনুসরণ করে অসম্পূর্ণ অবয়বে বাস্তাবায়িত করে বলে জানা গেছে।

(৩) 'ঢাকায় দুই লক্ষ পিএইচএস টেলিফোন স্থাপন', প্রকল্পে অনিয়ম হিসাবে শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয় যে তখনকার টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বিটিটিটি প্রাঃ লিঃ নামক এক কোম্পানিকে জাপানে উদ্ভাবিত শ্বেতপত্রীদের ভাষ্য অনুযায়ী পুরানো প্রযুক্তি সংবলিত পিএইএস ব্যবস্থার টেলিযোগাযোগ স্থাপন করার অনুমোদন দেয় (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭-৩৮)। শ্বেতপত্রীরা প্রকারন্তরে বলতে চেয়েছেন যে এইরূপ অনুমোদনের ফলে একটি পুরানো প্রযুক্তি গ্রাহকদের জন্য আনার চেষ্টা করা হয়। একটি বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক ব্যবহার্য প্রযুক্তি গ্রাহকরা গ্রহণ করবেন না করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রাহকদের এবং দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের। এক্ষেত্রে ঐ কোম্পানিকে বিনিয়োগ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দেয়া কোনো হিসাবেই দুর্নীতি মূলক হতে পারে না। উল্লেখ্য, একই সময়ে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় গ্রামীণ ফোন, একটেল প্রমুখ বেসরকারি কোম্পানিদিগকে ভিন্নতর প্রযুক্তি সংবলিত মোবাইল ফোন স্থাপন করার অনুমোদন দেয়।

(৪) 'ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পুনর্বাসন ও আধুনিকরণ প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতি', বিষয়ে এই শ্বেতপত্রে বলা হয় যে ঘোড়াশালে রাশিয়ার টেকনোপ্রম এক্সপোর্ট নামক কোম্পানি কর্তৃক স্থাপিত ১১০ মেঃ ওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা বিশিষ্ট উৎপাদন কেন্দ্রটির পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ বিষয়ে একই সংস্থাকে ১১৮ কোটি টাকার সরবরাহ ও কার্যাদেশ দেয়ায় অনিয়ম ঘটেছে। এই অনিয়ম উৎঘাটনের জন্য বিস্তারিত তদন্ত হওয়া আবশ্যক বলে (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬) শ্বেতপত্রীরা উল্লেখ করেছেন। শ্বেতপত্রে একথা উল্লেখিত হয়নি যে টেকনোপ্রম একসপোর্ট কর্তৃক পূর্বে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ভিন্নতর কোনো সংস্থা কর্তৃক যথা ইপ্সিত অবয়বে পুনর্বাসন করা কঠিন বা মিতব্যয়ী মাত্রায় অসম্ভব ছিল। উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে বিদ্যুৎ খাতে ১৫০০০ কোটি টাকা ব্যয় দেখিয়ে তার অর্ধেক খালেদা পুত্র তারেকের মালিকাধীন কোম্পানি হতে খুটি কেনার অবয়বে তসরুফ করে এবং দেশব্যাপি বিদ্যুতের অভাব ঘটিয়ে খালেদা-সাইফুর গং অনিয়ম ও দুর্নীতির ধ্রুপদী উদাহরণ জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন।

(৫) 'ভোলায় ২০ মেঃ ওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতি', শিরোনামে এই শ্বেতপত্রে বলা হয় যে আওয়ামী লীগ আমলে এই

প্রকল্প বাস্তবায়নে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যথার্থ সংখ্যায় টেন্ডারদাতা না পাওয়া সত্ত্বেও এক চীনা সরবরাহ ও স্থাপনকারী কর্তৃক দেয়া টেন্ডার সরকারি ক্রয় কমিটিতে উত্থাপিত করা হয়। ক্রয় কমিটি পরবর্তী সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংগত হবে বলে মত প্রকাশ করে (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭২)। এই প্রক্রিয়ায় কোথায় দুর্নীতি হয়েছিল তা শ্বেতপত্রে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এই প্রসংগে উল্লেখ ও স্মরণ করা প্রয়োজন, পরবর্তী ৫ বছরেও খালেদা-সাইফুর গং এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কিংবা ভোলা জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানোর জন্য কোনো ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হননি।

(৬) 'হরিপুরে ৩৬০ মেঃ ওয়াট বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি থেকে অতিরিক্ত মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয়', বিষয়ে কল্পকথা বলার পর শ্বেতপত্রের বলা হয় যে সরকারের উপযুক্ত সংস্থা দিয়ে বিষয়টি বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা যেতে পারে (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৩)। বস্তুত এসএইএস কর্তৃক স্থাপিত এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। খালেদা-সাইফুর গোষ্ঠী কোনো তদন্তের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি বের করতে পারেননি। বরং তারা তাদের মেয়াদ শেষের আগে তড়িঘড়ি করে এসএইএসকে প্রদানীয় দামের চেয়ে অনেক বেশি দামে বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপনীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ কেনার প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করে দুর্নীতির আর এক নজরকাড়া উদাহরণ রেখে গেছেন।

(৭) 'শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয় খুলনায় ২১০ মেঃ ওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্প', রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে বাতিল হয়ে যায় (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৪)। এতে দুর্নীতির কোনো ছাপ সনাক্ত করতে শ্বেতপত্রের প্রণেতারা ব্যর্থ হয়েছেন। বলা প্রয়োজন, খালেদা-সাইফুর গোষ্ঠী পরবর্তী ৫ বছরেও প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়নি। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে জোট সরকারের আমর্জনীয় ব্যর্থতার পটে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ হাস্যকর বালখিল্যতা ছাড়া কিছু নয়।

(৮) 'সিদ্ধিরগঞ্জ ২১০ মেঃ ওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট) নির্মাণ প্রকল্পে ঠিকাদার নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব ও অনিয়ম', শিরোনামে শ্বেতপত্রে বলা হয় যে ১ম ইউনিটের স্থাপনকারী রাশিয়ান সংস্থা টিপিইকে ঠিকাদার

হিসাবে নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় প্রকল্পটির সরবরাহ ও নির্মাণ কাজের মূল্য কমানোর চেষ্টা করা হয়নি (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৫)। শ্বেতপত্রে বলা হয় যে তখনকার আওয়ামী লীগ সরকার তাদের মেয়াদকালের শেষ ৩ মাসে প্রকল্পটি গ্রহণের জন্য মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ না করে বিনা টেন্ডারে অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত দর চূড়ান্ত করার জন্য তৎপর ছিল। শ্বেতপত্রে অবশ্য বলা হয়নি যে রাশিয়া থেকে সকল নির্মাণ ও সরবরাহ প্রকল্পের যন্ত্রাদি ও দাম সরকারি পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে এদেশে এসেছিল। উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে খালেদা-সাইফুর গং এভাবে নির্ধারিত প্রকল্প ব্যয় অনুযায়ীই এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছিলেন এবং এই প্রকল্পে তাদের আমলে ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ আওয়ামী লীগ আমলে নির্ধারিত ব্যয়ের চেয়ে বেশিই হয়েছিল।

(৯) 'মেঘনা ঘাট পাওয়ার প্লান্টে মাটি ভরাট কজে অনিয়ম', এই শিরোনামে শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয় যে এই ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে চীনের একটি প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক অনুমোদন নিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপণ করতে পারেনি। ফলত মেঘনা ঘাটে এএইসের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে বিলম্ব ঘটে এবং বিলম্বের জন্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডেকে ৪.৫ মিলিয়ন ডলার ও ৬.৭২ কোটি টাকা সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৭-১৮১)। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই তদন্তের মাধ্যমে প্রকল্পের অন্যতম অর্থায়নকারী এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের উপর দায়িত্ব নিরুপণ করা হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়োজিত উপদেষ্টার কাজের উৎকর্ষ কিংবা সময়বদ্ধতার বিষয়ে তখনকার সরকারের এই ক্ষেত্রে করণীয় ভিন্নতর কোনো কিছু ছিল কিনা তা শ্বেতপত্রীরা সনাক্ত করতে পারেননি।

(১০) 'ভারত হতে খাদ্য শস্য আমদানীকালে সরকারের আর্থিক ক্ষতি', শিরোনামে শ্বেতপত্রে এমভি জিংঈ, এমভি কুমুদি, এমভি হানিফ, এমভি আরডিয়েল ও এমভি কিংডং নামের ৫টি জাহাজে করে আমাদানীকৃত খাদ্য শস্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার বা খালাস না করণে উদ্ভুত লোকসানের কথা উল্লেখ করা হয় (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০২-২১১)। সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে এই সব অভিযোগ ধোপে টিকে না। এমভি জিংঈ এর পরিবহনে

বিফলতার ক্ষেত্রে তখনকার খাদ্য মন্ত্রণালয় আইনী পদক্ষেপ নিয়েছে, সরবরাহকারীর ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি নগদায়ন করেছে। এমভি কুমুদীকে পণ্য খালাসকরণ সম্পর্কিত অপারগতার কারণে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের হেফাজতে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আটকে রাখা হয়। এমভি হাফিনা কর্তৃক আনীত খাদ্য শস্য খালাস না করণের জন্য এর আগে পরিশোধিত অর্থ আদায় করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক অগ্রণী ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেয়। এমভি কিংডং নির্ধারিত সময়ে চাল জাহাজকিরণ না করায় তখনকার খাদ্য মন্ত্রণালয় এই জাহাজে আমদানীকৃত চাল গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এই জাহাজে আনীত চাল একটি প্রাইভেট কোম্পানিকে বিক্রয় করার প্রক্রিয়ায় সিএন্ডএফ চার্জ ও ভ্যাট বাবদ দায়ভার বহনের বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং এই বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় ও এটর্নী জেন্নারেলের পরস্পর বিরোধী অবস্থানের জন্য আর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়নি। এমভি হানিফ পরিবহিত চালের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এই সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতির কোনো আলামত শ্বেতপত্রের প্রণেতারাও খুঁজে পাননি।

(১১) 'অভ্যন্তরীণ খাদ্য শস্য ক্রয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি', শিরোনামে শ্বেতপত্রে মূলত বলা হয়েছে যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ থাকা সত্ত্বেও ৩ লক্ষ টন অতিরিক্ত চাল তখনকার সরকার সংগ্রহ করে (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১২-২২৪)। এই প্রক্রিয়ায় দেশে চালের মূল্য স্থিতিশীল রেখে চাষিদের স্বার্থ রক্ষাকরণ এবং বিদেশ থেকে আপতকালীন প্রয়োজন মিটানোর জন্য আমদানী কমানোর যে পদক্ষেপ নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার দেশ বিদেশে প্রশংসিত হয়েছিল তা শ্বেতপত্রের প্রণেতারা মুখে কুলুপ এটে তাদের প্রভূদের তুষ্টির জন্য লেখনী প্রযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তী কালে খালেদা-সাইফুরের সরকার খাদ্য শস্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় যে পাহাড় প্রমাণ কারচুপি ও দুর্নীতির আশ্রয় নেবে তা শ্বেতপত্রের এই তিন ভাড়াটে লেখকরাও আঁচ করতে পারেননি।

(১২) 'সমুদ্র বন্দরে খাদ্য শস্য খালাসে অনিয়ম ও সরকারি ক্ষতি', শিরোনামে শ্বেতপত্রে এক হাস্যকর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। বলা হয় আওয়ামী লীগ সরকার নিয়ম অনুযায়ী সরকারি খাদ্য শস্যবাহী জাহাজের ৬০% চট্টগ্রাম ও ৪০% মংলা বন্দর দিয়ে খালাস করেনি। বরং ৬০% এর চেয়ে বেশি

খাদ্য শস্য চট্টগ্রাম বন্দরে খালাস করেছে। ফলত খাদ্য শস্য পরিবহন ও গুদামজাত করনে বিলম্ব হয়েছে (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৫-২৩০)। শ্বেতপত্রের প্রণেতারা তাদের প্রভুদের তুষ্টি সাধনে তাদের সুবিধা অনুযায়ী ভুলে গিয়েছিলেন যে মংলা বন্দর আসলে একটি এংকোরেজ, এতে শস্যাদি গুদামজাত করণের কোনো ব্যবস্থা নেই এবং এর সাথে দেশের অভ্যন্তরের প্রত্যক্ষ রেল ও সড়ক এখনও স্থাপিত হয়নি। তখন এই বন্দর পূর্ণাঙ্গ ভাবে কার্যক্ষম ছিল না, এখনও নেই। তাই মংলা বন্দর দিয়ে ৪০% খাদ্য শাস্যবাহী জাহাজ না আনয়নে দেশের স্বার্থ লংঘিত হয়েছে কোনো হিসাবেই তা বলা চলে না। বরং চট্রগ্রাম দিয়ে আমদানীকৃত খাদ্য শস্য দ্রুত খালাস করে আওয়ামী লীগ সরকার খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছিল।

(১৩) 'খাদ্যশস্য পরিবহনে অনিয়ম ও দুর্নীতির', বিষয়ে শ্বেতপত্রে বলা হয় যে আপতকালীন মজুদের প্রয়োজন মেটাতে দেশের বিভিন্ন গুদামে খাদ্য শস্য অযথা স্থানান্তর করা হয়েছে (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩০-২৪৩)। শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত যে দ্রুততা ও নিপুণতার সাথে দেশের সকল স্থানে খাদ্য শস্যের সম্ভাব্য চাহিদা মিটিয়েছে তার আলোকে এই ধরণের কথা উদ্দেশ্য মূলক মিথ্যাচার ছাড়া অন্যকিছু নয়।

(১৪) 'খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগে গুরুতর অনিয়ম', শিরোনামে শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয় যে আবেদনপত্রের সঠিকতার অভাব, নিয়োগ কমিটি গঠনে অস্বচ্ছতা, পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণে ত্রুটি ও মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা লংঘন ইত্যাদির মাধ্যমে ঐ অধিদপ্তরে খাদ্য পরিদর্শক হতে গাড়ি চালক নিযুক্তিতে অনিয়ম করা হয়েছে। পরবর্তীকালে খালেদার সরকারের আমলে সকল পদের নিযুক্তি নীলামে সর্বোচ্চ দরদাতা দিয়ে পূরণের একমাত্র নীতি প্রযুক্ত করণ বিষয়ে শ্বেতপত্রে কোনো প্রাকভাষ দেয়া হয়নি। বস্তুত এ বিষয়ে উল্লেখিত তেমন কোনো অনিয়মের অভিযোগের সত্যতা খালেদা কর্তৃক নিযুক্ত এই ৩ ভাড়াটে লেখকরা প্রমাণ করতে পারেননি।

(১৫) 'সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটে ২টি ডেএপি সার কারখানা স্থাপনে অনিয়ম ও দুর্নীতি'র, বিষয়ে (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৫-২৬৫) শ্বেতপত্রে অভিযোগ করা হয় যে তখনকার কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের সরকারের কাছে

২০০০ কোটি টাকার সুদাআসলে দেনা থাকা সত্ত্বেও জনস্বার্থ লংঘন করে অধিকতর মূল্যে এ দু'টি সার কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিল আওয়ামী লীগ সরকার। পরে খালেদা-নিজামীর জোট সরকার নিদারুণ সার সংকটের সামনে এ দু'টি কারখানাই প্রায় দেড় গুণ অধিকতর মূল্যে এবং ব্যয় বহুল বিলম্ব ঘটিয়ে একই উৎসের সাপলায়ার্স ক্রেডিটেই বাস্তবায়িত করে (দ্রষ্টব্য, Graft Changes Colour ডেইলি স্টার, নভেম্বর ৯, ২০০৬)। নীতির ক্ষেত্রে দ্বিমুখী মানদণ্ড অনুসরনের এ হয়েছে জোট সরকারের এক ঘৃণার্হ দৃষ্টান্ত।

(১৬) 'বিটিএমসির সম্পত্তি হস্তান্তরে দুর্নীতি', শিরোনামে শ্বেতপত্রীরা কর্পোরেশনের কতিপয় মিলের খালি জায়গা বিক্রী, দোকান ও অফিস ইমারতের প্রবেশ পথ ভাড়া দেয়া ইত্যাদিতে অনিয়ম বা দুর্নীতির ঘটনা সন্দেহাতীত ভাবে উন্মোচন করতে সক্ষম হননি (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮২-২৯০)। পরবর্তীকালে বিটিএমসির কারখানা, জমি ও সম্পত্তি খালেদা-নিজামী গং বিনা টেন্ডারে কিংবা গোপণে স্থায়ী ভাবে নিজস্ব লোকদের কাছে ইজারা দিয়ে বা হস্তান্তর করে দুর্নীতির যে পরকাষ্ঠা দেখিয়েছে তা সংশ্লিষ্ট সকলের জানা। সম্ভবত পরবর্তীকালের এই সব ঘৃনার্হ কার্যক্রম পরিকল্পিত ভাবে হাতে নেয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে খালেদা-নিজামী গংরা আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে এইসব অসত্য অভিযোগ আগ থেকেই আনা বেহতর মনে করেছে।

(১৭) 'বিজেএমসির মালিকাধীন করীম কমার্শিয়াল', এর সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে শ্বেতপত্রীরা উল্লেখ করেছেন যে সম্পত্তিটি ১০ বার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রয় করে আওয়ামী লীগ আমলের পাট মন্ত্রী অনিয়ম ও দুর্নীতি করেছেন (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০১-৩১৫)। ১০ বার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে সম্পত্তি বিক্রয় কি বিবেচনায় দুর্নীতি মূলক হয় তা শ্বেতপত্রে বিশ্লেষণ করা হয়নি। নিঃসন্দেহে এই ধরণের অভিযোগ হাস্যকর ও উদ্দেশ্য মূলক। এই ভাবে কর্পোরেশনের সম্পত্তি বিক্রয়ের বিপরীতে পরবর্তীকালে গোপনে কিংবা অখ্যাত সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জোট সরকার কর্তৃক গুলশান বা বনানী এলকায় সরকারের ও রাজউকের বাড়িগুলো নাম মাত্র মূল্যে দলীয় ব্যক্তিদের কাছে বিক্রয় ও হস্তান্তরের ঘটনাগুলো সর্বজন বিদিত দুর্নীতির জ্বলজ্বলে উদাহরণ।

(১৮) 'মধ্যপাড়া কঠিন শিল্প প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম', শিরোনামে শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয় যে আওয়ামী লীগ যথা সময়ে কাজ সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও এই প্রকল্পের উত্তর কোরীয় ঠিকাদারের পাওনার ৫ম কিস্তির অর্থ শোধ করে (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১৬-৩৪২)। শ্বেতপত্রে অবশ্য একথা উল্লেখ করা হয়নি যে ১৯৯৪ সালে খালেদা জিয়ার ১ম শাসনামলে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তৎকালীন বিএনপি সরকার এই বিষয়ে উত্তর কোরীয় ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করেছিল এবং আওয়ামী লীগ আমলে ঐ চুক্তি অনুযায়ীই তাদেরকে দেয় ৫ম কিস্তির অর্থ শোধ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, খালেদা-সাইফুর গং তাদের ২য় শাসনামলেও ১৯৯৪ সালে তাদেরকৃত এই অসম চুক্তি অনুযায়ী উত্তর কোরীয় ঠিকাদারদের দেয় অর্থ উৎসাহের সাথে শোধ করে এসেছে।

(১৯) 'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ড্রেজার ক্রয়ে গুরুতর অনিয়ম', প্রসঙ্গে শ্বেতপত্রীরা অভিযোগ করেন যে আওয়ামী লীগ আমলে নেদারল্যান্ড কর্তৃক ওরেন্ট কার্যক্রমের আওতায় আংশিক অর্থায়নের ভিত্তিতে উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহব্বান না করে পানি উন্নয়ন বোর্ড দু'টি ড্রেজার সংগ্রহ করে (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪০-৩৬৫)। নেদারল্যান্ড কর্তৃক ওরেট কার্যক্রমের আওতায় সংগ্রহতীব্য ড্রেজার ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের ভিত্তিতে কিভাবে নেদারল্যান্ড সরকারের অনুমোদন ছাড়া ২টি ড্রেজার আমদানী করা যেত তা শ্বেতপত্রীরা অবশ্য খতিয়ে দেখেননি। উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে খালেদা-সাইফুরের ক্রেপ্টক্রেসির আওতায় তাদের নৌপরিবহন মন্ত্রী কর্নেল আকবর হোসেন জাহাজ ও ড্রেজার সংগ্রহ করণ প্রক্রিয়ায় কি মাত্রায় দুর্নীতি করেছিলেন সে বিষয়ে খোদ নেদারল্যান্ড সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ে অভিযোগ হয়েছিল। ড্রেজার সংগ্রহ করণের প্রক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কোনো অভিযোগ দায়েরের অবকাশ নেদারল্যান্ড সরকার পায়নি। উল্লেখ্য, ওরেট কার্যক্রমের আওতায় ড্রেজার বা অন্যসব সামগ্রী আহরণ প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন নেদারল্যান্ডস্ সরকার দিয়ে থাকেন।

(২০) 'পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পূর্বে চাকুরীচ্যুত ১৬৮৯ জন প্রকল্পের কর্মচারীকে বিধিবর্হির্ভূত ভাবে পুর্ননিয়োগ', বিষয়ে শ্বেতপত্রে অভিযোগ করা হয় যে আওয়ামী লীগ আমলে এই প্রক্রিয়ায় সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি

নেয়া হয়নি (শ্বেতপত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭১)। অভিযোগটি ভিত্তিহীন ও হাস্যকর। শ্বেতপত্রীরা সম্ভবত জানতেন না যে তাদের প্রভুরা পরবর্তীকালে পুলিশ হতে শিক্ষক পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে নিয়ুক্তির মৌল ভিত্তি হিসাবে ঘুষ প্রাপ্তিকে সোচ্চারিত অবয়বে গ্রহণ ও অনুসরণ করবেন। যদি জানতেন তাহলে এই ধরণের হাস্য ও বিভ্রান্তিকর অভিযোগ করতে তারাও লজ্জা বোধ করতেন।

(২১) 'পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অগ্রিম অর্থব্যয়ের মাধ্যমে গুরুতর প্রশাসনিক ও আর্থিক অনিয়ম', শিরোনামে উল্লেখ করা হয় যে এই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৯-২০০০ ও ২০০০-২০০১ সালে সর্বমোট ৩১০ কোটি টাকা আগাম বরাদ্দ করা হয়েছিল। আগাম বরাদ্দ করণ মেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুত কাজ করার জন্য একটি সহায়কী পদক্ষেপ, কোনো হিসাবেই তহবিল তসরুফের সামিল নয়। নদী ভাঙ্গন, তীর সংরক্ষণ, সেচ স্থাপনা রক্ষাকরণ ইত্যাদি খাতে এই ধরণের বরাদ্দ করণ অতীব প্রয়োজনীয়। এই ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কোনো অনিয়ম করেছেন বলে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বলা যায় না।

দুর্নীতির বিষয়ে খালেদা সরকারের শ্বেতপত্রের ১ম খণ্ডে উল্লেখিত এই ২১টি দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগের মধ্যে একটিও সারবত্তা সংবলিত নয়। এর মধ্যে কোনো অভিযোগের আওতায় আওয়ামী লীগ সরকারের কোনো মন্ত্রী বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ এই ৫বছরে খালেদা-নিজামী-সাইফুর গংরা প্রমাণ করতে সক্ষম হননি। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য মূলক ভাবে মিথ্যা হয়রানীর লক্ষ্যে এ শ্বেতপত্র খালেদার সরকার প্রকাশ করেছিল। সাবেক সচিব মনিরুজ্জামান ও তার দোসর নুরুজ্জামানকে এই শ্বেতপত্রের মোড়কে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনের অপরাধে দণ্ডবিধির ১৬৬, ১৬৭, ১৭৭, ১৮২ও ১৯২ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করা যায়। শ্বেতপত্রী কাদের ইতোমধ্যে মারা যেয়ে সম্ভাব্য মামলা থেকে রেহাই পেয়েছেন বলা চলে। আইন অনুযায়ী সকলের প্রতি সম আচরণের যে শপথ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে খালেদা নিয়েছিলেন এই মিথ্যার বেসাতি পরিপূর্ণ শ্বেতপত্র প্রকাশের মাধ্যমে তিনি তা লংঘন করেছেন। শপথ ভংগের দায়ে এবং উপরোক্ত ধারা মোতাবেক সাবেক সচিব মনিরুজ্জামান ও নুরুজ্জামানের অপরাধে সহযোগী ও সহায়তাকারী হওয়ার দায়ে তিনিও দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী বিচারে সোপর্দনীয়।

২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত খালেদা-সাইফুর দুর্নীতির মাধ্যমে

বাংলাদেশের দরিদ্র জন সাধারণের কমসেকম ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৩ কোটি টাকা লুট করেছেন (দ্রষ্টব্য, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, ২০০১ থেকে ২০০৪ ঃ দুর্নীতির মচ্ছব, দৈনিক জনকণ্ঠ, অক্টোবর ২৪ ও ২৫, ২০০৫)। বৎসর ওয়ারী হিসাবে এর পরিমাণ ৪৮ হাজার কোটি টাকা তথা মোট জাতীয় উৎপাদনের ১৩% এর বেশি। এরূপ বিস্তৃত ও অব্যাহত দুর্নীতির বলে খালেদার পুত্রধন ও স্বজনরা এবং মন্ত্রীবর্গ বিলিয়ন-মিলিয়ন ডলারের মালিক হয়েছেন বলেও দেশে বিদেশে বিদিত হয়েছে। এর মধ্যে মন্ত্রীবর্গের দুর্নীতি ভিত্তিক আনুপার্জিক আয় ৭৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৫২১০০ কোটি টাকা পরিমাণে হিসাবকৃত হয়েছে (দ্রষ্টব্য, উদাহরণতঃ প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ড. পিটার স্লোম্যান, নিউইর্য়ক, এপ্রিল ১৫, ২০০৬)। দুর্নীতির এই মাত্রার বিস্তৃতি খালেদার সরকারকে দুর্নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, দুর্নীতি প্রসারে নিয়োজিত, দুর্নীতিতে সর্বাধিক কলুষিত এবং ফলত ঘৃণ্যতম মাত্রার জনস্বার্থ বিরোধী সরকার হিসারে পরিচিতি দিয়েছে। এই দুর্নীতির অন্যতম নায়ক হিসাবে তার পুত্রধন ও স্বজনরাও ঘৃণার্হ হয়েছেন। চোরের মা'র গলা বড় হয় বলেই তিনি তার শাসনামলে চৌর্যতন্ত্রের চর্চা শুরু করার সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে এই শ্বেতপত্রে মিথ্যা দুর্নীতির অভিযোগ এনে আগাম পার পেতে চেয়েছিলেন। চোরের মা'র বড় গলা হওয়া সত্ত্বেও হাজার হাজার কোটি টাকা তসরুফ করার অভিযোগের বাইরে খালেদা কি অস্বীকার করতে পারবেন যে জিয়াউর রহমানের সময়ে বঙ্গভবনের প্রসারিত ভবন হিসাবে তার ক্যান্টনমেন্টস্থিত ভবনে যে সব আসবাবপত্র আনা হয়েছিল, সরকারি খরচে তার দুই শাসনামলে ঐ ভবনে যে সব সাজ সজ্জার সমারোহ ঘটেছিল তার একটিও তিনি তার প্রধানমন্ত্রীত্বের অবসানের পর সরকারকে ফেরত দেননি। আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির শ্বেতপত্রে নির্লজ্জ ও উদ্দেশ্য মূলক মিথ্যাচার করার পটে খালেদা ও তার দুর্নীতি মণ্ডিত ও কলুষিত মন্ত্রীবর্গের বিচার এই বাংলাদেশের মাটিতে সম্পন্ন করে যথা আইন শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যে দেশের আপামর জনগণকে সংঘবদ্ধ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ নভেম্বর ১৭, ২০০৬

রূপালী ব্যাংক বিক্রয় না লোপাট? কতিপয় প্রশ্ন

বেশ ঢাক ঢোল বাজিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব রূপালী ব্যাংক বিদেশী বিনিয়োগকারী বা ক্রেতার কাছে বিক্রির ব্যবস্থা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিল খালেদা-সাইফুর গংদের সরকারের আজ্ঞাবহ প্রাইভাইটেজেশন কমিশন। এক সৌদী যুবরাজ নাকি প্রাইভাইটেজেশন কমিশনের আশার অতিরিক্ত মূল্য ৩৩০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে রূপালী ব্যাংকের ৬৭.২৬% শেয়ার বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে কেনার জন্য এগিয়ে এসেছেন।খালেদা-সাইফুর গংরা তাদের সরকারের আমলের শেষ সপ্তাহে এই বিক্রয়ের প্রস্তাব ও শর্তাবলী অনুমোদন করে গেছেন বলে জানা গেছে।

এই অনুমোদন অনুযায়ী বিক্রয় চুক্তি চূড়ান্ত ও সই করার কাজ বর্তিয়েছে ইয়াজউদ্দিন পরিচালিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর। বিক্রির পর (১) ব্যাংকের কু ও সন্দেহভাজন ঋণ এবং এর কর্মচারীদের অবসর ভাতাদি দেয়ার দায়ভার সরকারকে নিতে হবে এবং (২) বাকি প্রায় ৩২.৭৪% শেয়ারও যুবরাজকে সমানুপাতিক মূল্যে হস্তান্তর করতে হবে বলে যুবরাজের পক্ষে দাবী করা ও এই দাবীর এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তি না হওয়ায় যুবরাজের দস্ত মোবারকে এখনও ব্যাংকটি তুলে দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য এই শেষোক্ত ৩২.৭৪% শেয়ারের মধ্যে ২৬% সরকারের ও বাকি ৬.৭৪% বাংলাদেশী ব্যক্তি মালিকানাধীন।

রূপালী ব্যাংক বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করার দাবী বিশ্বব্যাংক ও আর্ন্তজতিক মূদ্রাতহবিল কর্তৃক প্রায় ১০ বছর আগে খালেদার ১ম শাসন আমলে উথাপিত হয়েছে। এই দুটি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সংস্কারের মোড়কে ক্রমান্বয়ে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক বেসরকারিকরণের শর্ত বাংলাদেশের উপর আরোপ করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বলে এসেছে যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক ব্যবস্থা (১) অনিপুণ ও সময়ের

প্রয়োজন অনুযায়ী অপরিবর্তনশীল; (২) সরকারি নির্দেশের আওতায় আমানতকারীদের অর্থ অনুৎপাদনশীল ও অলাভজনক খাতে প্রবাহকরণে বাধ্য এবং (৩) ক্রমান্বয়ে অনিপুণতা ও নির্দেশিত ভাবে ঋণপ্রবাহের কু প্রভাবে মূলধনের অপর্যাপ্ততার দোষে দুষ্ট হয়েছে। তাদের মতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর হলে এই তিন দোষ থেকে মুক্ত হয়ে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ব্যবস্থা তথা এক্ষেত্রে রূপালী ব্যাংক নিপুণতা ও উৎপাদনশীলতায় প্রজ্জোল হয়ে জনস্বার্থিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে। রূপালী ব্যাংকের বিদ্যমান শাখা সংখ্যা ২৩৪। এই শাখাগুলোর বেশির ভাগ গ্রামীণ এলাকাতে অবস্থিত। রূপালী ব্যাংক বেসরকারিকৃত হলে এটি হবে দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ব্যাংক এবং এই বেসরকারি মালিকানা বিদেশী হলে রূপালী ব্যাংক হবে দেশের সর্ব বৃহৎ বেসরকারি বিদেশী ব্যাংক। এই প্রেক্ষিতে রূপালী ব্যাংক বেসরকারিকরণের পথে জনস্বার্থে কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়।

এক, রূপালী ব্যাংক বেসরকারি করলেই এর নিপুণতা বাড়বে একি নিশ্চিত ভাবে বলা যায়? বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক সমূহ ১৯৭২ সাল থেকে মূলত (১) দেশের সর্বত্র, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থা বিস্তৃত, (২) কৃষি সহ অন্যান্য সামাজিক ভাবে উৎপাদনশীল ও প্রয়োজনীয় খাতে ইপ্সিত অর্থায়ন ও (৩) রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারণে প্রযুক্ত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বলা হচ্ছে যে এসব লক্ষ্য বাদ দিয়ে একমাত্র লাভজনকতার নিরিখে ব্যাংকের নিপুণতার বিচার করা হবে। কেবল মাত্র সাম্প্রতিক কালে নির্ধারিত নিপুণতার এই মানদণ্ডে নয়, আগে নির্ধারিত লক্ষ্যাদি অর্জনে সফলতার নিরিখে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব রূপালী ব্যাংক অনিপুণ বা অসফল হয়েছে বলা যায় না। গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রসারণে ও রপ্তানী বাণিজ্যে সহায়তাকরণে এর সফলতার মানদণ্ডে এর ভূমিকা বিচার করা সংগত হবে। দুই, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত ঋণপ্রবাহের কারণে লোকসানাদি বাদ দিলে এবং এই ধরণের অলাভজনক নির্দেশনাদি দেয়া পরিহার করলে ব্যাংকের আর্থিক লাভজনকতা এখন থেকে অর্জন করা যায়। অলাভজনকতা পরিহারের জন্য বেসরকারিকরণ একমাত্র মহৌষধ নয়। উল্লেখ্য সমকালে বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক মোট পরিসম্পদের ১.৬১% সমুহ পরিচালনায় ব্যয় করে থাকে। এই তুলনায় বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় তাদের মোট পরিসম্পদের প্রায় ২% এবং বিদেশী বেসরকারি ব্যাংক সমূহের পরিচালন ব্যয় তাদের পরিসম্পদের ২% এর বেশি। (দ্রষ্টব্য, বাংলাদেশ ব্যাংক ফাইনান্সিয়াল সেক্টর রিভিও, ভলিয়ুম ১, সংখ্যা ১, ২০০৬)। তিন, রূপালী

ব্যাংকের গত কয়েক যুগের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর প্রান্তিক বেসরকারি মালিকানার (প্রায় ৭%) মোড়কে পরিচালনা পর্ষদে যারা মৌরসীপাট্টা নিয়ে অবস্থান করেছিলেন তারা তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই ব্যাংকের ঋণ প্রবাহকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে এসেছেন। এ ক্ষেত্রে কর্পোরেট ন্যায়নিষ্ঠতা কোনো ভাবে বা মাত্রায় এই ব্যাংকের ঋণপ্রদানের প্রক্রিয়াকে সকল শেয়ার মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করণে প্রযুক্ত করেনি। বেসরকারিকরণ এই প্রবণতা কিংবা অসংগতি দুর করতে পারবে বলে মনে করা সংগত হবে না। এই প্রসঙ্গে গত সরকারের আমলের শেষদিকে প্রকাশ পাওয়া বেসরকারি ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের ভূমিকা স্মরণ করা যেতে পারে । চার, যে কোনো ব্যাংকের মতোই রূপালী ব্যাংক ব্যবসা করে মূলত তার আমানত বা ব্যাংকে জনগণের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে; শেয়ার মূলধন সকল ব্যাংকের মতো রূপালী ব্যাংকের ব্যবসায়ে বা লগ্নীকরণে প্রান্তিক মাত্রায় প্রযুক্ত হয়। অন্যকথায়, ইতোমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংককে যেখানে আমানতকারীদের সম্পদ নিয়ে ব্যবসা চালান হয় তা এক কথায়, এর নব নাজেলকৃত শেয়ার মালিক কিংবা ক্রয়কারীর কাছে হস্তান্তর করা অনৈতিক এবং জনস্বার্থের বিপরীতে কায়েমী স্বার্থ সৃজন ও তোষণ করার নামান্তর। পাঁচ, ব্যাংকটি বিক্রয় বা বেসরকারি করণের প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের নিট সম্পদ হিসাব করনে এর শ্রেণীভুক্ত এবং কু ও সন্দেহজনিত ঋণ নিশ্চিতভাবে হিসাবে নেয়া হয়েছিল। ব্যাংকটির সকল সম্ভাব্য ক্রয়কারী তাদের দাম উল্লেখ করার আগে এরূপ অকার্যকর ঋণের হিসাব করেছিলেন। এই ব্যাংকের শ্রেণীভুক্ত কু ও সন্দেহজনক ঋণের পরিমাণ হিসাবকৃত হয়েছে ২৩৩.৫ মিলিয়ন ডলার। সৌদি যুবরাজ কর্তৃক দেয় ব্যাংকটির বিক্রয় মূল্য ৩৩০ মিলিয়ন ডলার হতে এখন শ্রেনীভুক্ত কু ও সন্দেহজনক ঋণ বাবদ ২৩৩.৫ মিলিয়ন ডলার বাদ দিলে সুস্পষ্ট হয় যে ব্যাংকটির ৬৭.২৬% শেয়ারের জন্য সৌদী যুবরাজ দিবেন মাত্র ৯৬.৫ মিলিয়ন ডলার। বিক্রয় মূল্য চুড়ান্ত হওয়ার পর এর শ্রেণীভুক্ত ঋণ ও এর কর্মচারীদের অবসর ভাতা দেয়ার দায় সরকার গ্রহণ করবে, এই দাবী মানার অর্থ হলো বিক্রয় মূল্য কমিয়ে দেয়া ও নেয়া। সরকার কর্তৃক এই দায়ভার নেয়ার আরও এক অর্থ হলো সাধারণ কর দাতাদের অর্থ দিয়ে খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের ঋণের বোঝা বহন করে ব্যাংকটির নতুন ক্রেতাকে সহায়তা করা কিংবা ভর্তুকী দেয়া। মোটা দাগে এ হল জুচ্চুরি এবং জনসম্পদের বেশরম ও বেপরোয়া লুট। জনগণত এ মেনে নিতে পারে না।

এ সব উত্থাপিত প্রশ্নের বিপরীতে বেসরকারিকরণের আরও একটি পন্থা বিবেচ্য। বলা হয়েছে যে রূপালী ব্যাংকের ৬৭.২৬% শেয়ারের বিপরীতে ৩৩০ মিলিয়ন ডলার বা ২৩১০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। এর থেকে শ্রেণীভুক্ত কু ও সন্দেহভাজন ঋণের পরিমাণ যার দায়ভার সরকার নেবে বলে বলা হয়েছে তা বাদ দিলে নিট মূল্য দাঁড়ায় ৯৬.৫ মিলিয়ন ডলার বা ৬৭৫.৫ কোটি টাকা। এই দাম কি যুবরাজ ছাড়া অন্যান্য ক্রয়ে আগ্রহী এই ব্যাংকে বিনিয়োগকারী কারও উদ্বৃত দামের চেয়ে বেশি ছিল? যুবরাজ থেকে প্রদাণীয় দাম অনুযায়ী ব্যাংকটির শেয়ার প্রতি মূল্য দাঁড়ায় ১৯৩০ টাকা । প্রতি ৩ মাসে ব্যাংকটির এক তৃতীয়াংশ করে এর ৬৭.২৬% শেয়ার বাজারে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর মাধ্যমে বিক্রি করলে যুবরজ কর্তৃক এখন হিসাবকৃত নিট মূল্য ৬৭৫.৫ কোটি টাকার চেয়ে বেশি পাওয়া যাবে বলে ওয়াকেবহাল মহলের ধারণা। যদি বেসরকারিকরণ অনিবার্য ও নিপুণতার ভিত্তি বলে বিবেচিত হয়, তাহলে এ ভাবে শেয়ার বাজারের মাধ্যমে রূপালী ব্যাংক বেসরকারিকরণ করলে তা জনস্বার্থিক হবে। ব্যাংকটির মালিকানা বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশীদের হাতে থাকবে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের কোনো সরকার রূপালী ব্যাংক যে ভাবে বিদেশী মালিকানায় হস্তান্তর করার পাঁয়তারা চলছে সেভাবে বিদেশী মালিকানায় সরকার তথা জনগণের ব্যাংক তুলে দিয়েছে কিনা তা আমার জানা নাই। রূপালী ব্যাংক বিদেশী মালিকানায় বিক্রির প্রক্রিয়ার সাড়ে তিনশত বছর আগে মীরজাফররা যেভাবে বাংলার আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে বিদেশী কোম্পানির হাতে তুলে দিয়েছিল সে পথ অনুসরণ করা হচ্ছে বলেই আশংকা হচ্ছে। উল্লেখ্য, করাচীস্থ রূপালী ব্যাংক পাকিস্তানী ব্যাক্তি মালিকানায় তুলে দিয়ে খালেদা-সাইফুরের সরকার জনগণের ১৩৯ কোটি টাকা ইতোমধ্যে লোকসান করিয়েছে(দ্রষ্টব্য, ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর, দুর্নীতির খতিয়ান করাচীতে রূপালী ব্যাংক লোপাট, দৈনিক জনকণ্ঠ নভেম্বর ২৯,২০০৫)।

রূপালী ব্যাংকের মুলধনের অপর্যাপ্ততা নিয়ে বিশ্ব ব্যাংক ও আই এম এফ যে প্রশ্ন তুলেছে তা এর শেয়ার প্রতি ১৯৩০ টাকা দাম এর হিসাব করলে ধোপে টিকে না। বলা প্রয়োজন, বিদ্যমান শ্রেণীভুক্ত বা অকার্যকর ঋণের বিপরীতে খাতায় লেখা শেয়ারের মুল্যে ১০০ টাকা দরে হিসাব করলে মূলধন অপর্যাপ্ততা দৃষ্ট হয়। কিন্তু শেয়ারের বাজারে সমকালে প্রাপ্তব্য মূল্য হিসাব করলে এই অপর্যাপ্ততা থাকে না । অন্য কথায়, সৌদী যুবরাজকে দেয়ার জন্য নির্ধারিত শেয়ার মূল্য গড়ে ১৯৩০ টাকা দরে হিসাব করলে ব্যাংকটির মূলধন

অপর্যাপ্ততার দোষ অনেকাংশে বিলীন হয়ে যায়।অতিরিক্ত শেয়ার বাজারে প্রিমিয়াম মূল্যে ছেড়ে ব্যক্তি মালিকানাকে সংশ্লিষ্ট করে ব্যাংকটির মূলধন পর্যাপ্ততা বাড়ানো ও বিদ্যমান ব্যক্তি মালিকানার স্বার্থের দাপট সীমিত ও ফলত ব্যবস্থাপনা ন্যায়নিষ্ট করা যেত। সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী হিসাবিবিদ সাইফুর মূলধন পর্যাপ্ততা বাড়ানোর এই প্রক্রিয়া কি ভাবে ভুলে রূপালী ব্যাংককে বিদেশী বিনিয়োগকারীর হাতে তুলে দিতে পায়তারা করেছেন তা এই প্রেক্ষিতে অস্পষ্ট থাকছে বলা যায় না।

আর একটি কথা। শোনা যাচ্ছে সৌদী যুবরাজের আলখাল্লা ও কাফিয়ার মোড়কে এদেশী আর এক হাফ সাফারি শোভিত যুবরাজের ছুরুত বিদ্যমান । দেশী এই যুবরাজ তার লুণ্ঠিত সম্পদ সৌদী যুবরাজের মাধ্যমে রূপালী ব্যাংক কিনে এবং পরে ক্রমান্বয়ে নিজের নামে হস্তান্তরের পাককা দলিল সুইজারল্যান্ডের জুরিখে কিংবা পার্শ্ববর্তী কালো টাকার বেহেশত লাইচেনস্টাইনে সম্পাদন করে এসেছে বলে শোনা যাচ্ছে।

এই প্রেক্ষিতে এও মনে রাখা সংগত হবে যে সৌদি যুবরাজকে দেয়ার প্রক্রিয়ায় যদি রূপালী ব্যাংকের কু ও সন্দেহভাজন ঋণ সমূহের দায়ভার সরকারের উপর বর্তায় তাহলে ব্যাংকটির মূলধন অপর্যাপ্ততা বিলীন হবে এবং যুবরাজ বা বিদেশ থেকে ব্যাংকটিতে মূলধন পর্যাপ্ততা অর্জনের জন্য অতিরিক্ত বিনিয়োগ আনা প্রয়োজন হবে না। তেমনি এখনও যদি সরকার ব্যাংকটির কু ও সন্দেহভাজন বা অকার্যকর ঋণ সমূহের দায়ভার গ্রহণ করে তাহলে বিদ্যমান মালিকানার আওতায় ও মূলধনের অপর্যাপ্ততা থাকবে না। সরকারকেই যদি এই দায়ভার গ্রহণ করতে হয় তাহলে সরকার কেন এর মালিকানা সৌদি যুবরাজের দস্ত মোবারকে এ ভাবে এত কম দামে তুলে দিবে?

এদেশে বেসরকারি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাংক স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্য নিয়ে প্রারম্ভিক শেয়ার মূলধনের ৪০% সরকার থেকে দিয়ে ১৯৮০ র দশকে আই এফ আই সি ব্যাংক বেসরকারি খাতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মোড়কে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। খালেদা-সাইফুরের দুঃশাসনের এই আমলে সেই ব্যাংকটি সরকারি সমর্থনের মোড়কে কালো টাকার মালিকানার আওতায় উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ব্যাংকটির সংঘ স্মারক সংশোধন না করে কালো টাকা ওয়ালার মালিকানার নৈতিকতা এবং ব্যবস্থাপনায় নিপুণতা না মূল্যায়ণ করে খালেদা-সাইফুর অনুরাগ ও ভীতির বশবর্তী হয়ে এই দুষ্কর্মটি করেছে। রাগ, অনুরাগ বা ভীতির বশবর্তী না হয়ে সকল কাজ করার জন্য প্রধান

এবং অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসাবে খালেদা-সাইফুর শপথ নিয়েছিলেন। আমাদের দেশের প্রাইভাইটেজশন কমিশন রূপালী ব্যাংক বিক্রয়ের জন্য বিদেশে সড়ক প্রদর্শনীতে কিংবা ভিন্নতর পন্থায় রূপালী ব্যাংকের বেসরকারিকরণে সম্ভাব্য লাভবানদের পরিচিতি কি টের পেয়েছিল? দৃশ্যত নিখাদ ও সফেদ আলখাল্লার পেছনে ঘৃণিত লুটেরার কালোহাত আছে তা প্রমাণিত হলে প্রাইভাইটাইজেশন বোর্ডের কর্মকর্তাদিগকে দেশবাসী ক্ষমা করবে না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

এই প্রেক্ষিতে রূপালী ব্যাংকটির বহু ঘোষিত বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পদ প্রকারান্তরে লুট হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা তলিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিলে তা জনস্বার্থিক হবে।

জনকণ্ঠ নভেম্বর ২৯, ২০০৬